রচনা সম্ভার

সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী





জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত

রচনা সম্ভার

(সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

রচনা

প্রফেসর শফিউল আলম
ড. সালিম সাবরিন

সম্পাদনা

ড. সরকার আবদুল মান্নান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিঃ

প্রচ্ছদ
মোঃ পারভেজ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ কথা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংযোগ ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এসবের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রথমবারের মতো প্রকাশ করল ৬ষ্ঠ, ৭ম–৮ম ও ৯ম–১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা রচনা বই **রচনা সম্ভার**।

২০০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত গ্রন্থ তিনটিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে প্রতিফলনের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে পাঠ্যপুস্তক তিনটিতে রচনাগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা এদেশের ইতিহাস–ঐতিহ্য, সংস্কার–সংস্কৃতি, শিল্প–সাহিত্য ও নীতি নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে এবং এ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতি–চেতনা, নৈতিকতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের সুস্থ চিন্তার চর্চা করানোই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে প্রতিটি রচনাকে এক একটি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করাই হবে আমাদের কাম্য। এছাড়া গ্রন্থগুলোর বিরচন অংশে যে–সব বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ–প্রবচন, বাক্য–সংকোচন, প্রতিশব্দ, পরিভাষা, বিপরীতার্থক শব্দ, চিঠি–পত্র, অনুবাদ, ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে সেগুলোকেও মডেল হিসেবে গ্রহণ করাই হবে যৌক্তিক। এই সব উদাহরণ বা মডেল–এর ওপর ভিত্তি করে যেন শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন বিষয় নিয়ে নিজস্ব চিন্তা–ভাবনার আলোকে প্রবন্ধ রচনা ও কম্পোজিশন তৈরি করতে পারে, সে দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। রচনা ও সম্পাদনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে কিছু ত্রুটি–বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুধিজনদের পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়াস থাকবে।

রচনা সম্ভার শীর্ষক এই গ্রন্থটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হল তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ: প্রবন্ধ-রচনা

প্রবন্ধ সম্পর্কে ধারণা

সাধারণভাবে গদ্যে রচিত নাতিদীর্ঘ রচনাকে প্রবন্ধ বলে। কোনো বিষয় বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে গদ্যভাষায় রচিত তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণমূলক রচনাকে প্রবন্ধ বলে। প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি শাখা। প্রবন্ধ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। এ বন্ধন ভাব ও ভাষার মধ্যে। মনের ভাব ভাষায় উত্তম শব্দের বন্ধনে প্রকাশ করাই প্রবন্ধ রচনার আসল উদ্দেশ্য। ভাব ও ভাষা যথাক্রমে রচনার মৌলিকত্ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

প্রবন্ধ রচনার আগে কয়েকটি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন :

১. যে বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করা হবে সে বিষয়ে মোটামুটি ভালোরকম ধারণা থাকা উচিত।

২. প্রবন্ধ–রচনার আগে ভালোমতো বুঝে নিতে হবে যে, বিষয়টি কী, কেন, কোথায়, কেমন ইত্যাদি। আর এসব প্রশ্নকে সুসংবদ্ধ করেই সহজ-সরল ভাষার মাধ্যমে রচনা উপস্থাপন করতে হবে।

৩. রচনার বক্তব্যবিষয় যাতে ধাপে ধাপে বা ক্রমান্বয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য সাজিয়ে নিতে হবে।

৪. ধারাবাহিকভাবে সাজানোর সময় কী, কেন, কোথায়, কেমন ইত্যাদি প্রশ্নের আলাদা অনুচ্ছেদ ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করে দেখাতে হবে।

৫. মনে রাখতে হবে, প্রবন্ধটি যাতে খুব দীর্ঘ কিংবা খুব সংক্ষিপ্ত না হয়ে যায়।

৬. প্রবন্ধে একই ভাবের পুনরাবৃত্তি হওয়া অনুচিত।

৭. প্রবন্ধের ভাষা ও বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সহজ-সরল হওয়া উচিত। সেইসাথে অপ্রয়োজনীয় শব্দবিন্যাস ও অলংকারের ব্যবহার বর্জন করতে হবে।

৮. প্রবন্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাষারীতি ও বানানরীতির সমতা বজায় রাখতে হবে।

৯. প্রবন্ধ বা রচনায় নিজ বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনে অন্যান্য বিখ্যাত রচনার উদ্ধৃতি যোগ করতে হবে এবং তা অবশ্যই আলাদা অনুচ্ছেদে উল্লেখ করতে হবে।

একটি পূর্ণাঙ্গ রচনার বিভিন্ন অংশ রয়েছে। সেগুলোকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. ভূমিকা : এ অংশে রচনার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে আভাস বা ইঙ্গিত দিতে হবে।

খ. উদ্দেশ্য : প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য বা সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে।

গ. মূল অংশ : প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রবন্ধ–রচনার শ্রেণীভেদ

প্রবন্ধকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১. **বর্ণনামূলক :** যে প্রবন্ধে প্রাণী, উদ্ভিদ, চেতন-অচেতন পদার্থ, স্থান ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা থাকে তাকেই বলে বর্ণনামূলক প্রবন্ধ। যেমন– গরু, পাট, গ্রাম্যহাট, মেলা ইত্যাদি।

২. **ঘটনামূলক বা বৃত্তান্তমূলক :** যেসব প্রবন্ধে জীবনচরিত, ঐতিহাসিক ঘটনা, উৎসব, ভ্রমণ ইত্যাদির বিবরণ বা বর্ণনা থাকে তাকে ঘটনামূলক বা বৃত্তান্তমূলক প্রবন্ধ বলে। যেমন—হযরত মুহম্মদ (স), স্বাধীনতা দিবস, নৌকাভ্রমণ, ঈদ উৎসব, পূজা ইত্যাদি।

৩. **ভাবমূলক বা চিন্তামূলক :** কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখকের মনে যে ভাবধারা বা অনুভূতির সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে যে প্রবন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশ করা হয় তাকে ভাবাত্মক বা চিন্তামূলক প্রবন্ধ বলে। যেমন— সময়ের মূল্য, চরিত্র, অধ্যবসায়, সততা ইত্যাদি।

যানবাহন

আমাদের যানবাহন ব্যবস্থা

সূচনা

যেকোনো দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য যানবাহন-ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান নিয়ামক। এজন্য দেশের উন্নয়নের স্বার্থে যানবাহন-ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীন যানবাহন-ব্যবস্থা

স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমাদের দেশে যানবাহন-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটেছে। এর আগে পাকিস্তান আমলে আমাদের রাস্তাঘাট, সড়কপথ, রেলপথ ও নদীপথে চলাচলের তেমন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা যেমন ছিল না তেমনি প্রসারও ঘটেনি। সে সময় গ্রামে-গঞ্জে এমনকি থানা পর্যায়ে গরুর গাড়িই ছিল চলাচল ও পণ্য পরিবহনের প্রধান বাহন। মোষের গাড়ি ও পালকির প্রচলনও ছিল গ্রামবাংলায়। তবে নৌকাপথে চলাচলের ব্যবস্থা (নদীমাতৃক বাংলাদেশে) প্রাচীন আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। মন্থরগতির গরুর গাড়ি ও নদীপথে নৌকায় মাল পরিবহনে বেশি সময় লাগার ফলে পচনশীল কৃষিজাত পণ্য পরিবহনে অসুবিধা হত। প্রাচীনকাল থেকে পণ্য পরিবহনে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত আমাদের দেশে মান্ধাতার অবস্থাই বিরাজমান ছিল। পালতোলা নৌকায় বা সাম্পানে এক সময় মাল পরিবহন ও যাতায়াত-ব্যবস্থা ছিল। তাতে মানুষের অঢেল সময় যেমন ব্যয় হত তেমনি আর্থিক অগ্রগতির পথও ছিল রুদ্ধ।

সাম্প্রতিক যানবাহন-ব্যবস্থার অগ্রগতি

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সড়কপথে যাতায়াত-ব্যবস্থার যে বিপ্লব ঘটেছে তা চার দশক আগেও ছিল কল্পনাতীত। এখন বাংলাদেশে এমন কোনো উপজেলাশহর নেই যেখানে যান্ত্রিক যানবাহন মোটরগাড়ি, ট্যাক্সি ও ট্রাক যায় না। ঢাকা মহানগর থেকে যান্ত্রিক যানবাহনে বাংলাদেশের যে-কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন অনায়াসে যাওয়া যায়। যেসব স্থানে এক সময়ে নদীপথে যাতায়াত দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ছিল এবং নদীপথ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ ছিল না, সেখানেও অনায়াসে কয়েক ঘণ্টায় মোটর গাড়িতে যাওয়া যায়। ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী ইত্যাদি অঞ্চলেও এখন যাওয়া যায় সড়কপথে। পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, জেলাশহর কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, ভোলা, বরিশাল ও পটুয়াখালী ছাড়া এখন প্রায় সব জেলার সঙ্গে রয়েছে রেলযোগাযোগ।

রেলযোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থান ছাড়া দেশের রেলব্যবস্থায়ও এসেছে অনেক পরিবর্তন। দ্রুতগামী ও বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেন-যোগাযোগের ফলে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের যোগাযোগ-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। চীন-বাংলাদেশ মৈত্রীসেতু, জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রীসেতু ও সর্বশেষ যমুনাসেতু নির্মাণের ফলে দেশের যাতায়াত-ব্যবস্থা, পণ্য পরিবহন ও দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পরিকল্পিত পদ্মাসেতু স্থাপিত হলে যোগাযোগ ও যানবাহন চলাচল ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশ।

যানবাহন ও যাতায়াত পথ

যাতায়াত পথের উন্নয়ন ও সহজগম্যতার সঙ্গে যানবাহন চলাচলের সম্পর্ক নিবিড়। এজন্য সড়কপথ, রেলপথ, নদীপথ ও সমুদ্রপথসহ সব ধরনের পথের উন্নয়ন দরকার।

বিমানপথ

আমাদের যাতায়াত-ব্যবস্থায় সবচেয়ে দ্রুতগামী বাহন বিমান। আমাদের অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহন-ব্যবস্থা এখনও সীমিত পর্যায়ে ঢাকার সঙ্গে দেশের কয়েকটি শহর– চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার, রাজশাহী, যশোর ও সৈয়দপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান ছাড়া জি এম জিসহ কয়েকটি বেসরকারি বিমান দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত–ব্যবস্থায় অবদান রাখছে। জি এম জি সম্প্রতি বাংলাদেশের বাইরেও তাদের পরিবহন নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেছে।

আন্তর্জাতিক পথে আমাদের যানবাহন-ব্যবস্থা

ভারতের কলকাতা ও আগরতলার সঙ্গে সড়কপথে আমাদের যানবাহন-ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং রেলপথে যোগাযোগেরও প্রক্রিয়া চলছে। সম্প্রতি ট্রান্স এশিয়ান সড়ককে যোগাযোগ নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এ যোগাযোগ-ব্যবস্থা চালু হলে সড়কপথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসহ এশিয়ার অনেক দেশের কাছাকাছি হবে বাংলাদেশ।

উপসংহার

যাতায়াত-ব্যবস্থায় আমাদের দেশে যে প্রসার ঘটেছে তা অনস্বীকার্য। তবে এ প্রসারে যে পর্যায়ের উন্নয়ন ঘটেছে তাকে যথেষ্ট বলা যাবে না। এখনও আমাদের দেশের অনেক এলাকা ও অঞ্চল যন্ত্রচালিত যানবাহন চলাচল-এলাকার বাইরে। এখনও অনেক এলাকা দুর্গম। সুতরাং দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিকাশ, অগ্রগতি ও উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের যানবাহন চলাচল ও যাতায়াত-ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। তবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সড়ক-পথের সঙ্গে আমাদের দেশ যুক্ত হলে দেশের অভ্যন্তরে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। 🕮

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচনা

বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যা তাঁর অলোক–সামান্য প্রতিভায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেনি। কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, গল্পে, প্রবন্ধে, শিশুতোষ রচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যকে শস্যশ্যামল বাংলার প্রকৃতির মতো অপরূপ সৌন্দর্যসম্ভারে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁর রবিকরোজ্জ্বল সৃষ্টিশীল প্রতিভায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়েছে, বাংলা ভাষায় এসেছে নতুন ধারা।

জন্ম

রবীন্দ্রনাথ ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ধর্মচিন্তা ও মহৎ গুণাবলির জন্য তিনি 'মহর্ষি' রূপেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন প্রচুর বিত্তশালী ব্যবসায়ী ও শিল্প-উদ্যোক্তা। রবীন্দ্রনাথের ভাইবোনেরাও ছিলেন খ্যাতিমান।

শিক্ষালাভ

ছকবাঁধা প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনে শিশু-কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন বসেনি। সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হন। তবে সেখানে বেশিদিন পড়া হয়নি। তারপর তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় নর্মাল স্কুল ও বেঙ্গল একাডেমিতে। এ দুটি বিদ্যায়তনেও তিনি নিয়মিত পড়েননি। চার বছর পড়শোনার পর তাঁর বিদ্যালয়কেন্দ্রিক পড়াশোনা শেষ হয়। তবে জোড়াসাঁকোর সংস্কৃতিবান জমিদার বাড়িতে পিতার অসামান্য যত্নে তাঁর নানাবিধ বিদ্যাচর্চার যেমন ব্যবস্থা হয় তেমনি সংগীত, ব্যাকরণশাস্ত্র ইত্যাদির অধ্যয়নও চলে। এভাবে একটি মুক্ত ও বৃহৎ জ্ঞানচর্চার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ঘটে।

বহির্বিশ্বে প্রথম পদপাত

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন পৃথিবীর নানা প্রান্ত ভ্রমণ করেছেন। তবে তাঁর জন্য বহির্বিশ্বের প্রথম দরজা খুলে যায় মাত্র সতেরো বছর বয়সে। ১৮৭৮ সালে তিনি প্রথম ইংল্যান্ড যান। সেখানে ছিলেন তাঁর বড় ভাই ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ রাজপদের চাকুরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সেখানে ব্রাইটনের স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। তবে এখানকার পড়াও তিনি দীর্ঘায়িত করেননি।

সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ

বিলেত যাওয়ার আগেই, কৈশোরে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই *বনফুল* প্রকাশিত হয়। পিতা

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্য, অগ্রজদের উৎসাহ রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার পথ সুগম করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যচর্চার সূচনায় অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন— 'পদ্য–জিনিসটা এ পর্যন্ত ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবচিন্তা নাই, কোনোখানে দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না।' অথচ এই বালক-কবিই একের পর এক কাব্যরচনা করে একদিন বিশ্বকবি বলে খ্যাত হলেন।

বিবাহ ও জমিদারি পরিচালনা

বাইশ বছর বয়সে ১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের যশোরের ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়। কবি তাঁর স্ত্রীর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেন মৃণালিনী দেবী। এ তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে বেশ পরিচিত ও খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন।

জমিদারি পরিচালনা

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জমিদারি পরিচালনার ভার দেন। রবীন্দ্রনাথ দক্ষতার সঙ্গে শুধু জমিদারি পরিচালনাই করেননি, তিনি গরিব প্রজাসাধারণের সামাজিক উন্নয়নে নানারকম পদক্ষেপ নেন। এসময় তৎকালীন পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের অনেক কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি হয়। তাঁর অনেক বিখ্যাত ছোটগল্প ও কবিতা এই পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে রচিত। তাঁর চিঠিপত্রে পদ্মা নদীর কথা যেমন আছে, তেমনি আছে পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি ও জীবনের নানা প্রসঙ্গ। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *সোনার তরী* ও *মানসী* এই পূর্ববঙ্গে থাকাকালেই রচনা করেন।

নোবেল পুরস্কার

১৯১৩ সালে ইংরেজিতে অনূদিত *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের জন্য এশীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর এই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে বাংলা ভাষার পরিচিতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। দেশে-বিদেশে কবিকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে বলা যায় একজন বিশ্বপর্যটক কবি। পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশের বড় বড় শহর তিনি ভ্রমণ করেন ও নানা ভাষাভাষীর অভিনন্দন লাভ করেন।

বাংলাদেশে সংবর্ধনা ও সম্মাননা

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা ও সিলেটে এসেছিলেন। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁকে ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান

মহাকাব্য ছাড়া বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো অংশ নেই যেখানে তিনি পদচারণা করেননি। গল্প, কবিতা, নাটক, নাট্যকাব্য, প্রহসন, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছন্দ, ভাষাতত্ত্ব—সব বিষয়েই তিনি অনবদ্য সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর চিঠিপত্র— *ছিন্নপত্রাবলী* বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশুদের জন্য রচিত তাঁর পাঠ্যগ্রন্থ *সহজপাঠ* এখনও বাংলা শেখার আদর্শ পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে আদৃত। রবীন্দ্রনাথের গান বাংলা সংগীতকে এখনও প্রাণময় করে রেখেছে। আমাদের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' তাঁরই অমর সৃষ্টি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। ভারতের জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথের রচনা। পৃথিবীর দুটি স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত একই কবির রচনা— এরূপ বিরল সম্মান পৃথিবীর অন্য কোনো কবির ক্ষেত্রে ঘটেনি।

মৃত্যু

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালের আগস্ট, ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি নন, তিনি বিশ্বকবি। যতদিন বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষাভাষী থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথের অমর সাহিত্যকীর্তি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। 📖

কাজী নজরুল ইসলাম

জন্ম, বাল্যকাল ও শিক্ষা

বাংলা ১৩০৬ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহমদ ও মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের বাবা ছিলেন গ্রামের দরগার খাদেম। তিনি মসজিদে ইমামতি করতেন, গ্রামে মিলাদ পড়াতেন, পাড়াপড়শিদের দলিলপত্র লিখে দিতেন। এতে যে সামান্য আয় হত তাতেই সংসার চলত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে সে সামান্য আয়ও বন্ধ হয়ে যায়। অনেক কষ্টের মধ্যে গ্রামের মক্তব থেকে নজরুল প্রাইমারি পরীক্ষা পাশ করেন। ছেলেবেলা থেকেই নজরুল ছিলেন খুব মেধাবী।

লেটোর দলে যোগদান

নজরুল বারো বছর বয়সেই যোগ দেন লেটোর দলে। তাতে তাঁর দুপয়সা রোজগার হতে লাগল। এরপর তিনি পাড়ি দিলেন আসানসোল শহরে। সেখানে এক রুটির দোকানে মাসে এক টাকা বেতনের চাকরি পেলেন। এ সময় রফিজউল্লাহ নামক এক উদারহৃদয় দারোগার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দারোগার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে। নজরুলকে তিনি নিয়ে এলেন ত্রিশালে। এখানে দরিরামপুর হাইস্কুলে নজরুল কিছুদিন পড়েছিলেন। বালক নজরুল এখান থেকেও পালিয়ে যান। তারপর ভর্তি হন বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে। এখানে পড়ার সময়ে তাঁর বন্ধুত্ব হয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পরবর্তীকালে তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। নজরুল রানীগঞ্জ হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ১৩২০ বঙ্গাব্দে ৪৯ নং বেঙ্গালি রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে চলে গেলেন সুদূর করাচি। নজরুলের আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা এখানেই শেষ হয়। বাঙালি পল্টনে গিয়ে তিনি সাধারণ সৈনিক থেকে হলেন হাবিলদার।

কাব্য-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ

করাচি থেকে পাঠানো নজরুলের কবিতা 'সওগাত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপা হতে লাগল। ছাপা হতে লাগল তাঁর আবেগী গদ্যলেখা। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'মুক্তি'। কিন্তু যে-কবিতা তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল খ্যাতির মালা সেটি হল 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী'র ভাব, ভাষা ও ছন্দ সবই ছিল অভিনব। তাই সাড়া জেগেছিল অভূতপূর্ব। নজরুল ১৯২০ সালে কলকাতায় চলে আসবার পর তাঁর সাহিত্যজীবন পুরোপুরি শুরু হয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর কবিখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বিদ্যুৎ গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সাংবাদিকতা

নজরুল সাংবাদিকতায়ও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নজরুল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। অল্প দিনেই পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নজরুল নিজে 'লাঙল' ও 'ধূমকেতু' নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট। এ পত্রিকাও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রকাশকে স্বাগত জানিয়ে আশীর্বাদসূচক একটি কবিতা লেখেন প্রথম সংখ্যায়।

কারাবরণ

'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক কবিতা। এ কবিতায় তিনি পরাধীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসককে ব্যঙ্গ করেছিলেন। কবিতাটি রচনার জন্য কবিকে 'রাজদ্রোহী' ঘোষণা করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করা হয়।

বাংলা সাহিত্যের কবিকুলের মধ্যে নজরুলই প্রথম রাজবন্দি, তিনিই প্রথম দীর্ঘকাল কারাবরণ করেন। তিনিই প্রথম ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দাবি করেন, তিনিই প্রথম বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অর্ধ শতাব্দী আগে 'বাঙলা ও বাঙালির জয় হোক' এ প্রত্যয় প্রকাশ করে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন।

বিবাহ

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড়ে বাসরত শ্রীবীরেন্দ্র সেনগুপ্তের কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তার

সঙ্গে কবির বিবাহ হয়। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে কবিপত্নী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর মারা যান। কবি নিজেও তখন নির্বাক, অসুস্থ।

সংবর্ধনা, পুরস্কার ও সম্মাননা

১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতা অ্যালবার্ট হলে মাত্র তিরিশ বছর বয়সে নজরুলকে জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ সংবর্ধনাসভার সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এ সংবর্ধনাসভায় বক্তৃতা করেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে নজরুলকে সভাপতির পদে সমাসীন করে সম্মান দেখানো হয়। ১৯৪১ সালের ২৫শে মে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে পালিত হয় কবির ৪৩তম জন্মজয়ন্তী। আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন বা সংবর্ধনাকে কবি খুবই নগণ্য মনে করতেন। তাই ঢাকার নওয়াবের আমন্ত্রণকেও তিনি এক সময় উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কবি ছিলেন আপনভোলা মানুষ। তিনি জয় করেছিলেন তরুণদের মন, অগণিত কাব্য-রসপিপাসু মানুষের হৃদয়।

১৯৪৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ দিয়ে ও ১৯৬০ সালে ভারত সরকার ‘পদ্মভূষণ’ উপাধি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৭৬ সালে কবিকে দেওয়া হয় ‘একুশে পদক’।

সাহিত্যসেবা

নজরুল সাহিত্যসেবার সময় পেয়েছিলেন মাত্র কুড়ি বছরেরও কম। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, চক্রবাক, দোলন চাঁপা, ফণিমনসা ও মৃত্যুক্ষুধা* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ও উপন্যাস।

সংগীত রচনা

নজরুল গান রচনা করেছেন অজস্র। সুরবৈচিত্র্য ও বাণীসম্পদে তাঁর গান বাংলা গানের জগতে অতুলনীয়। নজরুল–গবেষকদের মতে তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় দুহাজার।

দুরারোগ্য ব্যাধি

১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে কবি মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় তেরো বছর পর তাঁকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় প্রথমে ইংল্যান্ডে, পরে ভিয়েনায়। কিন্তু তাঁর রোগ নিরাময়যোগ্য নয় বলে মত দেন ডাক্তাররা। দীর্ঘদিন ধরে কবি ছিলেন প্রায় জীবন্মৃত, নির্বাক।

বাংলাদেশে আগমন ও নাগরিকত্ব প্রদান

১৯৭২ সালের মে মাসে সদ্যস্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর আগ্রহে ও আমন্ত্রণক্রমে বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত অতিথি হিসেবে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। কবিকে দেওয়া হয় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব।

নজরুল ইনস্টিটিউট ও নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

নজরুল বাংলাদেশের ‘জাতীয় কবি’। বাংলাদেশে নজরুলসাহিত্যের চর্চা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নজরুল ইনস্টিটিউট। এ ছাড়া ১৯৮৮ সাল থেকে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ‘নজরুল অধ্যাপক’ পদ প্রবর্তন করা হয়েছে । ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। কুমিল্লায় নজরুলের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য স্থাপিত হয়েছে নানা স্মৃতিফলক, পাঠাগার ও নজরুলচর্চাকেন্দ্র।

নজরুল জন্মশতবর্ষ

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বছরব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়েছে নজরুলজন্মশতবর্ষ। বাংলাদেশে এবছর অনুষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নজরুল গবেষক সম্মেলন। প্রকাশিত হয়েছে নানা স্মারকগ্রন্থ। বাংলা একাডেমী কবির রচনাবলি নতুনভাবে প্রকাশের ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তাও বাস্তবায়িত হয়েছে।

মৃত্যু

নজরুলের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট সকাল দশটায়, ঢাকার পিজি হাসপাতালে। যে–কবির শির ছিল চির উন্নত, যাঁকে নত করতে পারেনি ব্রিটিশ সরকার, সেই সিংহশাবক চিরবিদ্রোহী নজরুল চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হলেন। সেদিন বিকেলের পড়ন্ত রোদের আভায় তাঁকে কবর দেওয়া হল পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, সামরিক অভিবাদনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের উত্তর প্রাঙ্গণে। 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই' বলে কবি যে আকুতি প্রকাশ করেছিলেন তা পূরণ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদসংলগ্ন উত্তরের সবুজ অঙ্গানে তিনি সমাহিত আছেন চিরকালের জন্য।

বাংলা সাহিত্য ও নজরুল

বাংলা সাহিত্যে নজরুল অমর হয়ে আছেন তাঁর অসংখ্য কবিতায়, অমর হয়ে আছেন তাঁর অজস্র বৈচিত্র্যময় সুরের গানে। নজরুল বাংলা সাহিত্যের যুগস্রষ্টা কবি। 🕮

বেগম রোকেয়া

সূচনা

বাংলার নারীশিক্ষা ও নারীসমাজের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে মহীয়সী মহিলা বেগম রোকেয়ার কথা। তিনি ছিলেন বাংলার মুসলিম নারীসমাজের আলোকবর্তিকা। বঙ্গ-ভারতের মুসলিমসমাজ যখন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের পঙ্কে নিমজ্জিত, অবরোধ ও অবজ্ঞায় এদেশের নারীসমাজ যখন জর্জরিত, সে তমসাচ্ছন্ন যুগে বেগম রোকেয়ার ন্যায় একজন মহীয়সী মহিলার আবির্ভাব না হলে এদেশের নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণ সম্ভবপর হত কি না সন্দেহ।

জন্ম ও পরিচয়

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহীরুদ্দীন মুহম্মদ আবু আলী সাবির। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এ পরিবারে পর্দাপ্রথা এত কঠোর ছিল যে মহিলারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাকরানি ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সামনেও বের হতেন না। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই রোকেয়াকেও পর্দা মেনে চলতে হত।

শিক্ষাজীবন

বেগম রোকেয়ার পরিবারে স্ত্রীলোকদের একমাত্র কুরআন শরীফ ছাড়া অন্য কিছু পড়তে দেওয়া হত না। পরিবারের লোক উর্দু ভাষায় কথা বলত। পুরুষেরা বাইরে ফারসি ও বাংলা পড়ত। পরিবারের প্রথা অনুযায়ী রোকেয়াকে বাড়িতেই কুরআন শরীফ পড়তে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য রোকেয়ার মন ছটফট করতে লাগল। এ বিষয়ে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইবরাহীমের সহায়তা পেতে লাগলেন। পিতা বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার ঘোর বিরোধী বলে রোকেয়ার দিনের বেলায় পড়াশুনার সুযোগ হত না। সেজন্য রাত্রিতে পিতা ঘুমালে ভাই বোনকে পড়াতেন এবং লিখতে শেখাতেন। এভাবে ভাইয়ের কাছে রোকেয়া গোপনে গোপনে লেখাপড়া করতে লাগলেন। তাঁর বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ দেখে ভাইও তাঁকে যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। এ সময় হতেই মুসলিম নারীসমাজের দুর্গতির কথা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং কীভাবে তাদের দুঃখ দূর হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি নানারূপ চিন্তা করতে থাকেন।

বিবাহ

বিহারের ভাগলপুরে রোকেয়ার বিবাহ হয়। তাঁর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হুসাইন ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি রোকেয়ার শিক্ষার ব্যাপারে সহায়তা করতে থাকেন। এতে রোকেয়ার বিদ্যাচর্চার পথ পূর্বাপেক্ষা সুগম হয়।

কর্মজীবন

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে সাখাওয়াত হুসাইন অকালে পরলোকগমন করেন। রোকেয়া শ্বশুরালয় ভাগলপুরে এক স্কুল খুলে

সেখানকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করতে মনস্থ করেন। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য তাঁকে স্বামীগৃহ ছেড়ে কলিকাতায় চলে আসতে হয়। এখানে তিনি তাঁর স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথমত তিনি একটি ক্ষুদ্র গলিতে আট জন ছাত্রী নিয়ে একটি স্কুল খুলে তাঁর স্বামীর নামানুসারে এর নাম দিলেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। এভাবে তিনি মুসলিম নারীসমাজকে গড়ে তুলবার জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে লাগলেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে রক্ষণশীলদের বিরোধিতার কারণে তাঁকে অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

মুসলিম নারীজাগরণের পথিকৃৎ

বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম নারীআন্দোলনের জন্মদাত্রী। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতীন-ই-ইসলাম' নামে একটি মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

সাহিত্যসাধনা

স্কুল পরিচালনাকাজে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও বেগম রোকেয়া সাহিত্যচর্চা করতেন। *পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন ও অবরোধবাসিনী* প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

মৃত্যু

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বেগম রোকেয়া শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জাতির শ্রদ্ধা

বেগম রোকেয়ার স্মৃতি ও অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকায় একটি প্রধান সড়কের নাম হয়েছে 'রোকেয়া সরণী'; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তম ছাত্রীনিবাসের নাম রাখা হয়েছে 'রোকেয়া হল'। বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ গ্রামে নির্মিত হচ্ছে 'রোকেয়া কমপ্লেক্স'। তা ছাড়া বাংলা একাডেমী থেকে তাঁর রচনাসমগ্র প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে নারীদের স্বীকৃতিপ্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার 'রোকেয়া পদক' প্রবর্তন করেছে।

উপসংহার

বাংলার অনগ্রসর মুসলিম নারীদের জাগরণ ও শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বেগম রোকেয়া অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল। 🕮

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সূচনা

বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য প্রতিভার নাম কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। মাত্র একুশ বছরের জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যকে যা দিয়েছেন তার তুলনা নেই। তাঁর অনন্য কাব্যধারা তাঁকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অমর করে রেখেছে।

জন্ম ও বংশপরিচয়

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৩৩৩ সালে ৩০শে শ্রাবণ কলকাতায় মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মায়ের নাম সুনীতি দেবী। সুকান্তের পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের ফরিদপুরে।

শৈশবকাল

সুকান্তের শৈশব কেটেছে একটি একান্নবর্তী পরিবারে। এই বৃহৎ পরিবারে কিশোর সুকান্ত রামায়ণ–মহাভারত পড়েছিলেন মায়ের কাছে। জ্যাঠামশায়ের মেয়ে রাণী দিদির অপার স্নেহে বালক সুকান্ত মানুষ হয়েছিলেন। নিতান্ত অল্পবয়সে সুকান্তের মায়ের মৃত্যু হয়।

সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ

ছোটবেলা থেকেই সুকান্তের মনে সাহিত্যের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ছিল। নানা দিকের দুঃখময় পরিবেশে তিনি মানুষ

হয়েছিলেন। সুকান্তের বাল্য বয়সের প্রথম দিকে তাঁর কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয় 'সঞ্চয়' পত্রিকায়। কমলা বিদ্যা মন্দিরের কয়েকজন ছাত্র মিলে এই হাতে-লেখা পত্রিকাটি বের করেছিল। প্রকৃতপক্ষে যে-বয়স খেলাধুলার বা হইহল্লা করার বয়স, সুকান্ত তখন তাঁর বেদনাবিধুর লেখা দিয়ে ভরে তুলেছিলেন কবিতার খাতা। এ সময় তিনি রচনা করেছিলেন তিনটি গীতচিত্র, 'রাখাল ছেলে', 'মধু মালতী' ও 'সূর্য প্রণাম'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও মানুষের দুঃখকষ্ট কিশোর সুকান্তের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর বাল্য বয়সের কবিতায়ও দেখা যায় অন্যায়, অবিচার ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

নজরুলের উত্তরসূরি

সুকান্ত ছিলেন নজরুলেরই উত্তরসূরি। নজরুল যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন সুকান্তও অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছিলেন তাদেরই বিরুদ্ধে। সুকান্ত রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজের হাতে পোস্টার লাগিয়েছেন দেয়ালে। সভা আর মিছিলে গিয়ে দিয়েছেন উচ্চকণ্ঠের স্লোগান। সুকান্তর জীবনেও নজরুল-জীবনের মতো কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি যা বিশ্বাস করতেন ও ভালোবাসতেন তা লিখেছেন মনের আবেগ দিয়ে।

রাজনীতিসচেতনতা, কিশোরবাহিনী গঠন

সুকান্ত গড়ে তুলেছিলেন 'কিশোরবাহিনী'। ১৯৪৩-এ বোম্বাইয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র নৌবিদ্রোহ হয়। কবি সুকান্ত সেই বিদ্রোহের কথা ফুটিয়ে তোলেন তাঁর কবিতায়—

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তারি দিন পঞ্জিকা লিখে
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।

বাংলা সাহিত্যে নতুন সুর

সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে নতুন সুর ও বাণী বয়ে এনেছেন। যে-চাঁদকে নিয়ে কবিরা অজস্র কবিতা লিখেছেন, তিনি সেই পূর্ণিমার চাঁদকেই কল্পনা করলেন ঝলসানো রুটি বলে। তিনি লিখলেন— 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' তিনি ঘোষণা করলেন নতুন ছাড়পত্র, গাইলেন নবজাতকের গান। সুকান্ত তাঁর 'ছাড়পত্র' কবিতায় ঘোষণা করলেন—

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে।
চলে যেতে হবে আমাদের।
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

গল্পকথার মতো করে প্রতীকী বর্ণনায় 'সিঁড়ি', 'সিগারেট', 'মোরগ', 'কলম' প্রভৃতি কবিতায় সুকান্ত নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। সুকান্তের বিখ্যাত কবিতা 'রানার' আমাদের সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

বাংলা সাহিত্যে সুকান্তের অবদান

সুকান্তের কাব্যচর্চার কাল মাত্র পাঁচ বছর— ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল। এই পাঁচ বছরের কাব্যচর্চার ফলও কবি ছাপানো দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ছাড়পত্র*। ১৩৫৫ সনে বের হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ' *ঘুম নেই*। ১৩৫৭ সনে কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *মিঠে কড়া* প্রকাশিত হয়। এরপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় কবির *গীতিগুচ্ছ* নামক গানের সংকলন ও *পূর্বাভাস* কাব্যগ্রন্থ। সুকান্ত *অভিযান* আর *সূর্য প্রণাম* নামে দুটি রূপক-নাটকও লিখেছিলেন। সুকান্তের লেখা চিঠিগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় একজন কল্পনাপ্রবণ ও দুঃখী সুকান্তকে। বিদ্রোহী কবি নজরুলের মতো সুকান্ত অত্যন্ত অল্প সময় কাব্যচর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন।

উপসংহার

সুকান্তের অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। প্রায় বিনা চিকিৎসা আর অবহেলায় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে অসামান্য প্রতিভাধর কবি সুকান্ত মারা যান মাত্র একুশ বছর বয়সে, ১৯৪৭ সালের ২রা জুলাই, কলকাতায়। তারুণ্য, উদ্দীপনা, সংগ্রাম ও সাধারণ মানুষের কবিতা লিখেছেন সুকান্ত। তাই বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন তিনি। 📖

প্রিয় লেখক

পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন

প্রিয় কবি

জসীমউদ্‌দীন আমার প্রিয় কবি, কারণ তাঁর কবিতা আমার মনকে দেয় দোলা, হৃদয়কে করে আলোড়িত। কবি তাঁর এক কিশোর বন্ধুকে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন –

আম-কাঁঠালের বনের ধারে শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস করব সারা রাতি
চাঁদ মুখে তোর চাঁদের চুমো মাখিয়ে দেব সুখে
তারা ফুলের মালা গাঁথি জড়িয়ে দেব বুকে।

কবি যেন সে নিমন্ত্রণ নিজেই গ্রহণ করেছেন আজ। কবি নিজেই চিরদিনের জন্য আম-কাঁঠালের ছায়াঘেরা বনের পাশে আঁচল পেতে শুয়ে আছেন ।

জন্ম

কবি জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনসারউদ্‌দীন মোল্লা। তিনি ছিলেন ফরিদপুর হিতৈষী পাঠশালার শিক্ষক।

তাঁর কবিতার জনপ্রিয়তার কারণ

জসীমউদ্‌দীন গ্রামবাংলার মানুষের কাছে এক প্রিয় নাম। তার কারণ মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখের কথাকে তিনি আবেগ দিয়ে সহজ ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের 'কবর', 'প্রতিদান', 'পল্লী জননী', 'অন্ধবধূ' প্রভৃতি কবিতায় এই একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। 'কবর' কবিতায় প্রথম দুটি লাইন—

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যভাষা সহজ-সরল হলেও নানা উপমা ও প্রতীকে অপূর্ব সুন্দর। গ্রামবাংলার জীবনচিত্র তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। প্রত্যেক বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে অতিপরিচিত বৃদ্ধ দাদু জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে নিজের দুঃখগাথা বর্ণনা করে যখন প্রার্থনা করেন খোদার কাছে, তখন যেন প্রত্যেক পাঠকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে—

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর
জোড় হাতে দাদু মোনাজাত কর "আয় খোদা! রহমান,
ভেস্ত নাজিল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ।"

'পল্লী জননী' কবিতায়ও কবি জসীমউদ্‌দীন এমনিভাবে গ্রাম-জীবনের এক স্নেহাতুর মায়ের বেদনার কথা এঁকেছেন। 'ফুটবল খেলোয়াড়' কবিতায় ইমদাদ হকের ফুটবল-প্রীতির বাস্তব চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে কবি বর্ণনা করেছেন।

কাব্যপরিচিতি

জসীমউদ্‌দীনের অমর কাব্যগ্রন্থ *নকশী কাঁথার মাঠ* ও *সোজন বাদিয়ার ঘাট*। এ দুটি কাব্যগ্রন্থে কবি বাংলার গ্রামীণ জীবনের ছবিকে, স্নেহ-ভালোবাসা, বিরহ-মিলন ও দ্বন্দ্বের ছবিকে এতই জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন যে, মনে হয় এখানেই যেন স্পষ্ট দেখতে পাই গ্রামবাংলার জীবন। সেই শিমুলতলী আর উজানতলী গাঁ অমর হয়ে আছে কবির লেখায়। কবির *রাখালী*, *ধান খেত* ও *বালুচর* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও সেই একই গ্রামবাংলার ছবি। *এক পয়সার বাঁশী* ও *হাসু* কাব্যগ্রন্থে কবির শিশু-প্রীতির পরিচয় মেলে। শুধু কবিতা নয়, কবি জসীমউদ্‌দীন রচনা করেছেন সুন্দর ভ্রমণকাহিনী *হলদে পরীর দেশে*, আর তাঁর অনবদ্য আত্মজীবনীমূলক রচনা *জীবন কথা* ও *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়*। তাঁর গদ্যলেখা প্রাণের রসে যেমন তাজা তেমনি কোমল। জসীমউদ্‌দীনের জীবনকথা পড়ে একজন পাঠক লিখেছিলেন 'যেন মায়ের হাতে পিঠা খাইতেছি।'

কবির জন্মশতবার্ষিকী

২০০৬ সালের জানুয়ারিতে জসীমউদ্‌দীনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঢাকায় নজরুল ইনস্টিটিউট ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও কবির জন্মস্থান ফরিদপুর শহরেও ব্যাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও পালিত হয়েছে কবির জন্মশতবার্ষিকী।

উপসংহার

জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা পড়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতা ও গবেষক ড. দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছিলেন– 'আমি হিন্দু, বেদ আমার নিকট পবিত্র, কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের কবিতা আমার কাছে আরও পবিত্র।' জসীমউদ্‌দীনের কবিতা দীনেশচন্দ্র সেনের মতো আমার কাছেও তেমনি পবিত্র, তেমনি প্রিয়। আমার প্রিয় কবি জসীমউদ্‌দীন, বাংলার প্রাণপ্রিয় কবি জসীমউদ্‌দীন। তিনি বাংলার প্রকৃতির কবি, পল্লীজীবনের রূপকার, বাংলার আবহমান জনমানুষের জীবনধারার চিত্রকর। 📖

বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

ভূমিকা

বাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের নিরন্তর সাথী, আজীবন সংগ্রামী এক নেতার নাম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। নির্মোহ, নির্লোভ, ক্ষমতার বাইরে থেকে চিরকাল দেশের মানুষের পক্ষে যে নেতা কথা বলেছেন তাঁর নাম মওলানা ভাসানী। অত্যাচারিত বা মজলুম মানুষের নেতা হিসেবে তাঁর নামের আগে যোগ হয়েছে 'মজলুম জননেতা'।

জন্ম

১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষকপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আবদুল হামিদ খান। তাঁর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান ও মায়ের নাম মজিরন বিবি।

শিক্ষা

শৈশবেই আবদুল হামিদ খান মাতৃপিতৃহীন হন। চাচার কাছেই তিনি আশ্রয় পান এবং তাঁর আদর-স্নেহেই শৈশবে মাদ্রাসায় পড়াশুনা শুরু করেন। তবে মাদ্রাসার পড়া তাঁর শেষ হয়নি।

ভারতের দেওবন্দ গমন

ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা ইসলাম শিক্ষার একটি প্রখ্যাত স্থান হিসেবে ব্রিটিশশাসিত ভারতে খ্যাতি লাভ করে। আবদুল হামিদ এক পীরের অনুকূলে দেওবন্দ যান পড়াশোনা করতে। এখানেই তিনি প্রথম দেশপ্রেমের দীক্ষা পান।

কর্মজীবন

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় টাঙ্গাইলের কাগমারিতে একটি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে।

রাজনীতি

জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের রাজনৈতিক জীবন তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি দেশবন্ধুর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। বাইশ বছর বয়সে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন। জমিদার-বিরোধী আন্দোলনের জন্য তিনি ব্রিটিশ শাসকদের রোষানলে পড়েন। এজন্য তাঁকে জন্মভূমি সিরাজগঞ্জ ছাড়তে হয়। তিনি চলে যান সুদূর আসামে। এখানে এসে তিনি সাধারণ কৃষকদের পাশে দাঁড়ান। তিনি আসামের বাঙালি-বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন। আসামের ধুবড়ির ভাসান চরের বাঙালি কৃষকদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। তাদের পক্ষে তিনি বিশাল জনসভার আয়োজন করেন। ভাসান চরের লোকেরা তাঁকে উপাধি দেন 'ভাসানী'। তখন থেকে তিনি পরিচিতি লাভ করেন আবদুল হামিদ খান ভাসানী নামে।

দেশে প্রত্যাবর্তন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গে তথা পূর্বপাকিস্তানে চলে আসেন। তিনি ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এ সময় তিনি সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। 'ইত্তেফাক' পরবর্তীকালে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়।

কারাজীবন

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জীবনে অনেকবার কারারুদ্ধ হন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানি শাসকদের কাছে এক ভীতিকর নাম, প্রতিবাদী মানুষ। ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ১৯৪৯ সালে তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। অতঃপর ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের জন্য গ্রেপ্তারসহ বহুবার কারারুদ্ধ হন তিনি। ১৯৫৪ সালে তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

কাগমারি সম্মেলন

১৯৫৭ সালে তাঁর নেতৃত্ব ও আহ্বানে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে আন্তর্জাতিক কাগমারি সম্মেলন হয়। দেশ-বিদেশের অনেক খ্যাতিমান নেতা, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী অংশ নেন এতে। এ সম্মেলনে তিনি জোরালোভাবে পাক-মার্কিন চুক্তির সমালোচনা করেন এবং এই প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সংগে মতভেদ হওয়ায় আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

পাকিস্তান আর নয়

মওলানা ভাসানী তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে বুঝতে পেরেছিলেন, দিনের পর দিন পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়ে বাঙালিদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি ১৯৫৬ সালেই পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাঙালার বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। ১৯৭০ সালে নভেম্বরে ঢাকায় পল্টনের বিশাল জনসভায় তিনি 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ

মওলানা ভাসানী ১৯৭১ সালে টাঙ্গাইল ছেড়ে ভারতে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা সদস্য হিসেবে কাজ করেন।

বাংলাদেশে ভাসানীর রাজনীতি

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও তাঁর প্রতিবাদী নেতৃত্ব অটুট ছিল। তিনি ভারতের ফারাক্কা বাঁধ তৈরির প্রতিবাদে ফারাক্কা বাঁধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন, মিছিল করেন, দেশে ও বিদেশে সবার দৃষ্টি ফেরান এদিকে।

বিদেশ ভ্রমণ

মওলানা ভাসানী একাধিকবার চীন, ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশ ভ্রমণ করেন। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি শান্তির সপক্ষের ও সাধারণ মানুষের নেতা হিসেবে সম্মান লাভ করেন।

পত্রিকা সম্পাদনা ও শিক্ষানুরাগ

মওলানা ভাসানীর সম্পাদনায় পাক্ষিক 'হক কথা' পত্রিকা অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মহসীন কলেজ ও ঢাকায় আবুজর গিফারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

মৃত্যু

এদেশের ভাগ্যবঞ্চিত জনগণের অবিসংবাদিত নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর ৯৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

উপসংহার

মওলানা ভাসানী আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। নির্লোভ, নির্মোহ, প্রগতিশীল চিন্তার সঙ্গে তিনি সাধারণ জীবনযাপন ও মানুষের কল্যাণ কামনা করে গেছেন সারা জীবন। 🕮

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির জনক, সংগ্রামী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের কোটি মানুষের কাছে একটি প্রিয় নাম।

জন্ম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম সায়রা খাতুন।

শিক্ষা

শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের সীমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে মেট্রিক, ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই. এ. ও ১৯৪৬ সালে একই কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন।

রাজনীতি

ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন তিনি। তিনি তাঁর স্নেহ, আনুকূল্য ও দিকনির্দেশনায় সক্রিয় রাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে এগুতে থাকেন। ছাত্রজীবনে তিনি 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ', 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে কাজ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হন। এসময় তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ববঙ্গের মানুষের ওপর পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও শাসন চলতে থাকে। পূর্ববাংলাকে মুক্ত করাই তখন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার সময় থেকেই পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। ফলে ১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে।

ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে শুরু হয় তীব্র পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুকে এসময় কারারুদ্ধ করা হয়।

৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট যে-মন্ত্রিসভা গঠন করে, বঙ্গাবন্ধু ঐ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন। আইয়ুব খান ক্ষমতা হাতে নিয়ে বিনা কারণে বঙ্গাবন্ধুকে কয়েক বছর কারারুদ্ধ করে রাখেন। ১৯৬৬ সালে জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গাবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৬ দফা আন্দোলন ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

৬ দফা আন্দোলনের জন্য তাঁকে আবারও কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৯৬৯ সনের প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ২২শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গাবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। সারাদেশে প্রবল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে প্রস্থান করেন।

অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে জয়ী হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বেআইনি ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ বঙ্গাবন্ধু দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে ইয়াহিয়া সরকারকে অচল করে দেন।

বঙ্গাবন্ধু ৭ই মার্চ-এর ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান জানান ও স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বলেন—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ সংগ্রাম যখন চরম রূপ ধারণ করে তখন বর্বর ইয়াহিয়া সরকার নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলার বুকে এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ঐ রাতে বঙ্গাবন্ধু বন্দি হন।

তাঁকে পাকিস্তানের কারাগারে আটক করে রাখা হয়। এরপর এদেশে আরম্ভ হয় দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম, গ্রামেগঞ্জে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় এদেশের আপামর জনগণ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক ও সকল পেশাজীবী।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

মুক্ত ও স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ব্রিটিশ রাজকীয় জেট বিমানযোগে বঙ্গাবন্ধু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আগমন করেন। বঙ্গাবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতি হন।

বাংলাভাষা ও বঙ্গাবন্ধু

১৯৭৪ সালে বঙ্গাবন্ধুই সর্বপ্রথম জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার আসন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পর বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এটি ছিল একটি গৌরবজনক ঘটনা।

মৃত্যু

১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট ভোররাতে তিনি কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী সামরিক অফিসারের হাতে সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ড ছিল বর্বরোচিত। বঙ্গাবন্ধুকে টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে সমাধিস্থ করা হয়।

উপসংহার

বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা ও বন্ধু ছিলেন শেখ মুজিব। তাই তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়

'বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গবন্ধু চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন কোটি কোটি বাঙালির প্রাণে, পৃথিবীর সমুদয় বাংলা ভাষাভাষীদের স্মৃতিতে। বাংলা ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই লিখেছেন —

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান। 📖

বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী

সূচনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

জন্ম

মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর সুনামগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে সিলেট সরকারি হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক ও ১৯৩৮ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন

১৯৪০ সনে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে অফিসার হিসেবে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি ক্যাপ্টেন পদে ও ১৯৪২ সনে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মেজর পদে উন্নীত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু তিনি সিভিল সার্ভিসে না গিয়ে সেনাবাহিনীতেই থেকে যান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের ৭ই অক্টোবর তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট' গঠনে সক্রিয় অবদান রাখেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তিনি ছিলেন সবসময় তৎপর। ১৯৫৬ সালে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হন। ১৯৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

১৯৭১ সালের মার্চে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এসময় স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী গঠিত হয়। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে সার্বভৌম বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে অত্যন্ত সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল তিনি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

রাজনীতি

তিনি ১৯৭২ সালে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। এ বছরই তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন ও মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি।

মৃত্যু

১৯৮৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি লন্ডনে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সিলেটে হযরত শাহজালাল (রা)-এর মাজারসংলগ্ন কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়।

দুঃসময়ের বন্ধু

জেনারেল ওসমানী ছিলেন বাঙালি জাতির দুঃসময়ের বন্ধু। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকাকালে তিনি ছিলেন অবহেলিত বাঙালি সৈনিকদের অভিভাবক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও

সেনাবাহিনী প্রধান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে যখন পুনঃপুন রাজনৈতিক দুর্যোগ ও সমস্যা দেখা দেয় তখনও তিনি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেন।

চরিত্র

ওসমানী ছিলেন দৃঢ়চেতা, কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ও আদর্শবাদী ব্যক্তিত্ব। অন্যায়ের কাছে তিনি কোনো সময় মাথা নত করেননি। অথচ এই সুকঠোর সামরিক শৃঙ্খলায় শিক্ষিত মানুষটির মন ছিল কুসুমের মতো কোমল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীল ও স্নেহপরায়ণ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। তিনি ছিলেন চিরকুমার। ওসমানী পশুপাখি খুব ভালোবাসতেন। তাঁর ছিল কয়েকটি পোষা কুকুর।

সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ

জেনারেল ওসমানীর অসীম অবদানের কথা স্মরণ করে জাতি তাঁকে 'বঙ্গবীর' উপাধি দিয়েছে। তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য সিলেট শহরে ১৯৮৫ সালে স্থাপিত হয়েছে 'ওসমানী স্মৃতি সংসদ' এবং ঢাকায় নির্মিত হয়েছে 'ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন' ও 'ওসমানী উদ্যান'। সিলেট বিমানবন্দরের নাম তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত।

উপসংহার

বাংলার সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানীর কথা জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। 📖

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

[সংকেত]

সূচনা— সাধারণ মানুষ ও কৃষকের বন্ধু— জন্ম ও বংশ—পরিচয়— ১৮৭৩ সালের ২৬শে অক্টোবর ঝালকাঠি জেলার সাতুরিয়া গ্রামে। শিক্ষাজীবন–কর্মজীবন–রাজনীতি–অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী—শিক্ষাবিস্তারে অবদান—কৃষকের অকৃত্রিম বন্ধু—ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন—ধনী মহাজনদের হাত থেকে গরিব প্রজাদের রক্ষার জন্য তাঁর চেষ্টা—বাংলার মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন শেরে বাংলা—মৃত্যু ১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল ঢাকায়। উপসংহার—মৃত্যুহীন প্রাণ, সর্বস্তরের ভালোবাসার মানুষ। 📖

চিন্তামূলক প্রবন্ধ

বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা মানুষের চরিত্রের ভূষণ। মানবজীবনের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য নম্র ও বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীতে যত মহামানব ছিলেন সবাই বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। লোক যত নম্র ও বিনয়ী হয় ততই তার মর্যাদা উন্নত হয়। কবি সত্যি বলেছেন : "আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।" যে বংশমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, সে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ না হলে তার বংশমর্যাদার, আভিজাত্যের কোনো মূল্য নেই। যে অহংকার পরিত্যাগ করে ফলবান বৃক্ষের ন্যায় গুণভারে নুয়ে পড়ে, সে-ই প্রকৃত মানুষ। আল–কুরআনে আল্লাহ বলেন, "আমি তাদের পরকালে শাস্তি দেব না, যারা উদ্ধত স্বভাবের নয়, আর যারা অন্যের অনিষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করে না।"

উদ্ধত স্বভাবের লোককে কেউ ভালোবাসে না। ঔদ্ধত্য চরিত্র মাধুর্য নষ্ট করে; অহংকার বাড়িয়ে দেয়। অহংকার মানুষকে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়। অহমিকা মানুষকে আত্মচিন্তায় বিভোর রাখে। অপরের প্রতি তার কর্তব্যবোধ ও পরমতসহিষ্ণুতা তাকে সমাজের কল্যাণকামী মানুষে পরিণত করে তুলতে পারে, কিন্তু আত্মম্ভরিতা ও অহংকার তাকে তা থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

জ্ঞানী লোকেরা বলেন বিদ্যা বিনয়জননী। বিদ্যায় জ্ঞানের প্রসারতা বাড়ে; আর জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী, ভদ্র ও নম্র হতে শেখায়। উদ্ধত রূঢ় স্বভাবের মানুষ, অবিনয়ী, অভদ্র ও অনম্র হয়। তারা তাদের মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যায়। তারা মানুষকে মানুষের সম্মান দিতে পারে না, নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে। মানবচরিত্রের যতগুলো সৎগুণ রয়েছে তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতাই সর্বোচ্চ।

পরের উপকার ও পরের কল্যাণ অহমিকা বা দাম্ভিকতায় সম্পন্ন হয় না। দাম্ভিকতা জীবনে ধ্বংস আনে, আনে অকল্যাণ। যিনি ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলকে সমভাবে ভালোবাসতে পারেন তিনিই প্রকৃত মানুষ। আর তা একমাত্র নম্রতা দ্বারাই সম্ভব। অবিনয়ী পরোপকারীকেও কেউ ভালোবাসে না। তাকে সবাই ঘৃণা করে, অসম্মান করে। তাই ইসলামে বিনয় ও নম্র ব্যবহারের প্রতি এত তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

অহংকার সব অবস্থায় পরিত্যাজ্য। কেননা, আল্লাহ অহংকারীদের ভালোবাসেন না। হযরত রাসুলে করিম (স) বলেছেন 'যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য বিনয়ী মনোভাব পোষণ করে, আল্লাহ তাদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।' কাজেই সবার সামনে বিনয়ী হতে হবে, সব কাজে নম্র হতে হবে।

অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে। তাই বলা হয়েছে—অহংকারই পতনের মূল। প্রত্যেকেরই মনে করা উচিত যে, সে অপর সকল মানুষের মতোই একজন মানুষ। সবাইকে মহান প্রতিপালক ও স্রষ্টা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।

বিনয় ও নম্রতা দ্বারা মানুষ পরম শত্রুকেও বশ করতে পারে। ঔদ্ধত্যে পরম বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হয়। অহংকারের কারণে সাধক পুরুষের সাধনা ব্যর্থ হয়। আবার সাধারণ মানুষও মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিনয় ও নম্রতায় আত্মম্ভরিতা বিসর্জন দিয়ে স্বীয় সাধনায় উন্নতিলাভে সমর্থ হয়। যে আল্লাহর পথে বিনয়ী ও নম্র হয় আল্লাহ তাকে উন্নত করেন। যে অহংকারী হয় আল্লাহ তাকে অপমানিত করেন। সে নিজের কাছে বড় কিন্তু লোকচক্ষে হেয়।

মানবসমাজকে সুখী, সমৃদ্ধ ও বাসোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য যুগে যুগে মানুষ নানাভাবে শিক্ষার মহড়া দেয়। আর সে-শিক্ষা মানুষের কল্যাণে তথা বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত হলেই প্রকৃত আদর্শ গড়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন ও আত্মমর্যাদাবোধ মানুষকে জ্ঞানের ভান্ডার উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে। আর জ্ঞানেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায় নিহিত। বিনীত না হলে আমাদের জ্ঞানও সীমিত ও নিম্নস্তরের হয়ে পড়ে। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সন্তানসন্ততি, প্রতিবেশী, দেশ ও বিশ্ববাসী সবারই প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে। আর সে কর্তব্যসম্পাদনে তখনই সফল হওয়া সহজতর ও সম্ভবপর হয়, যখন সেবার মনোভাবের সঙ্গে বিনয় মিশ্রিত থাকে। একজন অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করায়, একজন দুস্থকে পরিত্রাণ করায় যদি অহমিকার মিশ্রণ না থাকে তবেই তা কৃতজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হয়। মানুষ একে অন্যের ভাই—একথা ভুলে গেলে চলবে না।

বিনয়ের মানে এই নয় যে, উচিত কাজ বা কথার সময়ও চুপ করে থাকতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য, সুন্দর ও কল্যাণের জন্য বিনয় ও নম্র ব্যবহার যতখানি প্রয়োজন, প্রয়োজনমতো সৎসাহস ও সৎ চরিত্রের প্রমাণ দেওয়াও ততখানি মানবতার অনুসারী। একথা সবসময় স্মরণ রেখে আমাদের ভদ্র, বিনয়ী ও নম্র হতে হবে। এতে সত্যিকার মনুষ্যচরিত্র গঠনের সুযোগ পাওয়া যাবে। বিনয় ও নম্রতা মানুষকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে, আর অহংকার মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। মহত্ত্ব, দয়া, বিনয় ও নম্রতা অহংকারীর স্বভাব থেকে বিদায় নেয়। তার চরিত্রে দেখা দেয় উন্নাসিকতা ও আত্মম্ভরিতা। অহংকার তাকে লোভমোহমদমাৎসর্য—এসব তামসিকতায় কলুষিত করে আর এর সাথে জড়িত হয় স্বার্থপরতা।

স্বার্থপর মানুষ অহংবোধে অন্ধ হয়ে যায়। তখন অন্যের কথা, অপরের জন্য বিবেচনা, যা সভ্যতার পূর্বশর্ত ও মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য, তা মনে থাকে না। সে তখন জ্ঞান ও মানবতা হারিয়ে ষড়রিপুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। স্বার্থান্ধ মানুষ কেবল আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

কাজেই, মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত হতে হলে তার অন্তরের সব অহমিকা দূর করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে যে, ছোট শিশুর কাছেও তার শিক্ষণীয় রয়েছে। একদা একজন লোক জ্ঞানী লোকমান হেকিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হুজুর, আপনি এত জ্ঞান কোথা থেকে পেলেন? তিনি জবাবে বললেন, আহম্মকের কাছ থেকে। অর্থাৎ আহম্মক যা করে তার বিপরীত কর্মই হবে বুদ্ধিমানের। আর তা ছাড়া নিজের অন্তরে বিনয় না থাকলে শিক্ষার আগ্রহ ও কৌতূহল থাকে না। কাজেই তখন জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

কাজেই অহমিকা ত্যাগ করে বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র হতে হবে। 'বিনয়ের জয়, অহংকারে ক্ষয়'–এ কথাটি সবসময় মনে রাখলে মন থেকে অহংকার দূর হয় এবং বিনয়ভূষণে ভূষিত হওয়া যায়। [ড. কাজী দীন মুহম্মদ]

উচ্ছৃঙ্খলতা

[সাধু ভাষায় লেখা রচনার উদাহরণ]

উচ্ছৃঙ্খলতা মানে যথেচ্ছাচার, নিয়ম বা বিধিবিরোধিতা। মন নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খলতার উৎপত্তি। যাহাতে মন নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা হ্রাস পায়। মন নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রধান উপায় কোনো ব্রতকে কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া অটুটভাবে তাহা রক্ষা করার অনবরত চেষ্টা করা। দৈনিক কোন সময় কী কাজ কতক্ষণ কীরূপে করিতে হইবে স্থির করিয়া কিছুকাল সেই নিয়মগুলি অবিচলিতভাবে রক্ষা করিলে মন সংযত হইবে; উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে।

যখন যাহা মনে হইল তখন তাহা করিলাম, কোনো কার্য করিবার জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম, কিন্তু অপর কোনো কার্যানুরোধে তাহা অবহেলা করিলাম, কোন সময় কোন কার্য করা হইবে তাহার স্থিরতা নাই, এইরূপভাবে যাঁহারা জীবনযাপন করেন, তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হওয়া সুকঠিন।

দৈনিক কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করিয়া অক্ষতভাবে তাহা পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কর্তব্যসাধনের নির্দিষ্ট সময়ে তাহা করিতে হইবে, এই ভাব সর্বদা মনে জাগরূক রাখিতে হইবে। অদ্য অপরাহ্ণ আট ঘটিকার সময়ে আমার কোনো একটি নির্দিষ্ট কর্তব্যকার্য করিতে হইবে, সাতটার সময় কাহারও সহিত আমোদপ্রমোদে এমনই উন্মত্ত হইয়া পড়িলাম যে, আটটার সময় তাহা করা হইল না– উহা অপেক্ষা উচ্ছৃঙ্খলতাবর্ধক কিছুই নাই। কার্যপ্রণালি নির্ধারণপূর্বক তাহা সযত্নে যাঁহারা পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদের স্ব স্ব অবস্থা ও সাংসারিক কার্য অনুযায়ী একটি কার্যপ্রণালি প্রস্তুত করিয়া তাহার অনুসরণ করা নিতান্ত কর্তব্য। দৃঢ়ভাবে ইহা করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে।

উচ্ছৃঙ্খলতার এক প্রধান কারণ নিরঙ্কুশভাবে বিহার। যাহাদিগের কোনো নেতা নাই, তাহারাই নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। তাই কোনো ভক্তিভাজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদেশানুসারে চলা উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহারের একটি প্রধান উপায়। সৈনিক যেমন সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশের সম্পূর্ণ অধীন থাকে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না, তেমনি কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আজ্ঞাধীন হইয়া সর্বদা তাহার আদেশানুসারে কার্য করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা কমিয়া যায়। স্বেচ্ছাচার দমন করা নিতান্ত আবশ্যক।

এই সৌরজগত কীরূপ বিধিনির্দিষ্ট নিয়মাধীন থাকিয়া সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে তাহা চিন্তা করিলে উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। চারিদিকে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব কী সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। সূর্য প্রত্যেকদিন নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হইতেছে। চন্দ্রের ষোলকলা নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষয় পাইতেছে; অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদি যাহার যে, দিন যেভাবে যতটুকু চলিবার নিয়ম, সে সেইদিন সেইভাবে ততটুকু চলিতেছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত– ছয় ঋতু নির্দিষ্ট চক্রে ঘুরিতেছে। অগ্নি নির্দিষ্ট নিয়মে তাপ দিতেছে; বায়ু নির্দিষ্ট নিয়মে বহিতেছে; মেঘ নির্দিষ্ট নিয়মে সঞ্চারিত হইতেছে– ইহা চিন্তা করিলে, নির্দিষ্ট নিয়ম ত্যাগ করিয়া কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় কে আপনার জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল করিবে?

যিনি কিঞ্চিতমাত্র অনুধাবন করিয়া দেখেন, তিনি দেখিতে পান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় একটি সুন্দর বিধি কার্য করিতেছে। সেই বিধির নিকটে মস্তক অবনত করিয়া যিনি আপনার জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই ভাগ্যবান। তাঁহার যত বয়স বৃদ্ধি হয়, তিনি ততই আনন্দ সঞ্চয় করিতে থাকেন। আর যিনি তাহা না দেখিয়া তরঙ্গায়িত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় আপনার জীবন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলেন, তিনি হতভাগ্য; তাঁহার যত বয়স বৃদ্ধি হয়, ততই তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকেন ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। আমরা যেন সকলে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিয়া এ জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি। [অশ্বিনীকুমার দত্ত] 🕮

স্বাবলম্বন

সূচনা

কারও ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার নাম স্বাবলম্বন। শাব্দিকভাবে স্ব-অবলম্বন বা নিজের কাজ নিজে করা, নিজের ওপর নির্ভরশীলতাই স্বাবলম্বন।

নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আত্মনির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মানবজাতির প্রতি নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন– 'যে জাতি তার আপন ভাগ্য পরিবর্তন করে না, আল্লাহ তার ভাগ্য পরিবর্তন করেন না।' এই বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন করলে স্পষ্ট বোঝা যায় আল্লাহ মানুষকে স্বাবলম্বী হতে বলেছেন। ইংরেজিতেও একটি প্রবাদ আছে –God helps those who help themselves.

জীবনের সার্থকতা

যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল তার জীবন সার্থক। কারণ পরের ওপর নির্ভরশীলতা দ্বারা মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে না। যে ব্যক্তি পরনির্ভরশীল সে আত্মশক্তির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, প্রতি কাজে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এরকম উদ্যমহীন মানুষের জীবনে কোনো সাফল্য বা গৌরব আসে না। যে লোক মনে করে তার সব কাজে কেউ-না-কেউ এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, তার কষ্ট লাঘব হবে, এ ধরনের চিন্তা ও মানসিকতা মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, তার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয় না। এ ধরনের মানুষ সমাজে কাম্য হতে পারে না।

স্বাবলম্বনের সুফল

স্বাবলম্বন মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে, তার মধ্যে একটা সহজাত সম্মানবোধ ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে।

স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত

পরনির্ভরশীল ব্যক্তি যেমন জীবনসংগ্রামের কঠিন পথে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না, তেমনি তাকে বার বার পর্যুদস্ত হতে হয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রকৃতির মধ্যে, জীবজন্তুর মধ্যে, এমনকি কীটপতঙ্গের মধ্যেও আমরা স্বাবলম্বনের যে চরম দৃষ্টান্ত দেখি তা আমাদের জীবনে আচরণীয়। বাবুই পাখি তার আপন ক্ষুদ্র বাসাটি বহু পরিশ্রমের পর নিজেই গড়ে তোলে, পিপীলিকা আপন ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে সঞ্চয় করে তার খাদ্য, মৌমাছি কত দীর্ঘ দিনের একত্র প্রচেষ্টায় তৈরি করে একটি মৌচাক – এ সবই স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত।

স্বাবলম্বী হওয়ার অনুশীলন

স্বাবলম্বন এমনিতেই মানুষের জীবনে দেখা দেয় না। সুষ্ঠু শিক্ষার মধ্য দিয়ে এ সম্পদ করায়ত্ত করতে হয়। বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয় ও গৃহে এ স্বাবলম্বনের শিক্ষা দিতে হয়। যারা জীবনের প্রথম বয়স থেকেই পরের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পায় এবং সেভাবেই গড়ে ওঠে তাদের দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে মহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু যারা জীবনের প্রত্যূষ থেকেই অপরের সাহায্যের প্রত্যাশায় না থেকে কাজ করে তারা দাঁড়াতে পারে আপন পায়ে। ছোট শিশু আপন চেষ্টায় বার বার আছাড় খেয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শেখে। গাছ মাটি থেকে রস আহরণ করেই ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে।

বাল্যকাল থেকে যদি মানুষ আপন পায়ে দাঁড়াতে শেখে তা হলে মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে আত্মশক্তির অধিকারী হতে পারে। জ্ঞানীর জ্ঞানসাধনা ও বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানসাধনার সার্থকতার জন্য স্বাবলম্বন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা

যুগে যুগে স্বাবলম্বী ও স্বপ্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষেরাই মানুষের ভালোবাসা লাভ করেছেন। প্রত্যেক মানুষ কৃতী পুরুষেরই আদর্শ অনুসরণ করে। আপন সাধনা দ্বারা যিনি জগতে কিছুই লাভ করতে পারেননি তিনি পৃথিবীকেও দিতে পারেন না কিছুই। সুতরাং গৌরব অর্জনের জন্য প্রয়োজন স্বাবলম্বন।

ব্যক্তিগতভাবে স্বাবলম্বন যেমন বিশেষ প্রয়োজনীয়, জাতিগতভাবেও এর প্রয়োজন অপরিহার্য। জগতে এমন অনেক জাতি আছে যারা অন্নবস্ত্রের জন্য পরের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে এ ঘৃণ্য মনোভাব সম্ভব নয়।

উপসংহার

বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশ হলেও একটি গৌরবদীপ্ত আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে আমরা সম্মানিত। কিন্তু আমাদের সম্মুখে রয়েছে কঠিন ও কঠোর পথ। এ পথ অতিক্রমের জন্য প্রয়োজন স্বাবলম্বন। 🕮

দয়া

সূচনা

অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রকাশ ও অন্যের দুঃখমোচনের ইচ্ছার নাম দয়া। দয়া মানবচরিত্রের একটি মহৎ গুণ। নির্দয় লোকের হৃদয় পাথরের মতো কঠিন। পরের চোখে জল দেখে তাদের মন নরম হয় না। পরের দুঃখ-বিষাদ, পরের আবেদন-নিবেদন তাদের মনে কোনো প্রকার দয়ার চিহ্ন আঁকতে পারে না। নির্দয় লোক পরপীড়নে আনন্দ লাভ করে থাকে। নির্দয় লোক প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও পাপী।

দয়াবানের পরিচয়

দুঃখীর দুঃখ মোচন, শোকগ্রস্তকে শোকে সান্ত্বনা দেওয়া, বিপন্নকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা—এগুলোই দয়াবানের কাজ। মানুষ যাতে পরস্পর সহায়তা করে পরমসুখে কালযাপন করতে পারে, এই অভিপ্রায়ে পরম করুণাময় আল্লাহ মনুষ্যহৃদয়ে দয়ার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অবস্থাবিশেষে দয়া ও দানের কাজেও সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। দুঃখমোচন যেমন ধর্মের কাজ, ভিক্ষা ব্যবসায়ের প্রশ্রয় দেওয়াও সেইরূপ অপকর্ম। কর্মক্ষম ব্যক্তিকে ভিক্ষা দেওয়া আর সমাজের বা দেশের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা প্রায়ই সমান। এইরূপ দয়া প্রকাশে দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সহায়তা করা হয়।

প্রকৃত দান

অনেক দয়াবান বা দানশীল ব্যক্তি তাঁদের ধনসম্পদ লোকহিতকর কার্যে ব্যয় করে থাকেন। কেউ দেশবাসীর উপকারার্থে দিঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পান্থশালা নির্মাণ, বিদ্যালয় স্থাপন ও রোগীর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে দয়া ও দানশীলতার কাজ করে থাকেন। অনেকে ধর্মকার্যোপলক্ষে দরিদ্র লোকদিগকে অন্নবস্ত্রাদি দান করে থাকেন। অনেক লোক সমাজে বরণীয় হওয়ার আশায় লোকদেখানো দান করে থাকেন। এটা খ্যাতির জন্য দান, এতে অহংকার ও অভিমান জন্মে। প্রকৃত দানশীল ব্যক্তি প্রশংসা বা খ্যাতিলাভের জন্য দান করেন না। তাঁরা কর্তব্যের তাগিদে গোপনে দান করে থাকেন। কেননা, দানে গোপনীয়তা অবলম্বন করাই মহত্ত্বের লক্ষণ।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

সকল ধর্মশাস্ত্রেই দান পুণ্যকাজ বলে স্বীকৃত হয়েছে। দুঃখীর দুঃখ ও অভাব মোচন করে যেরূপ নির্মল আনন্দ লাভ করা যায় এইরূপ আর কিছুতেই হয় না। এই পৃথিবীতে অন্ধ, খোঁড়া, পঙ্গু প্রভৃতি কত অক্ষম লোক কেবল লোকের দয়া ও দানশীলতার ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করছে। মানবহৃদয়ে দয়া না থাকলে এ সকল উপায়হীন লোক আরও সীমাহীন দুঃখে পতিত হত। দয়া ও দানশীলতায় লোকের মন উদার হয়। দয়াবান ব্যক্তি পশুপাখি ইত্যাদি প্রাণীর প্রতিও সদয় ব্যবহার করে থাকেন।

উপসংহার

দানধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। লোকদেখানোর জন্য দানধর্ম আর ব্যয় করা অর্ধমের মধ্যেই পড়ে। অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ দান করে যাঁরা সমাজে দানশীল হিসেবে খ্যাতি পেতে চান তাদের কোনোদিন সম্মানিত হওয়া তো দূরের কথা বরং তাঁরা নিন্দনীয়। 🕮

ঋতুবৈচিত্র্য

বাংলাদেশের ষড়ঋতু

ভূমিকা

বাংলার ঋতুবৈচিত্র্যই প্রকৃতি ও জীবনে নতুন রূপ, নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। প্রতিটি ঋতুই এদেশে স্বতন্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়। সারা পৃথিবীর আবহাওয়ায় ঋতু চারটি। কিন্তু বাংলার ছয়মাত্রিক ঋতু প্রকৃতি ও জীবনে গতিময় ছন্দ এনে দেয়। কবির ভাষায় :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।

ঋতু রঙ্গময়ী বাংলার নাম তাই সোনার বাংলা, রূপসী বাংলা, শস্যশ্যামল, সুজলা, সুফলা বাংলা নামে পরিচিত। একজন ইংরেজ লেখক বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন –'Bangladesh is the favourite play ground of nature decorated with six seasons।' এককথায় বলা যায়, বাংলাদেশ একটি ঋতুরঙ্গশালা। বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব বাঙালির দেহমনে, কাব্যসাহিত্য ও সংগীতে, ধর্মেকর্মে বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান।

বাংলার ষড়ঋতু

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত –এই ছয় ঋতুর জালবোনা এই বাংলাদেশ। এক ঋতু যায়, আসে অন্য ঋতু। যেন রূপসী বাংলার প্রকৃতি জুড়ে রূপসাগরের ঢেউ বয়ে বয়ে যায় ঋতুপরিক্রমায়। বিচিত্ররূপের পসরা সাজিয়ে প্রকৃতি উপহার দেয় নতুন নতুন ফুল, ফল ও ফসল। কবির ভাষায় :

ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুল ও ফলে।

গ্রীষ্মকাল

বাংলার প্রকৃতির নাট্যশালায় গ্রীষ্ম যেন প্রথম দৃশ্যের মতো। গ্রীষ্ম আসে তার দুরন্ত ও রুদ্র রূপ নিয়ে। তখন সবুজ প্রকৃতি হারিয়ে যায়। ঝড়ধুলো উড়িয়ে মত্ত কালবৈশাখী ছুটে আসে যেন দুরন্ত প্রাণবান পুরুষ, সবকিছু তছনছ করে। খালবিল, নদীনালা শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড রৌদ্রের দাবদাহ রুদ্ধ করে দেয় জীবনের গতি।

বর্ষাকাল

হঠাৎ উধাও হয়ে যায় খরতপ্ত গ্রীষ্ম। রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় দৃশ্যে ধীরে ধীরে ধূসর আকাশে জমে ওঠে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। গাঢ় হতে থাকে মেঘের স্তূপ। মেঘ ঘন গৌরবে আসে হরষিত বর্ষা। আষাঢ় ও শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। যেন প্রকৃতি জুড়ে ছড়িয়ে দেয় মায়ার কাজল। কবি বলেন –

আমি বর্ষা আসিলাম গ্রীষ্ম প্রদাহ শেষ করি
মায়ার কাজল চোখে, মমতায় বর্মপুট ভরি।

খাল, বিল, নদী, মাঠ, প্রান্তর পানিতে ভরে যায়। বনে বনে কদম ফোটে। কৃষকেরা মাঠে মাঠে ধান রোপণ করে। পথঘাট কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। গ্রামগুলো জলমগ্ন দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে থাকে নীরবে। তবে নদী নৌকায় বেড়ে যায় কর্ম–কোলাহল।

শরৎকাল

ভাদ্র ও আশ্বিন—এই দুই মাস শরৎকাল। শিউলি ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে আসে শরৎঋতু। শরতের নীলাকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ উড়ে যায়। কখনও গাঢ় নীল স্বচ্ছ আকাশ শান্ত নদীকে ছুঁয়ে থাকে। নদীর তীরে সাদা কাশবন। মালা গেঁথে সাদা বকের সারি উড়ে উড়ে চলে। শরৎ আশ্চর্য স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের পসরা ছড়িয়ে দেয় প্রকৃতিতে। বাংলার প্রকৃতি প্রাঙ্গণ মুখরিত হয় দুর্গাপূজার উৎসবে। এই প্রকৃতির পটভূমিতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
কী অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী...।

এ সময় শেফালী, কামিনী প্রভৃতি ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে বাতাসে।

হেমন্তকাল

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ–এই দুই মাস হেমন্তকাল। হেমন্তের প্রকৃতির রয়েছে নিজস্ব রূপ। একদিকে সোনার ফসল ঘরে তোলার আনন্দ, অন্যদিকে প্রকৃতিজুড়ে বিষণ্ণতা। সাদা কুয়াশার মতো পাতলা পর্দা টেনে দেয় প্রকৃতি। তবুও ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে লিখেছেন–

ধরার আঁচল ভরিয়ে দিলে প্রচুর সোনার ধানে
দিগঙ্গানার অঙ্গান আজ পূর্ণ তোমার দানে।

শীতকাল

পৌষ ও মাঘ–এই দুই মাস শীতকাল। অগ্রহায়ণ শেষ হতে না হতেই উত্তরের হাওয়ায় ভেসে আসে শীত– বাংলার ঘরে ঘরে। ভোরের ঘন কুয়াশা ও শিশিরের আস্তরণে শীতের প্রকৃতি রিক্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, বিভিন্ন ফলমূলে, রং বেরঙের ফুল প্রকৃতি ভরিয়ে তোলে। শাকসবজির শোভায় প্রকৃতির মালঞ্চ ভরে ওঠে। প্রচণ্ড শীতে সীমাহীন কষ্ট হয় জনজীবনে। তবুও শীতের আনন্দ রোমাঞ্চকর। কবিগুরুর ভাষায়–

শীতের হাওয়া লাগল আজি
আমলকীর ঐ ডালে ডালে।

বসন্তকাল

ফাল্গুন ও চৈত্র–এই দুই মাস বসন্তকাল। শীতের শেষে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। উত্তরের হাওয়ার গতি দেখে হঠাৎ শুরু হয় দক্ষিণা হাওয়া। গাছে গাছে নতুন পত্রপল্লব, ফুলে ফুলে সজ্জিত কুঞ্জকানন। কোকিলের কুহুতান। মানুষের প্রাণে মনে রঙ ছড়ায়। আমের মুকুলে ঘটে বসন্তের অভিষেক। অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল যেন গাছে গাছে ডালে ডালে লাল আগুন ছড়িয়ে দেয়। প্রাণে প্রাণে বাজে মিলনের সংগীত–

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে আমাদের।
অথবা
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে।

বসন্ত খুবই ক্ষণস্থায়ী ঋতু। চৈত্রের শুরুতেই আবার প্রকৃতিতে পালাবদল শুরু হয়। চৈত্রসঙ্ক্রান্তির পরই এসে পড়ে গ্রীষ্মকাল। কখন অজান্তেই মিলিয়ে যায় বসন্তের শিহরিত রূপ।

কী মনোরম দেশটি আমার
কৃষক দেখি ধান করে
ঋতুর সাথে তাল মিলিয়ে
বনের পাখিরা গান করে।

উপসংহার

সত্যিই অপরূপ বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য, বিচিত্র তার প্রকৃতির রূপ। তাই কবির ভাষায় আবার বলি– 'ধন্য আমরা জন্মেছি এই দেশে। ধন্য আমরা এই বাংলাকে ভালোবেসে।' 🕮

বর্ষায় বাংলাদেশ

সূচনা

কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরী ডাকিছে সঘনে
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।

ঋতু রঙ্গময় দেশ বাংলাদেশ। প্রত্যেক ঋতুর আগমনে এখানে অতুলনীয় এক রূপ ধারণ করে। কদম্ব, কেতকী, যুথিকা,

গন্ধরাজ, হাসনাহেনার গন্ধবাহার বর্ষাপ্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রকাশ। তাই বসন্তকে ঋতুরাজ বললেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বর্ষাও আমাদের প্রিয়।

বর্ষার সময়

আষাঢ় ও শ্রাবণ—এ দুমাস বর্ষাকাল। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের দেশে বর্ষার আগমন অনেক আগেই ঘটে যায়। যেমন— জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষা আরম্ভ হয়ে আশ্বিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গ্রীষ্মের পর 'অতি ভৈরব হরষে' সজল গুরুগম্ভীর বর্ষার আগমন। বর্ষা বাংলাদেশের আকাশে ও মাটিতে আনে রং ও রসের অফুরন্ত উপহার। বৃক্ষপল্লব সুশোভিত হয়, মাঠে মাঠে শুরু হয় ধান রোপণের পালা। বর্ষায় মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর, নদী-নালা, খাল-বিল জলপূর্ণ হয়ে যায়। খরতপ্ত দিনের অবসান হয়ে মাটির বুক থেকে অঙ্কুরিত হয় শস্যশিশুর দল। তাদের দেহে নব-অঙ্কুরের জয় পতাকা। আসে পুষ্প বিকাশের লগ্ন। রূপরস-বর্ণ-শব্দ-গন্ধ-গীতে বর্ষার সমারোহ-উৎসবে বাংলাদেশের আকাশবাতাস ভরে ওঠে। কবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভসরসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

বর্ষার রূপ

দূরে শ্যামল গ্রাম, আদিগন্ত জলবিস্তারে শস্যশিশুর নৃত্য, আকাশে কৃষ্ণ ধূসর মেঘবিন্যাস, দিগন্তবিলাসী বকপীর নিরুদ্দেশ যাত্রা। শস্যবিচিত্রা পৃথিবীর জ্বালাময় প্রান্তরে কৃষকদের সংগীতমুখরতা। আকাশের বুক থেকে বৃষ্টি নেমে আসে। এমন দিনে ঘরে বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তাই কবি গেয়েছেন—

নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

বর্ষাকালে নৌকা, ডিঙি, ভেলা প্রভৃতি চলাফেরা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কৃষকরা বৃষ্টিতে ভিজে ফসল তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে। কারণ বর্ষাকাল পাট কাটার ও ধান চাষের উপযুক্ত সময়।

বর্ষার উপকারিতা

বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে দেশের সমস্ত ময়লা ধুয়ে মুছে দূর হয়ে যায়। এ সময়ে তরুলতা, গাছপালা প্রভৃতি খুব সতেজ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিতে দেখা যায় রকমারি ফলের আয়োজন, বিচিত্র ফসলের সম্ভার। নদীপথে যাতায়াত এবং পরিবহন হয় সহজ, সরল ও প্রশস্ত।

বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনে বর্ষা

বাংলার কৃষক এই ঋতুতে বীজ বোনে, চারাগাছ তোলে এবং রোপণ করে। হেমন্তে খামারে এ সময়ে সোনার ধান ওঠে। বর্ষাই বাংলাকে করেছে শস্যশ্যামল। বাংলার অন্নবস্ত্র, তার সমস্ত ঐশ্বর্য বর্ষার দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল। বর্ষা বাঙালির মনোভূমিকেও করেছে সরস ও কাব্যময়। অর্থনৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে সে তার সাংস্কৃতিক জীবনও গঠন করে দিয়েছে। রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষ রোপণ, শেষ-বর্ষণ বর্ষারই অবদান।

অপকারিতা

বর্ষার গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি বর্ষার অপকারিতাও কম নয়। বৃষ্টির পানিতে পল্লীর রাস্তাঘাট কাদায় ভরে ওঠে এবং কোনো কোনো জায়গা পানিতে ডুবে যায়, চলাচলের হয় অসুবিধা। দিনমজুরেরা হয় ঘরে আবদ্ধ; তাদের দুঃখের সীমা থাকে না। ভাঙা চালা দিয়ে পানি পড়ে ঘর ভেসে যায়। মরুবিজয়ের কেতন উড়িয়ে মেঘের গুরু-গুরু মাদল বাজিয়ে দক্ষিণ কোণ হতে ঝরে পড়ে বর্ষা। উত্তর কোণ হতে নেমে আসে ভয়ংকরী বন্যা। এসময় দূষিত পানি পানের ফলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগ মহামারি আকার ধারণ করে।

মানবমনে বর্ষার প্রভাব

বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছায়ায় বনভূমি শ্যামল হয়ে ওঠে। বর্ষা মনকে সহজ, সরল ও সৃষ্টিশীল করে তোলে। মন হয় উদাস। এমন দিনে মন যেন কারও নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। তাই কবি জসীমউদ্‌দীন বলেছেন–

আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছল ছল জলধারে
বেনুবনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।

উপসংহার

মোটের উপর অপূর্ব রূপশ্রী বর্ষা আসে এই দেশে। এর অপকারের চেয়ে উপকার অনেক বেশি। বর্ষা না হলে আমাদের দেশ মরুভূমিতে পরিণত হত। শুধু বর্ষার কারণেই এদেশ সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলরূপে পরিপূর্ণ। 🕮

চরিত্র গঠনমূলক প্রবন্ধ

চরিত্র

ভূমিকা

চরিত্র মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কথা, কাজ ও চিন্তায় পবিত্র গুণাবলির দ্বারা গড়ে ওঠে চরিত্র। চরিত্রগঠন মানুষের সাধনার ফল। চরিত্রবান মানুষ সমাজের সর্বত্র সম্মানিত হন। সকলের কাছেই থাকে তাঁর শ্রদ্ধা ও সমাদর। তিনি হয়ে ওঠেন অনুসরণীয় ব্যক্তি।

চরিত্র কী

মহত্তম মানবিক গুণাবলির নাম চরিত্র। চরিত্রের মধ্যেই মানুষের ব্যক্তিত্ব নিহিত থাকে। সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিনয় এবং ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলি যার মধ্যে আছে তাঁকে চরিত্রবান ব্যক্তি বলা যেতে পারে। চরিত্রবান ব্যক্তি ন্যায় ও সত্যের পথে অবিচল থাকেন। সততা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

চরিত্রগঠনের উপায়

পরিবার চরিত্রগঠনের প্রধান স্থান। এরপর সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে শিশুর চরিত্রের বিকাশ ঘটে। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে এসে শিশুর চরিত্র বিকশিত হতে থাকে। এ কারণে সৎসঙ্গ দরকার। প্রবাদে বলে 'সঙ্গদোষে লোহা ভাসে'। ভালো চরিত্রের মানুষের সঙ্গে মিশলে চারিত্রিক গুণাবলি ভালো হয়। আবার খারাপ সঙ্গ বা পরিবেশে মিশলে মানুষ চরিত্রহীন হতে পারে। এইজন্য পরিবার, সমাজ ও সৎসঙ্গের সান্নিধ্য, চরিত্রগঠনের জন্য নিয়ামক উপায়রূপে বিবেচিত। পিতামাতা ও শিক্ষক থেকে শুরু করে মহামানবের জীবনাদর্শ শিশুর জীবনকে প্রভাবিত করে। এ কারণে মহামানবদের জীবনী পাঠ করাও প্রয়োজন। রুজভেল্ট বলেছেন : 'চরিত্র গঠনের কাজ শিশুকাল থেকে মরণের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে।'

চরিত্র সম্পর্কে মূল্যায়ন

মানবজীবনে চরিত্রের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রগৌরব, সত্যপ্রিয়তা ও বিশ্বস্ততার জন্য আল–আমিন উপাধি লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের সমাজসংস্কারক, নেতৃবৃন্দসহ চরিত্রবান মানুষেরা এখনও নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল মহিমায় মানুষের মনে মনে যুগে যুগে বেঁচে আছেন। আগামীতেও বেঁচে থাকবেন। কারণ, সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে– 'শরীরংক্ষণ বিধ্বংসী কল্পান্ত স্থায়িনোগুণাঃ', অর্থাৎ শরীর অল্প সময়ের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর চরিত্র চিরস্থায়ী। তাই চরিত্রবান ব্যক্তিরা মানবইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকেন।

চরিত্রহীনতার কুফল

অসৎ ব্যক্তিরাই চরিত্রহীন। তারা সমাজে অসম্মানিত ও অমার্জিত ব্যক্তি। তাদের সকলে অবিশ্বাস এবং ঘৃণা করে। জীবদ্দশায় ঘৃণা করে, মৃত্যুর পরেও ঘৃণা করে। এমন ঘৃণিত ব্যক্তিরা হল মীরজাফর, একাত্তরের রাজাকার। তাই

মীরজাফর ও রাজাকার এখন গালিতে পরিণত হয়েছে। এই দুটো শব্দ দ্বারা জাতীয় ঘৃণা প্রকাশিত হয়। এমন ব্যক্তি সমাজে জন্মগ্রহণ করলে পুরো সমাজকে তারা লজ্জার মধ্যে ফেলে। এই লজ্জার গ্লানি বা কলঙ্ক সমাজ বহন করতে চায় না। তাই তাদের ত্যাগ করা সমীচীন। ফলে চরিত্রহীনরা শেষ পর্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করে।

উপসংহার

চরিত্র সাধনার ধন। সমাজে চরিত্রবান মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, সমাজ তত উপকৃত হবে। আমাদের মন পবিত্র, পুষ্পিত, পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও কল্যাণকর বুদ্ধির দ্বারা সুন্দর চরিত্রের সাধনা করা উচিত। এতে যেমন নিজের কল্যাণ হয়, তেমনি দেশ জাতি ও মানবসমাজ উপকৃত হয়। তাই চরিত্রবানরাই কীর্তিমান। আর জগতে কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। পক্ষান্তরে যাদের চরিত্র নেই, তাদের জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম সম্পদ কোনোকিছুই মূল্যবান নয়। বরং চরিত্রবান কীর্তিমান মানুষ জগতের জ্যোতি হয়ে বেঁচে থাকেন যুগ যুগান্তর ধরে। তাই কবি বলেন–

এমন জীবন করিবে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন। 📖

শিষ্টাচার

ভূমিকা

মানুষই মানুষকে মূল্যায়ন করে। আর মানুষের কর্ম ও আচরণ হচ্ছে সেই মূল্যায়নের মাপকাঠি। উন্নাসিক, অহংকারী, দাম্ভিক মানুষকে কেউ ভালোবাসে না। বরং বিনম্র, শালীন আচার-আচরণ এবং কর্মকৃতির জন্য মানুষ মানুষের হৃদয় জয় করে নিতে পারে। মানবচরিত্রের এই আকর্ষণীয় গুণাবলি তথা শিষ্টাচার মানুষকে দান করে অনন্য মাধুর্য। এই শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ হল মানুষের চারিত্রিক অলংকার। তাই তো কবি বলেন–

আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

শিষ্টাচার কী

মানবচরিত্রের রুচিশীল, বিনম্র আচার-আচরণ, সত্যবাদিতা, ভদ্রতা আর সুভাষণের দ্বারা যে শালীনতা ও সৌজন্যবোধ প্রকাশ পায় তাকে বলে শিষ্টাচার। মার্জিত সংস্কৃতিবান ব্যক্তির আচরণে শিষ্টাচারের মতো মহৎগুণ প্রকাশ পায়। পৃথিবীর জ্ঞানীগুণী ও মহামানবদের চরিত্রের প্রধান দিক হল শিষ্টাচার। তাঁরা মধুর ব্যবহার দ্বারা মানবমনকে জয় করে নিতে পারেন। এই আদর্শ সকলের অনুসরণ করা কর্তব্য।

শিষ্টাচারের গুরুত্ব

ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনে মানুষের শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দর আচরণ মানুষের ব্যক্তিজীবনকে নির্মল আনন্দ দান করে। দান করে অনাবিল সুখ ও সুনাম। শিষ্টাচারের মাধ্যমে ব্যক্তি তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে গড়ে তুলতে পারে অজস্র গুণগ্রাহী। পক্ষান্তরে শিষ্টাচারহীন মানুষের জীবনে বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। তার অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য ক্রমেই চারপাশে হাজারো শত্রু তৈরি হয়। তাঁর ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবনে দেখা দেয় অশান্তি। ফলে তাঁর জীবনের সাফল্য ও সুখলাভ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্যে প্রত্যেক মানুষের চিন্তায়, কর্মে, আচার-আচরণে শিষ্টাচার থাকা দরকার। শিষ্টাচারহীন মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও অশান্তি বিরাজ করে। তাই মানবজীবনে শিষ্টাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

শিষ্টাচার অর্জনের উপায়

শিষ্টাচারের মতো মহৎগুণ অর্জন করা একদিনে সম্ভব নয়। শিশুকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত এর অনুশীলন চলতে থাকে। শিশু যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং বড় হয় যে-পরিবেশে—তারও প্রভাব পড়ে। এই ব্যাপারে শিশু প্রাথমিক অনুশীলনের সুযোগ পায় বাবা-মায়ের কাছে। এ ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যে এসে শিষ্টাচারের সুযোগ পায়। কথায় বলে– 'ব্যবহার বংশের পরিচয়'। তেমনি– 'সৎসঙ্গে

স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ'। অথবা 'সঙ্গদোষে লোহা ভাসে'। এইসব উক্তির দ্বারা মূলত আচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়। এ ছাড়াও শিষ্টাচারের গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনপর্ব হচ্ছে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, কল্যাণবোধ, শুভচিন্তার দ্বারা জীবনের সোপান নির্মিত হয় এবং গড়ে ওঠে এক মহৎ জীবনের অঙ্গীকার। সেই অঙ্গীকার আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কর্মজীবনে প্রবেশের মাধ্যমে। প্রেম, মমতা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, দয়া ইত্যাদি সুকুমারবৃত্তির দ্বারা বিকশিত হয় মানুষের মানবিক দিক।

শিষ্টাচারহীনতার চিত্র ও প্রতিকার

শিষ্টাচারহীন মানুষই ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানুষ। এই ঔদ্ধত্য ও উন্নাসিকতা দিন দিন সমাজে, রাষ্ট্রে বেড়ে চলেছে। একারণে ব্যক্তি ও বিশ্বজীবনে অশান্তি বিরাজ করছে এবং তৈরি হয়েছে মানুষে মানুষে অসাম্য। এই অশান্তি, অকল্যাণ আর অশুভ থেকে মুক্তি পেতে মানুষকে গ্রহণ করতে হবে সুশিক্ষা। সংস্কৃতিচর্চা, ধর্মের অনুশীলন, আর রাষ্ট্রের সুশাসন খুব প্রয়োজন। প্রয়োজন আগামী প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে গড়ে তোলা। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। রাষ্ট্রসমাজে তারা নেতৃত্ব দেবে। তাই শিষ্টাচারের মতো মহৎ আদর্শ দিয়ে তাদের গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার

শিষ্টাচারহীন মানুষ অধম মানুষ, আর শিষ্টাচারপূর্ণ মানুষ উত্তম মানুষ। উত্তম মানুষ ছাড়া সমাজে ও রাষ্ট্রে সুখ-শান্তি বিরাজ করে না। শিষ্টাচার না থাকলে সমাজ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়। তাই অশান্তি, অবক্ষয় আর ধ্বংসের হাত থেকে মানবসভ্যতা বাঁচাতে হলে শিষ্টাচারের অনুশীলন করতে হবে। এই অনুশীলন হতে হবে ব্যক্তিপর্যায় থেকে সমাজ–রাষ্ট্র ও বিশ্বপর্যায় পর্যন্ত। 📖

শৃঙ্খলাবোধ

ভূমিকা

মহান দার্শনিক রুশো বলেছেন: 'Man is bron free, but everywhere he is in chain.' অর্থাৎ মানুষ মুক্তভাবে জন্মগ্রহণ করলেও প্রতিপদেই সে শৃঙ্খলিত। সত্যিকার অর্থে, এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই নিয়মের অধীন। প্রকৃতিজগতেও নিয়মের একটু ব্যত্যয় হলে পৃথিবীতে ও মানবজীবনে নেমে আসে বিপর্যয় । তাই মানবজীবনও প্রকৃতির মতোই সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। প্রকৃতি ও মানুষ একই স্থানে প্রোথিত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন— 'প্রকৃতির-রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্বত্রই শৃঙ্খলা।' প্রাণিজগতে মানুষই বুদ্ধিবৃত্তিক জীব। মানুষের মননশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ ও উন্নতচিন্তা পরিপূর্ণ জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ব্যাপার।

শৃঙ্খলাবোধ কী

শৃঙ্খলাবোধ বলতে জীবনযাপনে নিয়মনীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি আনুগত্যকে বোঝায়। অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিত, সচেতন, সৎজীবনাদর্শের রীতিনীতিকে বলে শৃঙ্খলাবোধ। কোনো মানুষই তার খেয়ালখুশিমতো চলতে পারে না। গভীর জীবনপ্রত্যয়, অধ্যবসায়, আর সুনিয়ন্ত্রিত সাধনার মাধ্যমে মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং মানবিক কল্যাণ ও আদর্শের প্রতি যথাযথ অনুগত থেকে জীবনপরিচালনার এই মানবিক প্রত্যয়ই হল শৃঙ্খলাবোধ। সমাজে, রাষ্ট্রে এবং ব্যক্তিজীবনে এই শৃঙ্খলাবোধ যত দৃঢ় হবে মানবিক সমৃদ্ধি ততই উন্নত হবে, অটুট হবে।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব

মানবকল্যাণের জন্য শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মকানুন, আইন, রীতিনীতি, প্রচলিত আদর্শ ও মূল্যবোধ মেনেই মানুষকে কঠোর সাধনার মাধ্যমে জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হয়। এর ফলে মানবজীবনে ও সমাজে শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু শৃঙ্খলাহীন স্বেচ্ছাচারী জীবনের পরিণতি সুখকর হয় না। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে শান্তি বিনষ্ট হয়। শৃঙ্খলাহীন জীবন মাঝিহীন নৌকার মতো। তার পতন অবশ্যম্ভাবী। শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, বিপর্যয় আসে রাষ্ট্র ও বৃহত্তর মানবজীবনেও। তাই রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গঠন করেও তা

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যদিনা মানুষের নিজের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, মূল্যবোধ গড়ে ওঠে তা হলে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য নেমে আসে। সে সমাজ কারও কাম্য নয়। তাই ব্যক্তি ও সমাজকে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিতে হবে। সমাজকে নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ করে তুলে ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য সুখের আবাস গড়ে তুলতে হলে শৃঙ্খলাবোধ অত্যন্ত প্রয়োজন।

শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টির উপায়

সকল শিক্ষার প্রাথমিক সূতিকাগার হচ্ছে পরিবার। পারিবারিক সুশৃঙ্খল পরিবেশ-প্রতিবেশের মধ্যে শিশুকে বড় করে তুলতে হবে। তার ব্যক্তিত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থি কোনো আচরণ পরিবারে থাকা উচিত নয়। ন্যায়, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সত্যবাদিতা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, জ্ঞানানুরাগ এবং ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতিনীতির মধ্যে শিশুকে বড় করে তুলতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। উত্তরোত্তর এই শৃঙ্খলাবোধের মধ্য দিয়ে শিশু একদিন উন্নত চরিত্রের মানুষ হয়ে ওঠে। কর্মজীবনে দায়িত্ব, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ কার্যকর করে তোলার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবন যেমন সুখকর হয়, তেমনি সমাজজীবনেও আসে সুখ ও সমৃদ্ধি।

উপসংহার

একটি জাতি তখনই সুসভ্য হয়ে ওঠে, যখন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে শৃঙ্খলাবোধ ও সুন্দর মূল্যবোধ। আর যে-জাতির জীবনে শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ নেই, তারা অসভ্য জাতি। তাদের কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই। তাই একটি মর্যাদাবান জাতিগঠনে শৃঙ্খলাবোধ অত্যাবশ্যক। 🕮

সত্যবাদিতা

ভূমিকা

'Honesty is the best policy' বা 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'। কথাটি চিরন্তন সত্য। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎগুণ তার সততা বা সত্যবাদিতা। সত্যবাদিতাকে বলা হয় মানবচরিত্রের মুকুট। সত্যবাদিতা মানুষকে মর্যাদা ও গৌরব দান করে।

সত্যবাদিতার স্বরূপ

সৎ ও ন্যায়পরায়ণতার গুণকেই বলে সত্যবাদিতা। সৎগুণের অধিকারী ব্যক্তিই সত্যবাদী। সত্যবাদী মানুষ সবসময় সৎ জীবন যাপন করেন। এজন্যে তিনি নির্ভীক হন; দৃঢ়চিত্তের ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। কোনো অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে তিনি আপোস করেন না। সুতরাং সত্যবাদী মানুষের বৈশিষ্ট্য হল :

প্রথমত : তিনি সত্যের অনুসারী;

দ্বিতীয়ত : ন্যায় ও সৎ কাজে নির্ভীক;

তৃতীয়ত : অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন।

অপরদিকে, অসৎ ব্যক্তি ভীরু এবং কাপুরুষ। মিথ্যাবাদীকে সমাজে কেউ বিশ্বাস করে না। মিথ্যাচার মানবতার শত্রু। তাকে কেউ ক্ষমা করে না। কিন্তু সত্যবাদী মানুষ সমাজে নিরন্তর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করে। অন্যায়কে পরাজিত করে। তাই যুগে যুগে অনাচার, পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য যেমন ধর্মীয় মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনি এসেছে সাহসী, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব।

সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা

মানবচরিত্র ও সমাজকাঠামো টিকে থাকে সততার ওপর ভিত্তি করেই। সততা না থাকলে ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট হয়, ক্ষতি হয় সমাজেরও। একারণে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে সততার প্রয়োজন রয়েছে। যারা বিবেকহীন, অন্যায় ও অসৎ পথে পরিচালিত হয়, সমাজকে দুর্নীতির পঙ্কিলতায় দুর্গন্ধময় করে তোলে, তারা মানবতার শত্রু। এই শত্রুকে নিধন করা সত্যবাদীর কাজ। তার জন্য চেতনাগত আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। কারণ, মনে রাখতে হবে, বিবেকহীন মানুষ পশুর সমান। মানুষের মধ্যে বিচারবুদ্ধি, ন্যায়নীতি ও সততা আছে বলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে, উজ্জ্বল রাখতে, অম্লান রাখতে হলে প্রত্যেককেই সৎ হতে হবে, সত্যবাদী হতে হবে। সততার

চর্চা জীবনকে মহৎ করে, সুন্দর করে।

সততা অর্জনের উপায়

আপন আপন শিশুকে সৎ করে গড়ে তোলা পিতামাতার কর্তব্য। প্রথমত, শিশুকাল থেকেই পিতামাতা এই শিক্ষা দিয়ে শিশুকে বড় করে তুলবেন। দ্বিতীয়ত, পিতামাতার পর শিক্ষকের দায়িত্ব সর্বাধিক। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সৎ চরিত্র গঠনের নিয়ামক আদর্শ শিক্ষা দেন শিক্ষক। এই ব্যাপারে শিক্ষকসমাজকে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সৎ আর্দশ সমুন্নত রেখে যেন সারাজীবন চলতে পারে— এই শিক্ষা শিক্ষক দান করবেন। তৃতীয়ত, ব্যক্তি নিজেকে সৎ করে গড়ে তুলতে পারবেন যদি তিনি পৃথিবীর মহামানবদের জীবনাদর্শের যথাযথ অনুসরণ করেন। মানুষ যেন ত্যাগী হন, নির্মোহ হন, পরোপকারী হন এবং সততাপরিপন্থি কাজের জন্য তিরস্কৃত এবং সৎ কাজের জন্য পুরস্কৃত হন সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপসংহার

সততা মানুষের বিবেককে জাগ্রত রাখে। লোভ-লালসার উর্ধ্বে, হিংসা-বিদ্বেষের উর্ধ্বে, পবিত্রজীবন, শান্তিপূর্ণ জীবন–যাপনে সুখ লাভ করে সত্যবাদী মানুষ। জাগতিক সাময়িক বিড়ম্বনা হয়তো আসে, কিন্তু তার সুফল হয় চিরস্থায়ী। এমনকি, ইহকাল ও পরকাল— দুই-ই সুখের হয়। তাই সত্যবাদিতার মহৎ গুণ অর্জন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। 📖

অধ্যবসায়

ভূমিকা

অধ্যবসায় মানবজীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। অধ্যবসায়ের মতো মহৎগুণ যিনি অর্জন করতে পারেন, তাঁর জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়। অধ্যবসায় ছাড়া কারও জীবনে সাফল্য আসে না। জগতে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত ও বরণীয় হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কঠোর অধ্যবসায় করেছেন। কারণ জগতে মহৎ কোনোকিছুই সুলভ নয়। কঠোর শ্রম, ত্যাগ ও অধ্যবসায় দ্বারা তা অর্জন করতে হয়। জগৎ-সংসারের নিরবধি বাধা আর প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই মানুষকে সামনে অগ্রসর হতে হয়। এই অগ্রসর হবার মূল প্রেরণা হল অধ্যবসায়। কবির ভাষায় :

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?

অধ্যবসায় কী

সুন্দর ও মহৎ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুনিয়মের মাধ্যমে কাজ করার প্রচেষ্টাকেই বলে অধ্যবসায়। দৃঢ় সংকল্পবন্ধ হয়ে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। কারণ, প্রথম প্রচেষ্টায় সে-লক্ষ্য অর্জিত নাও হতে পারে। এজন্য সংকল্পচ্যুত হয়ে হতাশ হলে চলবে না। লক্ষ্য স্থির রেখে, সংকল্প দৃঢ় করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার নিরন্তর প্রয়াস থাকতে হবে। জীবনের ব্যর্থতাকেই সফলতার প্রথম সোপান মনে করে অগ্রসর হতে হবে।

অধ্যবসায়ের গুণ

অধ্যবসায় মানবচরিত্রের বৃহৎ ও মহৎ গুণ। এই বৃহৎ গুণ অর্জনের জন্য আরও কতিপয় মানবিক গুণের প্রয়োজন। তা হল— সৎ উদ্দেশ্য, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য ও মেধা এবং উদ্যম ও নিষ্ঠা। এইসব গুণের সম্মিলনে যে প্রেরণার সঞ্চার হয় তারই নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ী মানুষের ভাগ্যে জোটে বিজয়মাল্য।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা

মেধা ও প্রতিভাকে প্রজ্বলিত করে যে উৎসাহবহ্নি তার নাম অধ্যবসায়। যদি কেউ প্রতিভাবান এবং মেধাবী হন, কিন্তু অধ্যবসায়ী না হন, তবে তাঁর সাফল্য আসবে না। তাই জীবনে সকল সাফল্যের জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায়। আলস্য পরিহার করে মেধা, শ্রম ও প্রতিভাকে যথোপযুক্ত সময়ে কাজে লাগানো প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, অধ্যবসায় জীবনে আশার সঞ্চার করে। জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে।

অধ্যবসায়ের সুফল

পৃথিবীতে যাঁরা অমর হয়েছেন তাঁরা সকলেই অধ্যবসায়ী ছিলেন। জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানী জন্মগতভাবে প্রতিভা-জোরে বড় হননি। দীর্ঘদিনের সাধনা ও অধ্যবসায় তাঁদের প্রতিভাকে শাণিত করেছে, কর্মকৃতিতে সাফল্য এনে দিয়েছে। তাঁরা স্মরণীয় বরণীয় হয়েছেন। আজকের পৃথিবীর সামগ্রিক উন্নতির মূলে আছে যুগে যুগে মানুষের অধ্যবসায়ের ফল। মানুষ আকাশে ওড়ে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায়, সমুদ্রের তলদেশে বিচরণ করে, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব নব নব আবিষ্কারের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে এক পরিবারে পরিণত করেছে। মানুষের এই বিজয় দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ের ফলে সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, ব্যক্তি তার অধ্যবসায়ের ফলে সফল হয়েছে। কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা আরও কত ব্যক্তির কন্দনা আমরা করি—তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুচ অধ্যবসায়ী ছিলেন। তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন মাকড়সার অধ্যবসায় দেখে। বারবার একটি মাকড়সা কড়িকাঠে জাল বুনবার চেস্টা করে সপ্তমবারে সফল হল—এই দেখে রবার্ট ব্রুচ সপ্তমবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ইংরেজদের পরাজিত করেছিলেন। এরকম বহু ঘটনা আছে।

বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, আমার আবিষ্কারের প্রতিভা নয়, বহুবছরের অধ্যবসায়ের ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফল। যখন আমার সামনে যে-সমস্যা আসত, আমি তারই মীমাংসা করেছি—ক্রমে ক্রমে অস্পস্টতা থেকে স্পস্টতার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি। ফলে তাঁর জীবনে সুফল ও সাফল্য এসেছে।

আমাদের কর্তব্য

আমরা একটি উন্নয়নশীল দেশের মানুষ। এদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর নেই, কিন্তু প্রচুর জনসম্পদ আছে। এই জনসম্পদকে সঠিক কর্মপদ্ধতি ও অধ্যবসায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এতে যেমন ব্যক্তি উপকৃত হবে তেমনি দেশ ও জাতিরও উন্নতি হবে।

উপসংহার

অধ্যবসায়ই সৌভাগ্যের প্রসূতি। অধ্যবসায় ছাড়া কোনো ব্যক্তি, কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। জীবনের চলার পথ সুগম নয়, দুর্গম। তাই বলে সেই পথ অতিক্রম করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। জীবনকে প্রস্তুত করতে হবে সেই বাধা অতিক্রম করার জন্য। সুতরাং সকল কাজে অধ্যবসায় জীবনের ব্রত হতে হবে। ব্যর্থতার পরও সাফল্য আসবে অধ্যবসায় বা সাধনার দ্বারা। কারণ—

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে। 📖

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ

ভূমিকা

বৃক্ষলতা আপনা-আপনি বৃক্ষলতা। কিন্তু মানুষ সহজেই মানুষ নয়। মানবজীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে দরকার নৈতিক মূল্যবোধ। দরকার মনুষ্যত্ব অর্জন। এই মূল্যবোধ এবং মনুষ্যত্ব প্রসঙ্গো কাজী মোতাহের হোসেন চৌধুরী যথার্থই বলেছেন: 'জীবনবৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, তা-ই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোনো মালী গাছের গোড়ায় পানি ঢালে না। সমাজব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্যে নয়; মানুষের অন্তরের মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে আনন্দ জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে।' তবেই সমাজ ও জীবন সুন্দর হবে। নৈতিক মূল্যবোধহীন সমাজ বর্বর সমাজ, অসভ্যসমাজ। সেই জীবন ও সমাজ মানুষের কাম্য নয়। এই কারণেই সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা অপরিহার্য।

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ কী

শোভন রীতিনীতি ও আদর্শ অনুসারী জীবনচর্চার অভিব্যক্তিকেই বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ। নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অনুসৃত জীবনের মূল্যবোধকেই বলা হয় নৈতিকতা। মানবজীবনে ও সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজে কোনো অন্যায়-অবিচার, অশান্তি থাকতে পারে

না। তবে নিয়ম-নীতি থেকে মানুষ বিচ্যুত হলে নৈতিক মূল্যবোধেরও বিলুপ্তি ঘটে। তাই সমস্ত আত্মকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে উঠে তুচ্ছ ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে উদার মহান জীবনব্রত গ্রহণ করতে পারলেই নৈতিক মূল্যবোধ সৃজন করা সম্ভব।

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা

নৈতিক ও মানবিক গুণ দ্বারা সমাজকে সুন্দর করে তোলা প্রয়োজন। সত্যকে সত্য বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা এবং ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার ভেদাভেদ জেনে ও বুঝে চলা খুবই প্রয়োজন। নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ দেশ ও জাতির গর্ব। সমাজে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে সেই সমাজ ও জাতির গৌরব ততই বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই নৈতিকতার চর্চা করা উচিত।

নৈতিক মূল্যবোধের অভাব হলে অশান্তি বাড়বে। সামাজিক অসাম্য, অবিচার, সীমাহীন দুর্নীতি ইত্যাদি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলবে, মানবকল্যাণ ব্যাহত হবে। যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাস বেড়ে যাবে। বর্তমান বিশ্বসভ্যতায় ও ব্যক্তিজীবনে এই নৈতিক মূল্যবোধের অভাব ঘটায় সারা মানবসভ্যতা আজ অশান্ত। অকল্যাণের অশনিসংকেত ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তাই প্রত্যেকের উচিত নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা করা।

নৈতিক মূল্যবোধের অভাবের কারণ

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাবের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কারণ হল: যান্ত্রিক জীবনের বিস্তার এবং স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাওয়া, বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের আধিপত্য, গ্রামজীবনের যূথবদ্ধতা ভেঙে নগরজীবনে প্রবেশ, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়া, বেপরোয়া সভ্যতার ভোগবাদী আদর্শের প্রতি আগ্রহ, শিক্ষাব্যবস্থায় নীতিশিক্ষার অপ্রতুলতা, মহাপুরুষদের আদর্শ অনুসরণ না করা, অভিভাবকসহ সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অপরাধসমূহের প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করা ইত্যাদি।

নৈতিক মূল্যবোধহীনতার পরিণাম

নৈতিক মূল্যবোধহীনতার পরিণাম ভয়াবহ। বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা, সন্ত্রাস, খুনখারাপি, ছিনতাই, ঘুষ, দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বের অসুস্থতা আর মানবিক হাহাকারের খবর। এই অবস্থার নিরসন না হলে মানবসভ্যতা একদিন সত্যি সত্যি এক ভয়াবহ জটিল আকার ধারণ করবে । তখন মনে হবে, সারা বিশ্ব যেন আফ্রিকার গভীর গহিন জঙ্গালের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধের উপায়

দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতে হবে। এজন্য সমাজের সকল স্তরে ন্যায়নীতি ও সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। সুশাসন ও সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রসমাজকে উন্নত ও বিবেকসম্পন্ন, আদর্শ জীবন-অনুসারী করে গড়ে তুলতে হবে। যুবসমাজকে বিদেশি অপসংস্কৃতি, নেশা-আসক্তি ইত্যাদির মারাত্মক কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। সর্বস্তরে নীতিশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। সমাজের সুশাসনের পাশাপাশি সৎ ও ন্যায়বান প্রশাসক নিয়োগ করতে হবে। সবাই যেন সমাজে সমান মর্যাদা পায় এবং কোথাও যেন অসাম্য বিরাজ না করে সে ব্যাপারেও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপসংহার

পরিশেষে কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায় বলি : 'মানুষের সভ্যতা যতদূর উন্নত হয়েছে, ততদূর সফল হয়েছে মানুষের বিবেক।' তাই বিবেক দ্বারা নির্মিত এই বিশ্ব যেন অবিবেকের দ্বারা আক্রান্ত বা ধ্বংস না হয় সেদিকে সবার মনোযোগ দিতে হবে। বিবেকবান আগামী বিশ্ব আমাদের কাম্য। 🕮

ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভূমিকা

ছাত্রজীবন মানুষের জীবন গঠনের প্রস্তুতিকাল। এই সময়েই জীবনের আদর্শ কাঠামো তৈরি করতে হয়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে— 'Student life is seed time of life' অর্থাৎ জীবনের বীজবপনের সময় হচ্ছে ছাত্রজীবন।

জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে ছাত্রদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে সাধনা করতে হয়। তার জন্য অধ্যয়ন বা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে হয়। এই অধ্যয়নের পাশাপাশি ছাত্রদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি দেশ ও জাতির প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হবে। সমাজের কল্যাণকর সকল ক্ষেত্রেই ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য-পালন অপরিহার্য।

ছাত্রজীবন

কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষাজীবনে যে সময়কাল অতিবাহিত হয় তাকে ছাত্রজীবন বলে। মানুষ আমৃত্যু কোনো-না-কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে। তবুও সংসার ও কর্মজীবনের পূর্বে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বিদ্যার্জনের এই সময়টিই প্রকৃতপক্ষে ছাত্রজীবন। এই জীবন বড়ই মধুর ও সুন্দর। এই সময় একজন ছাত্র যে-মনুষ্যত্ব, যে-জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করে; যে-চিন্তাবীজ রোপণ করে, তা-ই তার ভবিষ্যতের সঞ্চয়। সেই শস্যই তার জীবনকে সার্থক করে, সুন্দর করে।

ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। এজন্য জীবনের পক্ষে যা ভালো ও কল্যাণকর তা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা ছাত্রদের কর্তব্য। যা কিছু মন্দ ও অকল্যাণকর তা ছাত্রজীবনেই ত্যাগ করা উচিত। আর এই উদ্দেশ্য সাধন শুধু বই পড়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। ছাত্রজীবনেই সমাজ, পরিপার্শ্ব, দেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ছাত্ররাই শিক্ষিত সমাজের বৃহত্তর অংশ। তাই তারা সমাজসচেতন। সমাজের সেবামূলক কাজের প্রতিও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থাকা প্রয়োজন। অধ্যয়নের অবসরে সেবামূলক কাজ করতে হবে। দেশের দুঃসময় ও দুর্যোগের সময়ে কঠোর দায়িত্ব নিজ উদ্যোগেই গ্রহণ করতে হবে। তাই প্রাথমিকভাবে ছাত্রজীবনে ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রতি মনোযোগী হতে হয়। ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রাথমিক শর্ত হল চরিত্র গঠন। ত্যাগ, সংযম, ধৈর্য, সততা, উদারতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি চরিত্রগঠনের সোপান। সেই সোপান বেয়ে জীবনকে উর্ধ্বে তুলে নিয়ে যাবার উপযুক্ত সময় ছাত্রজীবন। নিয়মানুবর্তিতা মানবচরিত্রের বড় গুণ। ছাত্রজীবনে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ অর্জন করতে হবে। প্রতিদিনের কর্মতালিকা প্রস্তুত করে সে অনুযায়ী কাজ করলে জীবনে সাফল্য আসবে। আলস্য জীবনের জন্য ক্ষতিকর। অলসজীবন ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করতে হবে। কবির ভাষায়—

পড়িতে পড়িতে যে জন খেলিতে চায়
সে জন কোথাও বিদ্যা নাহি পায়।

শিক্ষকের প্রতি, পিতামাতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা প্রয়োজন। সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনা করাও কর্তব্য। কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রচিন্তা পরিত্যাগ করে দেশজাতি ও মানুষের কল্যাণ, অগ্রগতি ও সংস্কারমুক্ত চিন্তা করা কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল, জগতের এই কল্যাণকর সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে, যদি কোনো মানুষ স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। একারণে ছাত্রজীবনেই স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।

ইংরেজিতেও একটি প্রবাদ আছে 'A sound mind is sound body' অর্থাৎ 'সুস্থ দেহ-ই সুন্দর মন'। কিংবা 'Health is wealth স্বাস্থ্যই সম্পদ'। এই সম্পদ ছাত্রজীবনেই অর্জন করতে হবে। এই কারণে ছাত্রজীবনে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন। আর একটি বড় বোধ ছাত্রদের থাকতে হবে– তা হল কারও স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজেদের ব্যবহার না করা। এজন্য প্রচলিত রাজনৈতিক কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হবে।

উপসংহার

জীবনসংগ্রামে নিজেকে প্রস্তুত করে গড়ে তোলার সময় ছাত্রজীবন। এই সময়ের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে জীবনের সৌধ। জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে কর্মে, চিন্তায়, দেহে ও মনে। মনে রাখতে হবে, কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই বাণী—

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন নিত্যকালের ডাক
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল
আমরা ছাত্রদল। 📖

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

সূচনা

শিক্ষা মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। শিক্ষা ছাড়া জীবন পূর্ণ হয় না। বলা হয়, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করে, সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করে, মানুষে মানুষে সম্মিলন হয় এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে করে অর্থবহ। জীবনের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষাই কর্মমুখী শিক্ষা। আজ পৃথিবী দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার সাথে কর্মমুখী শিক্ষার ফলেই তা সম্ভব হচ্ছে। কর্মের জন্যই আজ বিশ্বে কর্মমুখী শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কর্মমুখী শিক্ষা কী

যে শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো একটি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শিক্ষালাভ করে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে, তা-ই কর্মমুখী শিক্ষা। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে বেকারসমস্যার সমাধান দিতে পারছে না। তাই দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এ সমস্যার মোকাবেলা করতে হলে কর্মমুখী শিক্ষা চালু করা দরকার।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রকারভেদ

কর্মমুখী শিক্ষা দুই ধরনের। একটি হল— ডাক্তার, প্রকৌশলী এবং কৃষিবিদ যারা বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করে। তারা ইচ্ছেমতো স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে পারে। চাকরির আশায় তাদের বেকার থাকতে হয় না। অপরদিকে, সাধারণ কর্মমুখী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এজন্য সাধারণত প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষাই যথেস্ট। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কাহাকেও জীবিকার জন্য ভাবতে হয় না। এ জাতীয় শিক্ষার মধ্যে ধাত্রীবিদ্যা, সেলাই কাজ, কাঠমিস্ত্রির কাজ, দর্জির কাজ, ছাপাখানার কাজ, বই বাঁধাই, বিদ্যুতের কাজ, টেলিভিশন–বেতার–মোটর মেরামতের কাজ, ওয়েল্ডিং–এর কাজ, কারখানায় শ্রমিকের কাজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

আধুনিক সভ্যতায় বেঁচে থাকার জন্য নানা কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, জীবনযাত্রায় আমরা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও পরাধীন যুগের। এখনও ব্রিটিশদের কেরানি বানাবার শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত। গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষাব্যবস্থা ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করছে বটে, তা কর্মভিত্তিক না হওয়াতে ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে না। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তন জরুরি।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নানামাত্রিক। এ শিক্ষা বেকারত্বের নিদারুণ অভিশাপ থেকে ব্যক্তি ও দেশকে মুক্ত করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এ-শিক্ষা। এ-শিক্ষা নতুন নতুন কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেয়। কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তিকে আমরা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। তাই কর্মমুখী শিক্ষা আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। কর্মমুখী শিক্ষার ওপর যত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তত মজবুত হবে। তাই আমাদের উচিত এ-শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

প্রচলিত কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা

আমাদের দেশে বর্তমানে তিন স্তরবিশিষ্ট শিক্ষা প্রচলিত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা । এর সঙ্গে কারিগরি, প্রকৌশলী, ডাক্তারি, ভোকেশনাল ইত্যাদি কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থাও আছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার

দেশের ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্যে সরকার ও জনগণের প্রচেষ্টায় অধিক পরিমাণ কর্মমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। কৃষিকাজে সহায়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া কুটিরশিল্প, বয়নশিল্প, ডেইরিশিল্প ইত্যাদি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পাটকল, চিনিকল, ইস্পাতশিল্প, জাহাজশিল্প ইত্যাদিতে দক্ষ কারিগর হিসেবে কাজ করতে পারে এমন সহায়ক কর্মমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ওপরও জোর দিতে হবে। কর্মমুখী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও যুগোপযোগী নতুন নতুন বিষয়ে শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

উপসংহার

বিজ্ঞানের এই যুগে জীবনের চাহিদা মেটানোর জন্য কর্মমুখী শিক্ষার বিকল্প নেই। একমাত্র কর্মমুখী শিক্ষাই দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শারীরিক এবং মানসিক বিকাশসাধন। সাধারণ শিক্ষায় মানসিক বিকাশ ঘটে আর কর্মমুখী শিক্ষায় শারীরিক উন্নতি আসে। এমনি করে জীবনের সাথে শিক্ষার সমন্বয়ে জীবন হয় সমৃদ্ধ। আশার কথা, বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার লক্ষ করা যাচ্ছে। আগামীতে আমরা বিশ্বচ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমেই। 🕮

আদর্শ ছাত্রজীবন

[সংকেত]

সূচনা

মানুষের জীবন ঠিকমতো গড়ে তোলার উপযুক্ত সময় ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য—অধ্যয়নই প্রধান তপস্যা। স্বভাবগঠন–আদর্শ ছাত্রের স্বভাবগঠন। খেলাধুলা—খেলাধুলাও ছাত্রজীবনের অঙ্গ। সমাজসেবা ও নিয়মানুবর্তিতা—ছাত্রজীবনের গোড়া থেকেই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে। উপসংহার—জীবনকে আদর্শময় করে তোলার জন্য আদর্শের অনুশীলন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। 🕮

দুর্নীতি ও সামাজিক প্রতিরোধ

[সংকেত]

ভূমিকা

দুর্নীতির সংজ্ঞা ও ধরন—সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়—দুর্নীতিপরায়ণদের সামাজিকভাবে চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা—প্রাপ্য শাস্তি যেন হয়—দুর্নীতিমুক্ত সমাজগঠনে অঙ্গীকার—সমাজসচেতনতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা—উপসংহার। 🕮

বিদ্যালয়ে প্রথম দিন

[সংকেত]

সূচনা

মনে এক অজানা আশঙ্কা, মনে এক ধরনের রোমাঞ্চ—বাবা-মায়ের সঙ্গে স্কুলে গমন-এর পরের দিন আগেই ভর্তি পরীক্ষা—ফল প্রকাশ—নতুন বই খাতা পেন্সিল কেনার আয়োজন—বিদ্যালয়ে প্রথম দিন শিক্ষিকার নতুন মুখ—তার স্নেহমাখা ব্যবহারে বিদ্যালয়ের প্রতি ভীতি কেটে যায়—নতুন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয়—তিন ঘণ্টা ক্লাস হয় তারপর সকাল সাড়ে এগারোটায় ছুটি—প্রভাতী শাখার ছুটির কোলাহল ও হইহুল্লোড়ের মধ্যে বাবা-মাকে খুঁজে নেওয়া—ক্লান্তি—বাসায় ফেরা—মনে নতুন আশা আর উদ্দীপনা। 🕮

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ

গ্রন্থাগারের ব্যবহার

ভূমিকা

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক জীব। বুদ্ধি ও মননের অনুশীলনের প্রয়োজনে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে। এই জ্ঞান আহরণের দুটো উপায়। একটি দেশভ্রমণ, অন্যটি গ্রন্থপাঠ। দেশভ্রমণ ব্যয়সাপেক্ষ তাই সবার জন্য সম্ভব নয়। সে তুলনায় জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থপাঠ প্রকৃষ্টতম উপায়। কিন্তু জ্ঞানভাণ্ডারের বিচিত্র সমারোহ একজীবনে সংগ্রহ করা ও পাঠ করা সম্ভব হয় না। এই অসাধ্য সাধন কিছুটা হলেও সম্ভব হয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। গ্রন্থাগারের বিশাল সংগ্রহশালায় নিজের রুচি, মনন ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই কারণে জ্ঞানার্জনের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার কী

সাধারণভাবে গ্রন্থাগার হল গ্রন্থের সংগ্রহশালা। গ্রন্থাগার জীবনের জ্ঞানতীর্থ। যুগ-যুগান্তরের চর্চিত অনুশীলিত নানাবিধ জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে গ্রন্থাগারে। জ্ঞানের অমৃত সরোবরে আস্বাদন করতেই মানুষ গ্রন্থাগার গড়ে তোলে। এখানে আছে শিক্ষা, আছে চিন্তার খোরাক, আছে দুরূহ জিজ্ঞাসার উত্তর।

গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য

গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন : 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে। প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মা অমর অলোক কাল অন্ধকারের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন শত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে তেমনি লাইব্রেরীর মধ্যে মানব–হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' অর্থাৎ গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞানের আধার। সারা বিশ্বের মনীষীদের চিন্তার সঙ্গে মহামিলনের পবিত্র স্থান গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগারের শ্রেণীবিভাগ

গ্রন্থাগার নানা শ্রেণীর হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, পারিবারিক গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার। তবে গ্রন্থাগারের শ্রেণীবিভাগ যেমনই হোক না কেন, গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান বিতরণ।

গ্রন্থাগারের উৎপত্তি ও বিকাশ

গ্রন্থাগারের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজা-বাদশা ও সামন্ত জমিদাররা বিদ্যোৎসাহিতার জন্য গ্রন্থের সংগ্রহশালা গড়ে তুলতেন। মধ্যযুগে মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে গড়ে তোলা হত গ্রন্থের সংগ্রহশালা। পৃথিবীতে প্রথম লাইব্রেরি হয় প্রাচীন রোম দেশে। তারপর মিশর, ব্যাবিলন, চীন, তিব্বত ও ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তারের সময়ও লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। আধুনিক বিশ্বে বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। যেমন– প্যারিসের Bibliotheque national, লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মস্কোর লেনিন গ্রন্থাগার ইত্যাদি। এই আদর্শে বাংলাদেশেও বিখ্যাত গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম, রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগার ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তিজীবনে ও জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জাতীয় দর্শন, সাহিত্য, মূল্যবোধ ও বিজ্ঞানচর্চার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের সান্নিধ্যে থাকলে যেমন জ্ঞান অর্জন করা যায়, তেমনি মনে শুভচিন্তার উদয় হয়।

উপসংহার

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে না। পূর্ণতা দান করে গ্রন্থাগার। সুশিক্ষিত লোক স্বশিক্ষিত হয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে। জ্ঞানচর্চা ও অনুশীলন— ব্যক্তি, দেশ, জাতিকে সকল প্রকার মালিন্য থেকে মুক্ত করে উন্নত ও কল্যাণকামী করে তোলে। এজন্য আমাদের সকলের গ্রন্থাগার ব্যবহার করা প্রয়োজন। 🕮

আমার প্রিয় গ্রন্থ

[সংকেত]

ভূমিকা—গ্রন্থ চিরকালের সঙ্গী—গ্রন্থপাঠের আনন্দ—আমার প্রিয় গ্রন্থ—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী—অপু ও দুর্গা চরিত্রের বর্ণনা—পথের পাঁচালীর ভাষা ও বর্ণনা—উপসংহার। 🕮

সমস্যামূলক প্রবন্ধ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা-সমস্যা ও প্রতিকার

ভূমিকা

একটি দেশের আয়তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক বিদ্যমান। যদি আয়তন ক্ষুদ্র হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিম্নমানের হয় তবে সেদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রকট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আবার উন্নত ও বৃহৎ আয়তনের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আশীর্বাদস্বরূপ। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুই–ই হতে পারে। শ্রমশক্তি ও উৎপাদনশক্তি হিসাবে জনসংখ্যা সহায়ক হলে সমস্যা নেই। তবে দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে উন্নয়ন বাধা পায়। তখন খাদ্যসমস্যা, বেকারসমস্যা, সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হলে জাতির সামগ্রিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। বর্তমান বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেই সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। বিশ্বের মানচিত্রে আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের আয়তন ৩০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। ১৯০১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল পৌনে তিন কোটি। ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি। ২০০০ সালে ১৪ কোটি মানুষের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। এই সংখ্যায় নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। পুরুষের তুলনায় নারীর কর্মসংস্থান কম হওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীরা তাই যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না। অন্যদিকে, শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে অশিক্ষার প্রভাবে দেশে জনসংখ্যা-সমস্যা দিন দিন প্রকট রূপ ধারণ করছে। কাজেই বাংলাদেশে যেন জনবিস্ফোরণ ঘটছে। এই অবস্থা আগামীদিনের জন্য হুমকিস্বরূপ।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। যেমন– জলবায়ুর প্রভাব, শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য. বাল্যবিবাহ, সরকারি উদ্যোগের প্রতি উদাসীনতা, ধর্মীয় কুসংস্কারের ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে অনীহা ইত্যাদি।

জনসংখ্যা-সমস্যার সমাধান

দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার ও সচেতন দেশবাসীকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করছেন তাঁদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে জনসংযোগ করে গ্রামপর্যায়ের প্রধান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানদের অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষ কর্মশালার মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সমাজের সচেতন মহলকেও সরাসরি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন এনজিও-কেও এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গণশিক্ষার হার বাড়াতে হবে। থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বাস্থ্য ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে অধিক মাত্রায় সচেতনতা গড়ে উঠলেই এই জনবিস্ফোরণ রোধ করা সম্ভব।

উপসংহার

জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে-কোনো দেশের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এই সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। দেশের সম্পদের চেয়ে জনসংখ্যা যেন অধিক না হয় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা খুবই দরকার। 'ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট' কিংবা 'একটি হলে ভালো হয়, দুটির বেশি আর নয়'— এই স্লোগান প্রত্যেকের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেই স্বনির্ভর বাংলাদেশ অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

যৌতুকপ্রথা

ভূমিকা

আমাদের দেশের নানাবিধ সামাজিক সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত প্রসঙ্গ যৌতুকপ্রথা। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যেসব হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে তার কিছু সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্তরালে অনেক খবর রয়ে যায় যা অন্তরালের কলঙ্করূপে সমাজকে বিষময় করে তোলে। বিপন্ন হয় নারীর সামাজিক জীবন।

যৌতুক কী

সাধারণভাবে বলা যায়, যৌতুক হচ্ছে একটি সামাজিক কুপ্রথা। এই প্রথায় কন্যার বিয়েতে বরপক্ষকে নগদ অর্থসম্পদ প্রদানে বাধ্য করা হয়। এতে কন্যার পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা করা হয় না। এটা একটি নির্যাতনমূলক প্রথা, যা বিয়ের পবিত্রতা নষ্ট করে।

যৌতুকপ্রথার উৎপত্তি

যৌতুকপ্রথার উৎপত্তি হয় হিন্দুসমাজ থেকে। হিন্দু আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। তাই কন্যা পাত্রস্থ করার সময় নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার প্রচলন বহুকাল ধরে রয়েছে। এ ছাড়াও আদিতে বর-কন্যার নতুন সংসার সাজাতে উপহারসামগ্রী দেওয়া হতো। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এই উপহারপ্রথা যৌতুকপ্রথাতে রূপ নিয়েছে। এ ছাড়াও মুসলিমসমাজে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে পণপ্রথা প্রচলিত। পূর্বে কন্যাপক্ষকে পণ দিয়ে পাত্রপক্ষ বিয়ে করত। কিন্তু বর্তমানে এই ধারার পরিবর্তন হয়ে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছ থেকে দরকষাকষির মাধ্যমে যৌতুক গ্রহণ করে। উনিশ শতকে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম সচেতন হন। তাঁরা এই প্রথা রোধ করার জন্য আইন পাশ করেন। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সালে যৌতুকনিরোধ আইন প্রণয়ন করেছে। তবুও এই প্রথা রোধ করার প্রচেষ্টা সর্বাংশে সফল হচ্ছে না। তবে শিক্ষিত উচ্চবর্গের মানুষের মধ্যে এই প্রথা ধীরে ধীরে বর্জিত হচ্ছে। অপরদিকে, ধর্মীয় বিধান অনুসারে পাত্রীকে দেওয়া বরের দেনমোহর বা মোহরানা যৌতুক হিসেবে গণ্য করা হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে লক্ষণীয় যে, পাত্রের সাধ্যের কথা অনেক ক্ষেত্রে বিবেচনা না করে পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষের কাছে অধিক দেনমোহর দাবি করে। দর কষাকষির ফলে এটিও অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের পবিত্রতা নষ্ট করে।

যৌতুকপ্রথার কারণ

বাংলাদেশে যৌতুকপ্রথার কারণ সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, অসমবণ্টন ব্যবস্থার প্রকৃতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে যৌতুকপ্রথা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। তার মধ্যে গণদারিদ্র্য, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের অবজ্ঞা, অবহেলা, আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা, যৌতুক প্রদানের ক্ষেত্রে অহমিকা প্রকাশ, নারীসমাজের নিরাপত্তাহীনতা ও পরনির্ভরশীলতা, কনের বয়স ও সৌন্দর্যের অভাবের কারণ প্রভৃতি এদেশে যৌতুক প্রথার জন্য দায়ী বলে মনে করা যায়।

যৌতুকপ্রথা দূরীকরণের উপায়

যৌতুকপ্রথা বাংলাদেশের কেবল প্রধান সমস্যাই নয়, অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় এই প্রথা থেকেই। যে-সমাজ প্রতিটি মানুষের কাজ, শিক্ষা, আশ্রয়, নিরাপত্তা, চিকিৎসা ও বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারবে, সেই সমাজে যৌতুকপ্রথা থাকতে পারে না। নারী পণ্য নয়, বিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম নয়, নারীও মানুষ, সমাজে তাদের সমমর্যাদার অধিকার আছে—এই ধারণা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাই যৌতুকপ্রথা রোধ করার জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মহিলাদের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান, যৌতুক দাবি করা পরিবার ও ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে বয়কট করা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার আদর্শ প্রচার করা, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা, নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ ঘটানো এবং যৌতুকের কারণে নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হলে এই প্রথা রোধ করা সম্ভব বলে ধারণা করা যায়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্যপ্রধান দেশে দারিদ্র্যই সকল সমস্যার মূল। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি দূর করে এই প্রথা বিলোপ করার সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে। কবি নজরুলের এই বোধ সবার মনে জাগ্রত হতে হবে—

পৃথিবীতে যা কিছু মহান চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। 🕮

বেকারসমস্যা

ভূমিকা

জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থান স্বল্প হলে বেকারত্ব দেখা দেয়। কোনো দেশ বা জাতির জন্য বেকারত্ব একটি মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে বেকারত্ব একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা দূর করা আমাদের কর্তব্য। বেকারত্ব দূর হলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব।

বেকারত্ব কী

অর্থনীতিতে বেকারত্বের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে 'বেকারত্ব বলতে এমন একটি পরিস্থিতি বোঝায় কর্মক্ষম মানুষ চলতি মজুরিতে কর্মে যোগদানে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও কর্মনিয়োগ লাভ করে না।' বেকারসমস্যা ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বেকারত্ব সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন।

বেকারত্বের কুফল

কোনো দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেলে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নানা রকম কুপ্রভাব পড়তে থাকে। পারিবারিক অশান্তি, মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া, জীবনযাত্রার মান নিম্নে নেমে যাওয়া, অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটা, জাতীয় উৎপাদন ও আয় কমে যাওয়া ইত্যাদি কুফল দেখা দেয়। বাংলাদেশে এই সমস্যা ও কুফল সত্যিই ভয়ংকর।

বেকারত্বের কারণ

বিভিন্ন কারণে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে বেকারসমস্যার প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে—দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষির উপর নির্ভরশীলতা, শিল্পে অনগ্রসরতা, মূলধনের অভাব, কুটিরশিল্পের অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব, অসাধু বাণিজ্যচক্র, প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব ইত্যাদি।

বেকারসমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশ বেকারসমস্যায় জর্জরিত। দেশের দারিদ্র্যমোচন ও বেকারসমস্যা সমাধান একান্ত প্রয়োজন। এদেশের বেকারত্ব নিরসনে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে— কৃষিউন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, শিল্পোন্নয়ন, কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন, অবিরাম চাষপদ্ধতি চালু করা, গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা এবং শিক্ষিত বেকারদের চাকরির মোহ ত্যাগ করে আত্মকর্মসংস্থানের বিকল্প পথ অনুসরণ করা। বিদেশে শ্রম বিনিয়োগ করার কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে সর্বাগ্রে জনসংখ্যারোধে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে রাষ্ট্রকেই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

উপসংহার

বেকারত্ব উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রকট সমস্যা। বাংলাদেশে এই সমস্যা ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। সামাজিক উন্নয়ন ও শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে এ-সমস্যা দূর করতে হবে। উদ্বৃত্ত জনশক্তি বিদেশে বিনিয়োগ করতে হবে। সর্বাত্মকভাবে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করে বাংলাদেশকে আগামী পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। 🕮

মাদকাসক্তি

ভূমিকা

ড্রাগের নেশা সর্বনাশা। বেহুলা-লখিন্দরের নিশ্ছিদ্র লৌহবাসরে যেভাবে কালনাগ প্রবেশ করে দংশন করেছিল তেমনিভাবে সমাজের নিয়মনীতি মূল্যবোধের কড়াপাহারা অতিক্রম করে ভয়ংকর এই নেশা গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের যুবসমাজকে, যা ভয়ানক আতঙ্কের বিষয়। এই নেশা বা মাদকাসক্তি সমাজকে বিষবাষ্পে ভরিয়ে তুলছে। বিপন্ন করছে আগামী প্রজন্ম, আগামী পৃথিবীকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন।

মাদকাসক্তি কী

সাধারণত যেসব দ্রব্যসামগ্রী পান বা ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি হয় এবং এই নেশা অভ্যাসে পরিণত হয় তাকে মাদকাসক্তি বলে। মাদকাসক্তির ফলে চিন্তা বা মতিবিভ্রম ঘটে। মাদকদ্রব্য হিসেবে বহু উপকরণ আছে। যেমন— মদ, গাঁজা, আফিম, ভাঙ, মারিজুয়ানা, এল এস ডি, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, হেরোইন, চরস, পপি, মরফিন, হাসিস, ফ্যানাবিন, কোকেন, বোডেন, তামাক, জর্দা, গুল ইত্যাদি। এ ছাড়াও তালের তাড়ি, পচানী ইত্যাদি পানীয় জাতীয় নেশার উপকরণ রয়েছে। এইসব পান বা সেবন করলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, রোগাক্রান্ত হয় এবং অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

মাদকাসক্তির প্রচলন

প্রাচীনকাল থেকেই নেশাসক্তির প্রচলন রয়েছে। বৈদিক যুগে ঋষিরা সোমরস পান করতেন। এক সময় চীনদেশের লোক আফিম খেয়ে নেশা করত। এদেশে ইংরেজদের আগমনের ফলে তাদের সান্নিধ্যে এসে বাংলাদেশের মানুষ মদ্যপানে আসক্ত হয়। মাতলামি তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ ছিল। উত্তরোত্তর সেই ধারা এখন মহাতঙ্কের রূপ নিয়েছে। যুবসমাজ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অকালে ঝরে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা, সঙ্গদোষে, কৌতূহলবশত পান বা সেবন করতে গিয়ে, কিংবা অপরাধজগতের মধ্যে মিশে নেশায় জড়িয়ে পড়ছে। সারা পৃথিবীতে অসংখ্য তরুণ-তরুণী ড্রাগের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আজ মৃত্যুপথযাত্রী।

মাদকাসক্তির লক্ষণ

মাদকাসক্তি নেশায় প্রাথমিকভাবে মাথা ঝিমঝিম বা টলমল করা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। ক্রমশ জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেতে থাকে এবং এক ধরনের সুখানুভূতি লাভ করে স্নায়ুদুর্বলতা দেখা দেয়। পরে ক্ষুধামন্দা, সমস্ত দেহে জ্বালা ও মস্তিষ্কপ্রদাহ, বোধশক্তি লোপ, শরীরে ক্লান্তিবোধ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক

মাদকাসক্তি দেহে নানা রকম ক্ষতি করে। দেহের শক্তি কমে অক্ষমতা বেড়ে যায়। মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক কাজকর্ম করার মনোবল থাকে না। পরিণামে ব্যর্থতার গ্লানি তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়। এভাবে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বাড়ছে। আন্তর্জাতিক চোরাচালানিচক্র এদেশের যুবসমাজকে পুঁজি করে ব্যবসা করছে। মাদকদ্রব্যের দাম বেশি হওয়ায় মাদকাসক্ত যুবকরা ছিনতাই, ডাকাতিসহ বহুবিধ সামাজিক অপকর্মে জড়িত হচ্ছে।

মাদকাসক্তি ও যুবসমাজ

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠারো বছর বয়সের বন্দনা করেছেন, নজরুল ইসলাম যৌবনের গুণগান করেছেন, সেই যুবসমাজ আজ নেশায় মত্ত। ভাবতে অবাক লাগে। এইভাবে দেশ ও জাতি পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। এই যুবসমাজকে আগামীদিনের দেশের কান্ডারীরূপে গড়ে উঠতে হলে মাদকাসক্তি ত্যাগ করতে হবে।

প্রতিকার

মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণতির কথা বিবেচনা করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মাদকাসক্তির পরিণতি সম্পর্কে

সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে নেশাক্রান্তদের নীরোগ করে তুলতে হবে। নেশা গ্রহণ যেন না বাড়ে সে সম্পর্কে তরুণসমাজের কাছে নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। অ্যান্টি ড্রাগ, ড্রাগ থেরাপি, সাইকো থেরাপি ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় মাদকাসক্তদের সারিয়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে কিছুদিন কারাগারে রাখা যেতে পারে। এইজন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এ ছাড়াও সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার চালাতে হবে। মাদক উৎপাদন, চোরাচালান ইত্যাদি প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কঠোরভাবে দমন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

যে মায়ের অনেক সন্তান, সে মা সবার প্রতি সমান নজর দিতে পারে না। তেমনি দেশের অধিকাংশ বেকার যুবকের সংবাদ রাষ্ট্র জানে না। তাদের বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে কাজের মধ্যে নিযুক্ত করলে এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দেশ থেকে সত্যি সত্যি মাদকাসক্তি দূর করা সম্ভব। এই ব্যবস্থা অবশ্যই রাষ্ট্র ও সরকারকে নিতে হবে। সুস্থজীবনের সংকল্প নিয়ে যুবসমাজকে গাইতে হবে মাদকবিরোধী সঙ্গীত :

পেথেড্রিন, হেরোইন, নেশার আস্তানা
দুমড়ে–মুচড়ে দিতে ধরো হাতখানা
চলো প্রতিরোধ গড়ে তুলি বিশ্বের প্রতি প্রান্তরে
মাদকাসক্তি নির্মূল না করে আমরা ফিরব না। 🕮

ধূমপানের কুফল

ভূমিকা

'Smoking is the injurious of health'– ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এমন সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ লিখে রাখা হয় সিগারেটের প্যাকেটে। অথচ ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তিরা সে আপ্তবাক্য আমলেই নেয় না। বরং ধূমপায়ীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। তবুও পৃথিবীব্যাপী ধূমপানের বিস্তার ঘটেছে, যার মারাত্মক কুপ্রভাব পড়ছে মানবজীবনে।

ধূমপান কী

ধূমপান নেশাসক্তিমূলক একটি বদঅভ্যাস। বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, হুক্কা ইত্যাদি ধূমপানের প্রধান উপকরণ। অর্থাৎ তামাকজাতীয় দ্রব্য সেবনকে বলা হয় ধূমপান। সোজাকথায়, তামাকের নিকোটিন নামক পদার্থ সেবনকে বলে ধূমপান।

ধূমপান অভ্যাসের কারণ

বিভিন্ন কারণে ধূমপানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। প্রথমত, শিশুরা ধূমপায়ী বাবার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা কৌতূহলবশত কুসঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে ধূমপান করে। বিশেষত, সিগারেট পান করে ধোঁয়া উড়ানোর মধ্যে এক ধরনের সুখ অনুভব করে। আবার প্রাপ্তবয়স্ক যুবকরা অন্যের দেখাদেখি স্মার্টনেস, আভিজাত্য এবং মর্যাদার ব্যাপার মনে করে ধূমপান করে। মূলত, তামাকের পাতায় এক ধরনের মাদকতা আছে। তামাকের ধোঁয়া থেকে ধূমপায়ীরা এক ধরনের নেশা উপভোগ করে, যা তাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। একারণে ধূমপান ত্যাগ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

ধূমপানের অপকারিতা

ধূমপান মানবজীবনে নানা ক্ষতিসাধন করে। ধূমপানের মাধ্যমে দেহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্য, শক্তি ও প্রাণ হারায়। সিগারেটের তামাকে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ আছে যা বাহ্যিকভাবে ঠোঁট, দাঁত, দাঁতের মাড়ি কালো করে দেয়, শ্বাসনালির মাধ্যমে তা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এর ফলে গলায়, কণ্ঠনালিতে প্রদাহ সৃষ্টি করে, রক্তে মিশে রক্তদূষণ ঘটায়, ফুসফুসে প্রবেশ করে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহকে ক্ষীণ-শীর্ণ ও শক্তিহীন করে দেয়। বক্ষব্যাধিসহ ফুসফুসে ক্যান্সার হয়। সমস্ত দেহের রক্তে যেন বিষ মিশে যায়। দীর্ঘদিন সিগারেট পান করলে হৃদরোগও দেখা দেয়। ক্যান্সার, যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি রোগে যেমন ধূমপায়ী আক্রান্ত হয়, তেমনি তার শিশুসন্তানও আক্রান্ত হয়। এ ছাড়া ধূমপানের আর একটি অপকারিতা হচ্ছে অবিবেচক ধূমপায়ী রাস্তাঘাটে, অফিসে, যানবাহনে ধূমপান করে পরিবেশ দূষণ করে। আধপোড়া সিগারেট আগুনসহ রাস্তায় ফেলে দেয়, এতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

ধূমপান নিরোধের উপায়

ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এজন্য রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে প্রচার অভিযান চালাতে হবে। ধূমপানসামগ্রী উৎপাদন আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত, পেট্রোলপাম্প, হাসপাতাল প্রভৃতি এলাকা ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষিত হয়েছে— এগুলো কার্যকর করতে হবে। ধূমপান নিরোধ আইন সার্বিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

উপসংহার

ধূমপান ক্ষতিকর জেনেও এর ব্যবহার কমছে না। নিশ্চিতভাবে এর সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। তবে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সিগারেট ও বিড়ি উৎপাদন শিল্পে কাজ করছে। তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও জরুরি। সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনে ধূমপানবিরোধী মনোবল তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। 🕮

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রতিরোধ

[সংকেত]

ভূমিকা

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দেশ— সাংবাৎসরিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়— বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস— ভূমিকম্প–নদীভাঙন— খরা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়রোধে আগাম প্রস্তুতি— বিপর্যয়ের সময় করণীয়— বিপর্যয়ের পর করণীয়— পুনর্বাসন— সরকারি সাহায্যের চাইতে আত্মনির্ভরশীল উপায়ে সমস্যা মোকাবেলার জন্য মানসিকতা গড়ে তোলা— সরকারি পরিকল্পনা— উপসংহার] 🕮

স্বদেশপ্রেম

দেশপ্রেম

ভূমিকা

পৃথিবী মানুষের জন্মস্থান। সেই অর্থে পৃথিবীই প্রত্যেকের জন্মভূমি। তবু ঠিক যে-স্থানে, যে-দেশে তার জন্ম, সে-স্থানের সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক। সেখানেই সে মাকে পায়। সেই স্থান তার মাতৃভূমি। তাই সে ভালোবাসে— মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন: 'মাতা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।' অনুরূপ সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়, 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী'— অর্থাৎ মা ও মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই প্রত্যেক মানুষ নিজেকে ভালোবাসে। আবার নিজের চেয়ে নিজ দেশকে বেশি ভালোবাসে। ইংরেজ কবিও বলেন– 'I love my life, but not more than my country.' স্বদেশকে ভালোবাসা মানুষের জন্মগত গুণ। স্বদেশকে ভালোবেসে যুগে যুগে অনেক বীর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তেমনি দেশপ্রেমের এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

দেশপ্রেমের স্বরূপ

দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা ও যথার্থ আনুগত্যকেই বলা হয় দেশপ্রেম। দেশপ্রেম মানুষের সহজাত চেতনা। স্বদেশের প্রতি আমৃত্যু থাকে প্রবল আকর্ষণ। স্বদেশের মাটি, প্রকৃতি, নদনদী, নিসর্গ, ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় বন্ধন তৈরি হয়। হৃদয়ে লালিত হয় অন্তরঙ্গ প্রেম। তাই মায়ের পরই মাতৃভূমিকে স্থান দেয় মানুষ। স্বদেশের বিজয়ে উল্লসিত হয়, স্বদেশের সংকটে নিজ জীবন বাজি রেখে সেই সংকট অতিক্রম করতে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে। সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধ স্বদেশপ্রেমের প্রধান উৎস।

দেশপ্রেমের উন্মেষ ও দেশপ্রেমিকের জীবন

সব প্রাণীই তার আবাসস্থলকে ভালোবাসে। মানুষও ভালোবাসে তার জন্মভূমি। তবে মানুষের মনে দেশপ্রেমের উন্মেষ হয় বিদেশে অবস্থানকালে, আর দেশের সংকটকালে। সংকট অতিক্রম করতে সংগ্রামী হয়ে ওঠে মানুষ। যুদ্ধে অকাতরে জীবনদান করে। কবির ভাষায়–

জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে
ডরে যে, মূঢ় সে শত ধিক তারে।

কিংবা, বিদেশে অবস্থানকালে দেশের প্রতি প্রবল টান অনুভব করা যায়। তাই কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলেন—

স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত
বিদেশেতে অধিবাস যার।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশসেবার মানসিক শক্তি যার আছে, তার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা থাকে না। থাকে না কোনো প্রকার ভয়-ভীতি। দেশসেবার পথে পথে সাজানো থাকে মৃত্যুর তোরণদ্বার। থাকে পথে পথে বাধাবিপত্তি। মৃত্যুর গর্জন তার কানে বাজে সংগীতের মতো। কবির ভাষায়—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

প্রকৃত দেশপ্রেমিক মৃত্যুর পরও মৃত্যুঞ্জয়ীরূপে সমাদৃত হতে থাকেন। মহাত্মা গান্ধী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি জীবনে ও সাহিত্যে

স্বদেশপ্রেমের এই মধুর অনুভূতির প্রকাশ পায় সাহিত্যে ও সংগীতে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের রয়েছে নিজস্ব সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ। বাংলা সাহিত্যে কবিতা ও সংগীত স্বদেশের বন্দনায় মুখরিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে লিখেছেন—

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

আবার কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন–

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি—
তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। ইত্যাদি।

দেশপ্রেমের ভিন্নরূপ

উগ্র দেশপ্রেম আবার ক্ষতির কারণ। যদি জাতির গৌরব প্রতিশোধপরায়ণ ও হিংসারূপে প্রকাশ পায় তবে দেশপ্রেমের মহিমা ম্লান হয়ে যায়। জার্মান সম্রাট হিটলার উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা। তাঁর দেশপ্রেমকে ভিন্নরূপে দেখা হয়। অন্যদিকে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কেও কেউ-কেউ এই ধারণা পোষণ করে। যাই হোক, উগ্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম মঙ্গলের চেয়ে বেশি অমঙ্গল সাধন করে।

দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব

দেশপ্রেমের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন অনেক বরণীয় ব্যক্তিত্ব। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বাঙালি অসামান্য অবদান রেখেছেন। এঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় হয়ে আছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা এবং জাতির পিতা। অনুরূপ ইতালির গ্যারিবল্ডি, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, রাশিয়ার লেনিন, চীনের মাও সে তুং, তুরস্কের কামাল পাশা, ভিয়েতনামের হো চি মিন, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ পৃথিবীর মহান দেশপ্রেমিক ও অমরপ্রাণ মানুষ।

উপসংহার

স্বদেশপ্রেম মানুষের অন্যতম পবিত্র গুণাবলি। দেশপ্রেম সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (স) বলেছেন– 'হুযবল ওয়াতন

মিনাল ঈমান'— অর্থাৎ দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ। নিজের দেশের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ও ভালোবাসা প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক কাজ। 🕮

একুশে ফেব্রুয়ারি : ভাষাদিবস

সূচনা

আমাদের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন একুশে ফেব্রুয়ারি বা ৮ই ফাল্গুন। এ দিনটি ভাষাদিবস হিসেবেও পরিচিত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রক্তে রাঙা দিন এই দিন। মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিতে রাঙা এই দিন। প্রতি বছর বারবার ঘুরে ঘুরে আসে এই দিন। আমরা স্মরণ করি সেই বীর সন্তানদের, বীর ভাষাশহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর ও আওয়ালসহ নাম না-জানা আরও অনেককে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন মাতৃভাষার জন্য। আমরা স্মরণ করি প্রভাতফেরি আর শোভাযাত্রায় এই গান গেয়ে— 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলতে পারি'?

ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তৎকালীন ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ। একটি পশ্চিম পাকিস্তান, অপরটি পূর্ব পাকিস্তান। আমাদের বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল সেই পাকিস্তানের অংশ—পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মি. জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। তিনি রমনা রেসকোর্সের মাঠে এক জনসভায় ঘোষণা করেন—পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। তিনি ঘোষণা করেন— 'Urdu and Urdu shall be the only state language of Pakistan'। এ ঘোষণায় বাংলার তরুণরা সেদিন তীব্র প্রতিবাদ জানায়; তারা উচ্চকণ্ঠে বলে, এটা কেউ মেনে নেবে না। কারণ তৎকালীন পাকিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী পূর্ববাংলার। তাদের মাতৃভাষা বাংলা। অতঃপর মাতৃভাষার অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে শুরু হয় সংগ্রাম।

১৯৫২ সালে চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর খাজা নাজিমউদ্দিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকার ছাত্রদের আন্দোলন বন্ধ করার জন্য পথে পথে সৈন্য মোতায়েন করে এবং ১৪৪ ধারা জারি করে। এ আইন জারির ফলে একসঙ্গে ৪ জনের বেশি একত্রে বেরোতে পারার কথা নয়। তাই সরকার ভেবেছিল আন্দোলন থেমে যাবে। কিন্তু এ আইন জারির ফলে ছাত্ররা আরও বিক্ষুব্ধ হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ৮ই ফাল্গুন সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করে। ছাত্রদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয় পুলিশের। পুলিশের ছিল বন্দুক, বেয়নেট, টিয়ারগ্যাস আর লাঠিসোঁটা। নিরস্ত্র ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের ভাষার অধিকার আদায় করতে। স্বৈরাচারী শাসকের পুলিশেরা নির্বিচারে গুলি চালায় ছাত্রদের ওপর। এতে শহীদ হন বরকত, সালাম, জব্বার ও রফিকসহ নাম না-জানা আরও কয়েকজন।

শহীদমিনার

বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে এই ভাষাশহীদের স্মরণে তৈরি হয়েছে শহীদ মিনার। ঠিক এ জায়গাতেই বরকত শহীদ হন। এ শহীদমিনার আজ আমাদের সব আন্দোলনের প্রতীক। এ মিনার আজ আমাদের অহংকার, আমাদের গৌরব।

ভাষা আন্দোলনের সাফল্য

পাকিস্তান সরকার ভাষা আন্দোলনের প্রবল চাপে ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এ বছরই প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'বাংলা একাডেমী'।

বাংলা একাডেমী এখন জাতির মননের প্রতীক। ১৯৬৯ সালে এদেশে একটি বড় গণআন্দোলন হয়। এর মূলে ছিল একুশের প্রেরণা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় তার মূলেও ছিল ২১শের প্রেরণা। ১৯৯০ সনে স্বৈরাচারবিরোধী যে গণজাগরণ ও গণআন্দোলন হয় এবং যার ফলে ভেঙে পড়ে এরশাদশাহীর মসনদ, তার মূলেও ছিল একুশের প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ২১শে ফেব্রুয়ারি এখন সকল আন্দোলনের প্রেরণার উৎস ও প্রতিবাদের প্রতীক। একুশে মানে মাথা নোয়ানো নয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি এখন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষ পালন করছে এই দিনটি। সুতরাং ২১শে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু আমাদের ভাষা-দিবস নয়, পৃথিবীর ১৮৮টি দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীর ভাষা-দিবস।

একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষার ব্যবহার

আমাদের দেশে যদিও ১৯৫২ সালের আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষাকে আমরা সমুন্নত করেছি পৃথিবীর কাছে, তবুও এখনও বাংলা ভাষার ব্যবহার সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়নি। যেদিন আমাদের জীবনের সর্বস্তরে এ ভাষার ব্যবহার আরও বেশি ও সার্থকভাবে হবে সেদিন ২১শের প্রতি সত্যিকার মর্যাদা দেখানো হবে। এজন্য আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। এ দায়িত্ব সকল শিক্ষিত বাংলা ভাষাভাষীর। একুশের অঙ্গীকার হবে এদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা।

উপসংহার

একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আমাদের চিন্তা ও চেতনায় একীভূত একটি দিন। এদিন শুধু ক্যালেন্ডারের একটি নির্দিষ্ট তারিখ নয়। এ দিন বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি চিরপ্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা। 🕮

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
[সংকেত]

সূচনা

বাঙালির স্বাধীনতার অন্বেষা— মুক্তিযুদ্ধের কারণ ও মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস— মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের গৌরবগাথা— পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসরদের হত্যাযজ্ঞ ও নৃশংস ভূমিকা— নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিজয়লাভ— স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি— একটি শোষণহীন সমতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের চেতনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের যে সূচনা তার বাস্তবায়ন— দেশকে ভালোবাসার চেতনা হৃদয়ে ধারণ— উপসংহার] 🕮

শ্রম ও সমবায়

শ্রমের মর্যাদা

ভূমিকা

সভ্যতা মানুষের পরিশ্রমের ফল। আদিম মানব থেকে শুরু করে আজও মানুষ আপন পরিশ্রম দ্বারা পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলছে। পরিশ্রম মানবজীবনের ভিত রচনা করেছে স্বতন্ত্র মহিমায়। সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান সবই মানুষের পরিশ্রমের দান। পরিশ্রমকে নিচু চোখে দেখার কোনো অর্থ নেই। মানুষ নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আপন মহিমা ও কীর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পবিত্র কুরআন-এ বলা হয়েছে— 'লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মা সা'আ'— অর্থাৎ মানুষের জন্য শ্রম ব্যতীত কিছুই নেই। সম্ভবত, একারণে কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন-'কাবার ভেতর ঘুমন্ত মুসলমান অপেক্ষা, প্রতিমার সামনে জাগ্রত কাফের অনেক উত্তম।' এই জাগরণ অর্থ হলো শ্রম। কর্মমুখর জীবন সার্থক জীবন। কর্মহীন জীবন অর্থহীন।

শ্রম কী

শ্রম বলতে কাজ, মেহনত বা খাটুনিকে বোঝায়। ইংরেজিতে বলা হয় Labour, Toil, Effort, Steady,

Application ইত্যাদি। বস্তুত, এই জগৎ হচ্ছে মানুষের জন্য এক কর্মযজ্ঞ। শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ তার ভাগ্য নির্ধারণ করে। ভালোকর্মের জন্য মানুষ সুফল লাভ করে। কুকর্মের জন্য দুর্ভাগ্য বরণ করে। একারণেই বলা হয়— 'পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি।'

শ্রমের প্রকারভেদ ও মর্যাদা

শ্রম দুই প্রকার। শারীরিক শ্রম ও মানসিক শ্রম। কৃষক, শ্রমিক, মজুর প্রভৃতি শারীরিক শ্রমের মানুষ। অপরদিকে, পেশাদার চাকরিজীবী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ মানসিক শ্রম দিয়ে থাকেন। উভয় শ্রমই প্রয়োজন। সব সভ্যতার মূলেই রয়েছে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সম্মিলন। তাই সকলের শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। কবি মানুষের কর্মযজ্ঞের বন্দনা করেছেন এইভাবে—

নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ চন্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক
কর্ম-চর্মকার!

ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি বলেছেন— 'Work is the basis of self respect'— অর্থাৎ কর্মই আত্মমর্যাদার মূলভিত্তি। জগতে কোনো কাজই ছোট নয়। কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, মজুর, কুলি, কর্মকার, চর্মকার প্রত্যেকেই এই জগতে মানবতার কল্যাণে কাজ করছে। তাই তাদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদান করা উচিত। কবি নজরুল ইসলাম 'কুলি' কবিতায় শ্রমজীবী মানুষকে দেবতার মর্যাদা দিয়েছেন—

তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি
তোমারে বহিতে যাহারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি
তারাই মানুষ। তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান।

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা

পরিশ্রমই যে-কোনো জাতিকে উন্নত করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশায় দায়িত্বশীল হলে এবং শ্রম দিলে দেশের উন্নতি হবে। মানুষের উন্নতি হবে, মানবতার উন্নতি হবে। এ ছাড়াও কর্মোদ্যোগী মানুষ সুখী ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। অলস মানুষ অসুখী, অসুস্থ। তাই শ্রমের মাধ্যমে সুস্থ থাকা উচিত।

উপসংহার

আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এদেশের সমস্যা অনেক। বেকার, অলস বা শ্রমবিমুখ থাকার সুযোগ আমাদের নেই। বিশ্বসভ্যতায় আমাদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। মনে রাখতে হবে 'Man is the architect of his own fortune.' 🕮

সমবায়

সূচনা

বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ আছে— 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' দশ জনে সমবেতভাবে সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সম্মিলিতভাবে যে প্রচেষ্টা চালায় তাই সমবায়।

মানুষের প্রয়োজনে সমবায়ের জন্ম

আদিম যুগ— মানুষ যখন জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেনি তখনও মানুষ বাস করত সমাজবদ্ধভাবে। তারা সেদিন সম্মিলিতভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। আধুনিক যুগে মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সম্মিলিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছে, এবং এ প্রয়োজন থেকেই সমবায়ের জন্ম। আধুনিককালে পৃথিবীতে আমরা ব্যক্তি হিসেবে

বিচ্ছিন্ন নই, সমাজ হিসেবে বিচ্ছিন্ন নই, জাতি হিসেবে বিচ্ছিন্ন নই, দেশ হিসেবে বিচ্ছিন্ন নই। বিশ্বজুড়ে যেন এ বৃহৎ সমাজের বাসিন্দা আমরা। আজ ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল; সহযোগিতা, সহ-অবস্থান ও সহমর্মিতার মুখাপেক্ষী। সমবায়-পরস্পর সহযোগিতা, ঐক্য ও কল্যাণকামিতারই পথ নির্দেশ করে।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তা

সমবায় পদ্ধতি সমাজতান্ত্রিক কর্মধারারই শিক্ষা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে কৃষিখামার, কারখানা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি গ্রহণ করে যে সুফল পাওয়া গেছে তা-ই আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করে যৌথভাবে দরিদ্র জনসাধারণও অর্থনৈতিক মুক্তি যে পেতে পারে তা সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভব। সমবায় তাই আজকের যুগে একটি বিশেষ সংগঠন বা কর্মপদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত না হয়ে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছে। সমবায় পদ্ধতি মানুষকে আজ শিক্ষা দিচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে কীভাবে অর্থোপার্জন করা যায় স্বাচ্ছন্দ্যে; সমবায় আজ শিক্ষা দিচ্ছে সীমিত অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে নেওয়ার।

ক্ষুদ্র পুঁজির অংশীদারিত্ব

সমবায়ের মাধ্যমেই বৃহৎ পুঁজির হাত থেকে ক্ষুদ্র পুঁজির লোকেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। দেশের ক্ষুদ্র শিল্প, স্বল্পবিত্ত ও সামান্য পুঁজির ব্যবসায়ী, বৃহৎ পুঁজির একচ্ছত্র ব্যবসায়ীদের হাত থেকে একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই আত্মরক্ষা করতে পারে। সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্যই যেহেতু পুঁজি বিনিয়োগ করে, সুতরাং প্রত্যেকেই মালিক। লভ্যাংশের সমান অংশীদারও তারা। সমবায়ে প্রত্যেক সদস্যের কাজ করার সমান দায়িত্ব থাকে বলে কাজে প্রত্যেকের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং অংশীদারী থাকার জন্য প্রত্যেকের প্রবল আগ্রহও থাকে। বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র পুঁজির উৎসারণ ঘটিয়ে দরিদ্র ও স্বল্পপুঁজির সাধারণ মানুষের জীবনে নতুন বিপ্লব এনেছে।

সমবায়ের জনপ্রিয়তা

সমবায় আন্দোলন আজ সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ ঘটেছে। সমবায় আন্দোলন শুধু উৎপাদন ও বিক্রয়ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের বহুবিচিত্র ক্ষেত্রে; যেমন— পশুপালন, গৃহনির্মাণ, সেচকার্য, মৎস্যসম্পদের ব্যবহার, বীমাব্যবস্থা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজে সমবায়ব্যবস্থার সীমা সম্প্রসারিত হয়েছে। তাই ইদানীং উৎপাদনসমিতি, ক্রেতাসমিতি, ক্রয়সমিতি, ঋণদানকারী সমিতি, গৃহনির্মাণসমিতি, বীমাসমিতি ইত্যাদি সমবায় আন্দোলনের বিভিন্নমুখী কাজ করছে।

সমবায়ের সফল উদাহরণ

বাংলাদেশের সমবায় ব্যবস্থার প্রয়োজন যেমন অপরিসীম, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা সফলও হয়েছে। কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী সমবায়ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ প্রমাণ করেছে। কুমিল্লার বহু ভূমিহীন চাষি, গাড়ির চালক, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণ সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষাবাদ করে, ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে, গাড়ি চালক সমিতি করে আজ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে যে সাফল্য অর্জন করা হয়েছে তা আজ 'কুমিল্লা পদ্ধতি' হিসেবে সারা বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতিতে যেন জোয়ার এনেছে। বাংলাদেশ সরকার সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের তৎপরতা চালাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে তার সার্থকতাও প্রমাণিত হয়েছে। তবে সমবায় আন্দোলনে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল সততা, নিষ্ঠা ও সচ্চরিত্র।

উপসংহার

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন দেশে যে 'কমিউন' ব্যবস্থা রয়েছে তা মূলত সমবায়ী জীবনব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে কোনো ব্যক্তিমালিকানা নেই, আছে যৌথ মালিকানা বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ। আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি। তবে ক্ষুদ্র পুঁজি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য, কৃষিবিপ্লবের জন্য আমাদের দেশে সমবায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। 📖

পশুপাখি ও ফুলফল

গরু

সূচনা

সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ অবধি সভ্যতার অগ্রগতির সাথে মানুষের পাশাপাশি যে প্রাণী সবচেয়ে বেশি উপকার করে আসছে তার নাম গরু। এ প্রাণী খুব শান্তশিষ্ট ও অত্যন্ত নিরীহ। নীরবে-নিভৃতে সবার উপকারই করে, কিন্ত কোনো প্রতিদান চায় না। এই প্রাণী এক সময় বন্য ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ গরুকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। আর তখন থেকেই গরু গৃহপালিত জন্তু হিসেবে আমাদের ভালোবাসা ও মমতা লাভ করে আসছে। শুধু তা-ই নয়, আমাদের অর্থনীতিতেও গরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আকৃতি ও প্রকৃতি

চতুষ্পদ এই প্রাণীটি উচ্চতায় তিন-চার হাত ও দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ-ছয় হাত হয়ে থাকে। এটির মুখ লম্বাকৃতির, মাথায় দুটি শিং, জলে-ভাসা ডাগর ডাগর কালো দুটি চোখ, দুটি লম্বা কান ও শরীরের পেছনে একটি লম্বা লেজ আছে। তার অগ্রভাগে একগুচ্ছ চুল আছে। এর গলার চামড়া ঝুলে থাকে। এটি গলকম্বল নামে পরিচিত। গরুর সারা শরীর ছোট ও ঘন লোমে আবৃত। এদের পায়ের খুর দ্বিখন্ডিত। মুখের দুমাড়ির নিচেরটিতে কেবল এক পাটি দাঁত আছে। গরু বিভিন্ন বর্ণের দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে লাল, কালো, সাদা এবং কিছু কিছু মিশ্র বর্ণের হয়ে থাকে।

প্রকৃতি

গরু অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির জন্তু। স্ত্রীজাতীয় গরু ও পুরুষজাতীয় গরুর স্বভাব একটু পৃথক। এক বছর পরপর গাভী একটি বাচ্চা প্রসব করে। গাভীর সন্তানবাৎসল্য মায়ের মতোই। সদ্যপ্রসূত বাচ্চার ধারেকাছে গেলে কিংবা বাছুরকে ধরতে গেলেই এরা শিং নাড়া দিয়ে ভয় দেখায়। পুরুষ গরু বা ষাঁড় রাগীও হয়। তারা পোষ মানে। হাম্বা হাম্বা শব্দে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করে। সুস্থ অবস্থায় এরা পনেরো থেকে বিশ বছর পযন্ত বেঁচে থাকে।

খাদ্য

তৃণভোজী প্রাণী গরু ঘাস ছাড়াও গাছের পাতা, শুকনো খড়, ভুসি, খৈল, কলাই, ভাতের ফেন ইত্যাদিও খেয়ে থাকে। গরু খাওয়ার সময় প্রথমে গিলে ফেলে, পরে বিশ্রামের সময় সেই খাদ্যদ্রব্য উগরে মুখে নিয়ে আসে, তারপর ভালোমতো চিবিয়ে খায়। একে জাবর কাটা বলে।

উপকারিতা

অন্যান্য যে-কোনো পশুর তুলনায় গরু সবচেয়ে উপকারী জন্তু। গরুর দুধ অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এই দুধ অনেক সময় মানবশিশুর মায়ের দুধের অভাব পূরণ করতে পারে। দুধ থেকে দই, ছানা, মাখন, ঘি, পনির, ক্ষীর ও নানা রকম মিষ্টি তৈরি হয়। স্বাস্থ্যের জন্য এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। গরুর গোস্ত একটি উপাদেয় ও বলকারক খাবার। তা ছাড়া, গোময় বা গোবর একটি উত্তম সার। অনেকে আবার গোবর শুকিয়ে ঘুঁটে তৈরি করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। গরুর চামড়া দিয়ে জুতা, ব্যাগ, সুটকেস, বাক্স তৈরি হয়। শিং ও খুর দিয়ে শিরিষ আঠা তৈরি হয়। হাড় থেকে তৈরি হয় বোতাম ও চিরুনি। হাড়ের গুঁড়ো একটি উত্তম সার। ষাঁড় ও বলদ লাঙল, গাড়ি ইত্যাদি টানে। একসময় আমাদের দেশের কৃষকরা জমি চাষ ও মইয়ের জন্যে গরু ছাড়া আর কিছুর কল্পনাই করতে পারত না।

প্রাপ্তিস্থান

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গরু দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের গরু অন্যান্য দেশের গরুর তুলনায় কিছুটা ছোট। ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও আমেরিকার গরু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। তা ছাড়া বুনোগরুও আছে। এরা সাধারণত হিংস্র প্রকৃতির হয়। বাংলাদেশের সুন্দর বন ও অন্যান্য স্থানে এ সমস্ত বুনোগরু দেখা যায়। তার মধ্যে নীল গাই অন্যতম।

রোগ

গরু সাধারণত পেটফুলা, তড়কা, খুরারোগ, গোবসন্ত, গলাফুলা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

উপসংহার

গরু আমাদের যত উপকার করে থাকে সে তুলনায় তাদের প্রতি আমরা উদাসীন। খাটুনির হারে খাবার দিই কম। ফলে অসহায় জন্তুগুলো দিন দিন দুর্বল ও রুগ্‌ণ হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায়, একটি ফ্রিসিয়ানা বা অস্ট্রেলিয়ান গাভী যতটুকু দুধ দেয় আমাদের দেশি গাভী তার চেয়ে খুব কমই দুধ দেয়। শুধু তা-ই নয়, উন্নত দেশগুলোর মতো আমাদের দেশে আলাদা গোচারণ ভূমি নেই। অনেক সময় অসুস্থ গরু প্রায় বিনা চিকিৎসায় ও গৃহস্থের অবহেলায় মৃত্যুবরণ করে। গরুর মতো এমন জন্তু কিছু নেই যা আমাদের উপকারে আসে। সহানুভূতিশীল হলে এগুলোও শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে, দুধও দেবে অনেক। তা ছাড়া গরুপালন অত্যন্ত লাভজনক। বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারের পশুপালন বিভাগ সংকর প্রক্রিয়ায় ও কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত প্রজাতির বাছুর পাবার ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে মূলকথা হচ্ছে, গরুর প্রতি আমাদের সবার যত্নশীল ও সদয় হওয়া কর্তব্য। 🕮

বাংলাদেশের গৃহপালিত পশু

ভূমিকা

আদিম যুগের অরণ্যবাসী মানুষ বুনোপশুকে পোষ মানানোর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রথম সামাজিক জীবনের সূচনা করেছিল। সেই থেকেই বনের পশু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী। তাই মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ যেদিন থেকে বনের পশুকে পোষ মানিয়ে সমাজবন্ধ জীবন যাপন শুরু করল, সেদিন থেকেই মানবসমাজের গোড়াপত্তন হয় এবং বুনো জন্তু–জানোয়ার গৃহপালিত পশু হিসেবে মানুষের কাছে আশ্রয় পায়। আর এ জন্যেই মানুষের জীবনযাত্রার পাশাপাশি এই জন্তু–জানোয়ার নিত্যসহচরের মতো কাজ করে আসছে।

পরিচিতি

বাংলাদেশের গৃহপালিত পশুগুলোর মধ্যে গরু অন্যতম। কৃষিনির্ভর এদেশে চাষাবাদের কাজে গরু অপরিহার্য। আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে গরুর গাড়ির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। গরুর গোস্ত ও দুধ খুব উপাদেয় খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া গাড়িটানা, ধানমাড়ানো, ঘানিটানা ইত্যাদি নানা কাজে গরু ব্যবহৃত হয়। গরুর গোবর, হাড়, চামড়া, শিং সবই কাজে লাগে। সুতরাং গরু জীবিত কিংবা মৃত যে-কোনো অবস্থাতেই আমাদের নানা উপকার করে।

মহিষ হচ্ছে গৃহপালিত পশুদের মধ্যে অন্যতম। এই পশুটি গরুর মতোই উপকারী। তবে এদের দুধ গরুর দুধের মতো তত পুষ্টিকর নয়। মহিষ পালন করা খুব কষ্টসাধ্য। কারণ, গরমের সময় এরা পানি ছাড়া থাকতে পারে না। এদের আহারও বেশি দিতে হয়। তবে শক্তিশালী পশু হিসেবে এদের পরিচিতি সর্বাধিক।

গৃহপালিত পশুদের আরেকটি সদস্য হচ্ছে ঘোড়া। শোনা যায়, আদিম যুগের মানুষ সবার আগে পোষ মানাতে পেরেছিল ঘোড়াকে। ঘোড়া পোষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ঘোড়া পরিবহন, লাঙল টানা ও যুদ্ধে ব্যবহৃত হত প্রাচীনকাল থেকেই। এ প্রাণীটি আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে ঘোড়ার গাড়ির একটি ঐতিহ্য আছে। এর দুধ ও মাংস সুখাদ্য হিসেবে প্রচলিত নয়। তা ছাড়া মরণের পর এ খুব একটা উপকারে আসে না। ঘোড়া পোষা ব্যয়বহুল হওয়াতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এই পশুটির সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

গাধা আরেকটি গৃহপালিত পশু। প্রাচীনকাল থেকেই ভারবাহী জন্তু হিসেবে গাধা পরিচিত। এরা দেখতে অনেকাংশে ঘোড়ার মতোই। কিন্তু আধুনিককালে বাহন হিসেবে গাধার ব্যবহার কমে যাওয়াতে এদের বংশ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

অনেকেই ছাগল ও ভেড়া শখ করে পুষে থাকে। এদের গোস্ত শৌখিন খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত। ছাগলের দুধ সুপেয়ী। এদের চামড়া, হাড়, গরু মহিষের চামড়া হাড়ের মতোই উপকারী।

কুকুর পোষ মানে বলে গৃহপালিত জন্তু হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বিদেশীদের অনুকরণে আমাদের দেশে ব্যাপক হারে কুকুর পোষা হয় না। কিছু কিছু পরিবার অবশ্য কুকুর পুষে থাকে। এমনিতে এদেশীয় কুকুর না পুষলেও মানুষের আঙিনাতেই থাকে। কুকুর তার মনিবের বিশ্বস্ত ও ভক্ত হয়ে থাকে। কুকুরের প্রভুভক্তির অনেক বিস্ময়কর কাহিনী দেশে-বিদেশে প্রচলিত। মল, আবর্জনা, পচা হাড় মাংস খেয়ে এদেশীয় কুকুর অনেক উপকার করে থাকে। তবে প্রতিবছর কিছু পাগলা কুকুরেরও উপদ্রব দেখা যায়।

বিড়ালও পোষ মানে। শৌখিন লোকেরা বিড়াল পোষে। ইঁদুর-শিকার এদের প্রধান কাজ। কিন্তু চুরি করে দুধ, মাছ, গোস্ত খেতে এরা ওস্তাদ। বিড়ালের শরীর কোমল ও মনোরম বলে অনেক বিড়ালই মানুষের আদর পেয়ে থাকে।

চিড়িয়াখানাতে ও সার্কাস পার্টিতে বাঘ, হাতি, ভল্লুক, বানর দেখা যায়। এসব পশু মানুষের প্রাত্যহিক যাত্রায় তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। তবে হাতি এক সময় যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত হত।

উপসংহার

বাংলাদেশে যত গৃহপালিত পশু আছে সবগুলোই দেশের উৎপাদনমুখী ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক সহয়তা করে। তা ছাড়া এরা নিজেরাও অর্থকরী সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের পশু মন্ত্রণালয় ও পশুপালন বিভাগ পশুর চিকিৎসা, সংরক্ষণ ও যত্নের প্রতি তৎপর রয়েছে। আমাদের সকলেরই গৃহপালিত পশুদের প্রতি যত্নশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। কারণ পশুসম্পদের উন্নতির সাথে সাথে জাতীয় উন্নতির বিষয়টি জড়িত। 🕮

বাংলাদেশের পাখি

সূচনা

কী মনোরম দেশটি আমার কৃষক দেখি ধান করে
ঋতুর সাথে তাল মিলিয়ে বনের পাখিরা গান করে ॥

পাখপাখালির দেশ বাংলাদেশ। সকাল থেকে সন্ধ্যাবধি আমরা হরেক রকমের পাখি দেখতে পাই। এদের মধ্যে রং, আকার এবং স্বভাবের পার্থক্য রয়েছে। কোনোটি দেখতে সুন্দর আবার কোনো কোনোটি খুব বিশ্রী। পাখিরা মিষ্টি সুরে কূজন করতে ভালোবাসে। কিন্তু এদের কোনোটির কণ্ঠস্বর মধুর, কোনোটির আবার কর্কশ কণ্ঠস্বর। কাক একটি সাধারণ পাখি। খুব ভোরে কাকের কর্কশ ডাক শোনা যায়। কাকের ডাক শুনেই আমরা রজনীর সমাপ্তি টের পাই। কাক সকল পাখির মধ্যে কুৎসিত এবং কর্কশ কণ্ঠস্বরের অধিকারী। চুরি করা কাকের স্বভাব। সুযোগ বুঝে খাবার চুরি করে বা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

পাখি প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতীক। পাখি পরিবেশেরও বন্ধু। বাংলাদেশ বিচিত্র পাখির দেশ।

গানের পাখি

গানের দেশ, সুরের দেশ, আমাদের এই বাংলাদেশ। এদেশের পাখির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মধুর সুর। বউ কথা কও, কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া, বসন্ত প্রভৃতি গানের পাখিদের মধ্যে ব্যাপক পরিচিত। মধুর কণ্ঠস্বরের জন্য কোকিল সবার কাছেই প্রিয়। এটি অতিথি পাখি বলেও খ্যাত। কেননা বসন্তের শুরুতে এদের আগমন ঘটে এবং শীত শুরুর আগ পর্যন্ত অবস্থান করতে দেখা যায়। বুলবুলও গানের পাখি বলে পরিচিত। চড়ই পাখিটি খুবই ছোট। টুনটুনি আরও জোরে লেজ উঁচিয়ে এবং লাফাতে লাফাতে মনের সুখে গান করে।

কথক পাখি

টিয়া, ময়না, চন্দনা, শ্যামা প্রভৃতির পাখির কণ্ঠও সুমধুর। শিক্ষা দিলে এরা মানুষের সুর নকল করে কথা বলতে পারে। এজন্যেই এ পাখিগুলো মানুষ পোষে। পোষা পাখি হিসেবে এরা অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিকারী পাখি

চিল, বাজ, শকুন, শিকারী পাখি বলে পরিচিত, চিল, বাজ প্রভৃতি হাঁস ও মুরগির বাচ্চা শিকার করে আহার করে। বক, মাছরাঙা পাখিকে সাধারণত জলাশয়ের ধারেকাছেই অবস্থান করতে দেখা যায়। সুযোগ পেলে এদের ছোট ছোট মাছ ধরে আহার করতে দেখা যায়। কাঠঠোকরাও একটি সুশ্রী পাখি। এর ঠোঁট খুব শক্ত তীক্ষ্ণ, এরা পোকামাকড় আহার করে। এরা পশুপাখির মাংস আহার করে। মরা পচা খেয়ে এরা মানুষের উপকার করে।

উপসংহার

পাখি হচ্ছে স্রষ্টার অনুপম সৃষ্টি। প্রায় সব পাখিই দেখতে সুন্দর, এদের মধ্যে কোনোটি আবার আমাদের খুবই উপকার করে। তাই এদের প্রতি নিষ্ঠুর না হয়ে সকলের সদয় হওয়া উচিত। 📖

বাংলাদেশের ফুল

সূচনা

সুজলা–সুফলা শস্যশ্যামলা এই দেশ ফুলের দেশ। ধানের দেশ, গানের দেশ, কবির দেশ, ছবির দেশ, সোনার দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। তাই কবি লিখেছেন—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

এক–একটি ঋতুতে প্রকৃতি যেন নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তাই ছয়টি ঋতুতেই আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে দেখতে পাই বিচিত্র ফুলের সমারোহ। সত্যিই স্রষ্টা কী অপূর্ব সম্পদেই না আমাদেরকে সম্পদশালী করে তুলেছেন! দিয়েছেন অপরূপ সৌন্দর্য।

ফুলের বর্ণনা

আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকার ফুল দেখা যায়; অনেক নাম-না–জানা ফুলও আছে। ফুলের বিভিন্ন আকার এবং বিচিত্র রঙে এদেশের প্রকৃতি সমৃদ্ধ। সাদা, লাল রক্তিম, হলুদ গোলাপি প্রভৃতি বর্ণের ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসে। কিছু কিছু ফুলের কোনো গন্ধ নেই। শুধু আছে রঙের সমারোহ।

গ্রীষ্মকালের ফুল

গ্রীষ্ম আসে প্রচণ্ড উত্তাপ আর কাঠফাটা রোদ নিয়ে। একটু ছায়ার জন্য মানুষ কাতর হয়ে ওঠে কিন্তু দক্ষিণা বাতাস মানুষের সেই ক্লান্তি দূর করে দেয়। শুধু তাই নয়— চাঁপা, বেল, বকুল, জবা, করবী প্রভৃতি ফুলের সুবাস মানুষের মনে আনে প্রশান্তি।

বর্ষাকালের ফুল : গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষাকাল। বর্ষার বারিধারায় মানুষ অসহ্য হয়ে ওঠে। চারিদিকে কেবল জল আর জল। বাড়ি হতে বের হওয়া দুরূহ। পাশে কেয়াবন হতে ভেসে আসে কেয়া ফুলের গন্ধ। কদম ও কেয়া ছাড়াও বাংলার মাঠ, বিল, পুকুর, নদী, দিঘি আর হাওড়ে দেখা যায়া অসংখ্য শাপলা ফুলের মহাসমারোহ। এসময় জলাশয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করে ফুটে থাকে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। এ ছাড়াও কেতকী, কুন্দ, যূথি এই ঋতুর প্রধান ফুল।

শরৎ ও হেমন্তকালের ফুল

শরৎ ও হেমন্তে স্নিগ্ধ ধরণীর বার্তা নিয়ে আসে শিউলি। নদীর তীরে কাশফুল। নীলাকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাব। কাননে দোয়েল-কোয়েলের কাকলি লহরিতে মুখরিত হয় প্রকৃতি। প্রভাতের শিশির মনে জাগায় এক অপূর্ব সজীবতা। জলে জলপদ্ম, স্থলে স্থলপদ্ম যেন প্রতিযোগিতা করতে থাকে। শীতের জ্যোৎস্নাধারা প্রাণে জাগায় অপূর্ব শিহরন। কবি তাই লিখেছেন—

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা গেঁথেছি শেফালী মালা,
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজায়ে এনেছি ডালা।

শীতকালের ফুল

শীতকাল থেকেই প্রকৃত ফুলের মৌসুম শুরু হয়। এসময় গাঁদা, আতসী, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি মনোহর

ফুল সৌরভ বিস্তার করে। গোলাপ ফুলের অপূর্ব বর্ণ ও সৌরভের জন্য একে ফুলের রানী বলা হয়। এ ঋতুতেই প্রচুর বকুল ফুল ফোটে। সুগন্ধের জগতে বহু পরিচিত এ ফুলটি।

বসন্তকালের ফুল

শীতের পরেই আসে ঋতুরাজ বসন্ত। এ ঋতুতে মাঠে, বাগানে, বনে–জঙ্গলে যেখানে-সেখানে হরেক রকম ফুলের সমারোহ দেখা যায়। গাছে গাছে শিমুল, পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া প্রকৃতিকে লাল করে ফুটে থাকে। বাগানে গোলাপ, সূর্যমুখী, ডালিয়া, জিনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের মৌসুমী ফুল ফুটে। বনে বনে অসংখ্য নাম-না–জানা ফুল ফোটে। ধরণীকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে রাখে। তাই এ ঋতুকে ঋতুরাজ বসন্ত নামকরণ সত্যিই সার্থক।

উপসংহার

গন্ধ এবং সৌন্দর্যের জন্য আমরা ফুল ভালোবাসি। ফুল পবিত্রতা এবং সৌন্দর্যের প্রতীক। ফুল মানুষকে আনন্দ দেয়। রাসুলুল্লাহ (স) ফুল খুব ভালোবাসতেন। ওষুধ তৈরিতে ফুল কাজে লাগে। ফুল থেকে মধু হয়। ফুল দিয়ে বিবাহবাসর সাজানো হয়, অনেক অনুষ্ঠানে ফুল ব্যবহৃত হয়। তাই ফুলের অর্থনৈতিক চাহিদাও আছে। অর্থাৎ ফুল মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 🕮

বাংলাদেশের জাতীয় ফুল : শাপলা

সূচনা

শাপলা একটি অতি পরিচিত এবং সুন্দর ফুল। এটি বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। বিশ্বের প্রতিটি দেশের কিছু প্রতীক থাকে। এগুলো জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়ে থাকে। যেমন— জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফুল, জাতীল ফল, জাতীয় পশু, জাতীয় পাখি প্রভৃতি। তেমনি বাংলাদেশীদের জাতীয় ফুল শাপলা।

শাপলা কেন জাতীয় ফুল

শাপলা বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়–বাঁওড়, ডোবা-পুকুর প্রভৃতির আনাচে-কানাচে এত বেশি ফুটে থাকে যে, এ ফুলের মতো আর কোনো ফুল বাঙালিদের সান্নিধ্যে আসতে পারেনি। সেজন্যই শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। তা ছাড়া শাপলাই একমাত্র ফুল যা বিশ্বের আর কোনো দেশে আমাদের দেশের মতো দেখা যায় না ।

বর্ণনা

শাপলা লতাগুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। জলে জন্মে বলে একে জলজ উদ্ভিদও বলা হয়ে থাকে। শাপলা স্রোতবিহীন জলাশয়েই সাধারণত জন্মে থাকে। এর মূল থাকে জলাশয়ের নিচে— কাদায়। জলাশয়ের পানি যতই বাড়তে থাকে এর ডাঁটাও তত বাড়ে। এর পাতা গোলাকৃতির ও বড় বড়। থালার মতো মসৃণ পাতাগুলো পানির উপর ভাসতে থাকে। এক-একটি গাছে অনেকগুলো পাতা জন্মে থাকে। পানির নিচে গাছের গোড়া থেকে নল বের হয়ে এবং তা বৃদ্ধি পেয়ে এক সময় পানির উপর ভেসে ওঠে। কুঁড়ি অবস্থায় শাপলা দেখতে অনেকটা কলার মোচার মতো। প্রথমে এ কুঁড়িটি আস্তে আস্তে ফুটতে থাকে এবং দুএকদিনের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ ফুটে যায়।

শাপলা ফুলের রং বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কোনোটা সাদা, কোনোটা লাল আবার কোনোটা বেগুনি রঙেরও হয়ে থাকে। তবে সাদা রঙের ফুলই আমাদের দেশের জাতীয় প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শাপলা ফুল থেকে আলুর মতো বড় বড় ফল হয়। একে আমরা 'ভাট' বলে থাকি। গ্রামের মানুষ এ ভাট থেকে খৈ ও মোয়া তৈরি করে।

শাপলা ফুলের রূপ

শাপলা সাধারণত বর্ষাকালে ফোটে। বর্ষাকালে বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি প্রভৃতি যখন পানিতে ভরে যায়, তখন চারদিক শোভিত করে শাপলা ফুল ফোটে। চারদিক বিস্তৃত জলাশয়ে যখন শাপলা ফুল ফোটে

তখন এক অপরূপ দৃশ্যের সূচনা হয়। জোছনারাতের স্নিগ্ধ আভার সাথে শাপলার হাসি আর মৃদুমন্দ বাতাসের দোলায় টলমল পানিতে তার রূপ সত্যিই মনোমুগ্ধকর। এসময় মনে হয় যেন আকাশের অসংখ্য তারা জলাশয়ে নেমে এসে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ দৃশ্য যেন কিছুতেই ভোলা যায় না।

উপসংহার

শাপলার ডাঁটা অনেকে তরকারি হিসেবে খায়। লাল রঙের শাপলা ফুল ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। গ্রামবাংলার ছেলেমেয়েরা শাপলা ফুলের মালা গাঁথে। অনেক বিদেশী পর্যটক শাপলা ফুলের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। শাপলা বিনা যত্নে ও বিনা পরিশ্রমেই জন্মে এবং বাংলাদেশের অপরূপ শোভা বর্ধন করে চলেছে। তাই শাপলাকে জাতীয় ফুল বিবেচনা সার্থক ও সঠিক হয়েছে বলে আমার ধারণা। 📖

প্রিয় ফুল : গোলাপ

[সংকেত]

গোলাপ ফুলের রানী— প্রাচীনকাল থেকে গোলাপের আদর রাজ-রাজড়া থেকে সাধারণ মানুষ, সবার প্রিয় ফুল গোলাপ– গোলাপের আলাদা সৌন্দর্য ও সুবাস— নানা জাতের গোলাপ— গোলাপ চাষের নিয়ম— আমাদের গোলাপ চাষের বর্তমান অবস্থা ও এর বাজারজাতকরণ— উপসংহার] 📖

ফুলের চাষ

[সংকেত]

সূচনা

ফুল সৌন্দর্য ও পবিত্রতার প্রতীক— বাংলাদেশে ফুলের নানামাত্রিক ব্যবহার— বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যে নতুন সংযোজন– ফুলচাষের আর্থিক লাভ ও ফুলচাষের ব্যাপক প্রসার। বিদেশে রপ্তানিসহ দেশে ফুল চাষের জন্য সরকারি সাহায্য ও অনুদানের প্রয়োজন— সম্ভাবনার নতুন দ্বার— উপসংহার] 📖

পুরাকীর্তি

বাংলাদেশের পুরাকীর্তি

ভূমিকা

হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।

অতীতের ওপরই বর্তমানের ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত। অতীত-উপকরণের যে-চিহ্নগুলো সংগৃহীত হয় তা-ই দিয়ে রচিত হয় ইতিহাস। আর ইতিহাসের এসব চিহ্ন বা উপকরণগুলো সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনে গড়ে তোলা হয় জাদুঘর বা মিউজিয়াম। জাদুঘরে সংরক্ষিত অতীত-উপকরণ বা চিহ্নসমূহকে বলা হয় পুরাকীর্তি। বিভিন্ন স্থাপত্য, প্রাসাদভবনও এই কীর্তির অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা পুরাকীর্তি সংগ্রহ ও গবেষণা করেন তাঁদের বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পুরাকীর্তি যথাক্রমে মূর্তি, শিলালিপি, অতীতে ব্যবহৃত গৃহোপকরণ, অলংকার, তৈজসপত্র, পাণ্ডুলিপি, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করে প্রাচীন সমাজ সভ্যতার স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেন। পূর্বপুরুষের বা জাতিসত্তার পরিচয় জানতে এ পুরাকীর্তিসমূহ প্রত্ন উপাদান হিসেবে কাজ করে। তাই পুরাকীর্তি হচ্ছে যে-কোনো জাতির জন্য জাতীয় সম্পদ। কারণ, পুরাকীর্তির ভেতরই নিহিত থাকে জাতির গৌরবগাথা— ইতিহাস।

বাংলাদেশের পুরাকীর্তির পরিচিতি

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত নবীন ভূমি হলেও এদেশের অনেক অঞ্চল বিশেষ করে লালমাটিতে গঠিত (Late Laterite formation)। বরেন্দ্র অঞ্চলসহ আরও অনেক স্থান লক্ষ লক্ষ বছরের পুরাতন ভূমি। এসব স্থানে

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মৌর্যযুগ তো বটেই, এর বহুপূর্বেই এখানে সভ্য মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল বলে পণ্ডিতদের সুচিন্তিত অভিমত।

বরেন্দ্র অঞ্চলের এসব প্রাচীন কীর্তিগুলোকে হিন্দু, বৌদ্ধ যুগ ও মুসলিম আমলের কীর্তি বলে চিহ্নিত করা যায়। হিন্দু–বৌদ্ধ যুগের পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে দুর্গনগরী (citadel), দুর্গ (fort), নগর (city) ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং বৌদ্ধবিহার ও বিহারিকা, স্তম্ভ, জোঙাল প্রভৃতি। মুসলিম আমলের কীর্তিসমূহ যথাক্রমে মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, খানকাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দিরগুলোর নাম তালিকাভুক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ সমগ্র দেশে সরজমিনে তদন্ত করলে অসংখ্য প্রাচীন টিবির সন্ধান পাওয়া যাবে। এগুলোর ভেতরে ও বাইরে পাথর, প্রাচীন ইট, ইটের ভগ্নাংশ, মাটির তৈরি হাঁড়িপাতিলের ভগ্নাংশ ও কৃষ্টি–সম্পর্কিত অন্যান্য প্রত্নবস্তু দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এগুলোতে প্রাচীনকালের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। কিন্তু এগুলো কি হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দির জাতীয় ইমারত বা বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খনন না করে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে কান্তজির মন্দিরসহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মন্দির রয়েছে। যেমন বোদেশ্বরী মন্দিরের (পঞ্চগড়) কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আবার মসজিদসমূহের মধ্যে গৌড়ের সোনা মসজিদ, কুসুম্বা মসজিদ, বাগেরহাট ষাটগম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিভিন্ন মাজার ও খানকাশরীফ রয়েছে। অপরদিকে, বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গের ফেনী জেলার ছাগলনাইয়াতে আদিম যুগের পাথরের অস্ত্র পাওয়া গেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের তাম্রলিপি, শিলালিপি, নকশা ও প্রতীকযুক্ত ছাপাঙ্কিত মুদ্রা ও বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের প্রায় সব শাসকের শাসনামলের মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঢাকা জেলার রায়পুরা, শিবপুর, জয়নগর, বাগার, যশোর প্রভৃতি গ্রাম থেকে পাওয়া মুদ্রাগুলো আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর।

টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকেও বিভিন্ন প্রত্নভাষ্য ব্যক্ত হয়েছে। যেমন—পশুপাখি শিকারের দৃশ্য, যুদ্ধের দৃশ্য, নর্তকীর মূর্তি ইত্যাদি। ঢাকা জাদুঘরে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পোড়ামাটির নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। মূর্তি ও ভাস্কর্য পুরাকীর্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। শুধু হিন্দু দেবদেবী নয়, গ্রিক দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায় এ জাদুঘরে। কৃষ্ণপাথর ও শ্বেতপাথর উভয় দিয়েই এ মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়াও মধ্যযুগের শাসনামলের বিশেষ করে শেরশাহ, ঈশা খাঁর কামান, নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ ও টিপু সুলতানের ব্যবহৃত তরবারি, পারস্যের সুলতান শাহ আব্বাসের শিরস্ত্রাণ ঢাকা জাদুঘরে রয়েছে। মূল্যবান পুরাকীর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে হাতির দাঁতের পাটি ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য, সোনা-রুপার প্রাচীন অলংকার। এ ছাড়াও সংগীতবিষয়ক বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায়।

পুরাকীর্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনার জন্য পুরাকীর্তি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মূলত পুরাকীর্তি মানবসভ্যতার ইতিহাসের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতায় জাতিতে জাতিতে সংস্কৃতির যে অদলবদল ঘটে তার নিদর্শনও পুরাকীর্তিতে পাওয়া যায়। কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায় —

মানুষের সভ্যতা যতদূর উন্নত হয়েছে
ততোদূর সফল হয়েছে মানুষের বিবেক।

মানুষের সভ্যতা কতদূর উন্নত হয়েছে তা আমরা তুলনা করতে পারি পুরাকীর্তির সাথে মিলিয়ে দেখলে। এজন্য বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান খনন এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রত্নকীর্তি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

অপরদিকে সংগৃহীত পুরাকীর্তিগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন জাদুঘর নির্মাণ। বাংলাদেশে সোনারগাঁ জাদুঘর, ঢাকা জাতীয় জাদুঘর এবং রাজশাহীতে বরেন্দ্র জাদুঘরসহ বেশ কিছু জাদুঘর রয়েছে। এসব জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে প্রাচীন যুগের পুরাকীর্তিসমূহ। এগুলো আরও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও জাতীয় জাদুঘরসহ অন্যান্য জাদুঘরে টিকিটের মাধ্যমে এগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তথাপি পুরো পুরাকীর্তির ওপর ভিত্তি করে আরও ভালো ভালো গ্রন্থ প্রকাশ করাও প্রয়োজন।

উপসংহার

জাদুঘর হচ্ছে অতীতের দর্পণ। প্রাচীনের মুখ আমরা দেখি জাদুঘরের পুরাকীর্তিগুলো অবলোকন করেই। তাই পুরাকীর্তি

কালের সাক্ষী হয়ে রয়ে যাবে অনন্তকাল। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই পুরাকীর্তি দেখে জানতে পারবে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। তাদের মনেও জন্ম নেবে দেশপ্রেম। বস্তুত, পুরাকীর্তির চেয়ে ইতিহাসের আর কোনো বিশ্বস্ত উপকরণ নেই। আমাদের জাতীয় প্রয়োজনেই পুরাকীর্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা আবশ্যক। 🕮

গণসংযোগ মাধ্যম

টেলিভিশন

সূচনা

আধুনিক সভ্যতার প্রসারে মানুষ যত যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে তন্মধ্যে টেলিভিশন অন্যতম। একদিন মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল দূরকে নিকট করার, অজানাকে জানবার, সে ধারাতেই মানুষের এক অসাধারণ সাফল্য টেলিভিশন আবিষ্কার। বেতার ও চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পর এ দুয়ের সম্মিলিত রূপ—শ্রবণ ও দর্শন বিনা তারেই, বিনা সংযোগেই হাজার হাজার মাইলের দূরের বস্তু দেখছি, কথা শুনছি আমরা। অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও এটা এতই সহজসাধ্য বলে মনে হয়, যেন তেমন কিছু ঘটেনি।

টেলিভিশন আবিষ্কারের ইতিকথা

১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের জন বেয়ার্ড সর্বপ্রথম টেলিভিশন আবিষ্কার করেন। তারপর সময়ের গতি ও বিজ্ঞানের নব নব অগ্রযাত্রার ফলে ১৯৩৬ সালে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন উদ্ভাবিত হয়। এই টেলিভিশনের প্রথম সম্প্রচার করে বিবিসি। দূর থেকে ভেসে আসা ছবি দেখা যায় বলে টেলিভিশনের পরিভাষা হল 'দূরদর্শন'।

টেলিভিশনের ব্যবহার ও উপযোগিতা

টেলিভিশন মূলত বিনোদন উপকরণ হলেও বর্তমানে এর গুরুত্ব ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। অবসর ও ক্লান্তি দূর করার জন্য টেলিভিশন মনের খোরাকের যোগান দেয়, মনে আনন্দ সৃষ্টি করে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার, শিক্ষার ও তথ্যপ্রবাহের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে। রাষ্ট্রীয় নির্বাচন, দুর্যোগ মোকাবেলা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, বাণিজ্য ও বিপণন, আন্তর্জাতিক মত গঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও টেলিভিশন ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

জনমত গঠনে টেলিভিশনের ভূমিকা

টেলিভিশন অত্যন্ত প্রভাবক গণমাধ্যম। সংবাদ বা যে-কোনো শ্রবণযোগ্য অনুষ্ঠান যেহেতু সরাসরি দেখা যায় তা মনের মধ্যে একটা তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। জনসংখ্যা সীমিতকরণ, মাদকাসক্তি নিবারণ, সন্ত্রাসরোধ, শিশু ও নারী পাচার বন্ধকরণ, ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ ইত্যাদি কাজে টেলিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এসব রোধকল্পে এগুলোর ক্ষতিকারক ও জীবন ধ্বংসকারী রূপ সম্পর্কে যখন টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয় তখন সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, মানুষ সতর্ক হয়। এভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে টেলিভিশনের প্রচার মানুষকে উদ্দীপিত ও প্রণোদিত করে।

টেলিভিশনের প্রয়োজনীয়তা

টেলিভিশন আজ বিলাস-উপকরণ নয়, বরং একটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি সব ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমরা টেলিভিশনকে পাই পথনির্দেশক বন্ধু হিসেবে। তা ছাড়া, সাম্প্রতিককালে গবাদিপশুর চাষ, মৎস্যচাষ, খামার উন্নয়ন, সারের ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ফল-ফুল-ফসলের বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত উৎপাদন ইত্যাদি ব্যাপারে টেলিভিশনের নানা উন্নয়নমুখী অনুষ্ঠান ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে মানুষের মধ্যে। তা ছাড়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রান্না, স্থাপত্য, ভ্রমণ ইত্যাদি নানা শিক্ষণীয় বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে টেলিভিশনে। সাধারণ মানুষের নানা জিজ্ঞাসার জবাব যখন এই মাধ্যমে প্রচারিত হয়, তা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে মানুষের মনে। সরকার শহরের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলোতে যেখানে পার্ক আছে এবং থানা সদর ও গ্রামের কম্যুনিটি সেন্টারগুলোতে যেখানে বিদ্যুৎ আছে সেখানে টেলিভিশন সেট দিয়েছে। এর ফলে কৃষি ও উন্নয়ন-সম্পর্কিত অনেক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রামের সাধারণ কৃষক জেনে উপকৃত হচ্ছে।

অপকারিতা

টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে যদি আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিপন্থি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা নিঃসন্দেহে কিশোর, তরুণ তথা সকলের মনে একটা খারাপ প্রভাব ফেলবে। টেলিভিশন থেকে মাঝে মাঝে যে অপরাধবিষয়ক বিদেশি ছবিগুলো দেখানো হয় তাতে তরুণরা প্রভাবিত হয়, বিপথে পরিচালিত হয়। দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে তুলে ধরার বদলে টেলিভিশনে যদি বিদেশি ভাবধারা ও জীবনধারা তুলে ধরা হয় তবে সেটা আমাদের সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এতে দেশে অপসংস্কৃতির বিস্তার ঘটবে।

নেতিবাচক দিক

আজকাল ডিশ অ্যান্টেনার মাধ্যমে বহু চ্যানেলে টেলিভিশন দেখার সুযোগ পাচ্ছে এদেশের সব বয়সের দর্শক। এই উন্মুক্ত বিনোদন অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে বাইরের সংস্কৃতিকে যেভাবে উন্মুক্ত করে তুলেছে আমাদের কাছে, এতে দেশের আবহমান সংস্কৃতির ধারা প্রভাবিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৪ সাল থেকে। তখন ঢাকার রাজউক ভবনের সংকীর্ণ পরিসর থেকে কোনোরকমে কাজ চালাতে হত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রামপুরায় আধুনিক টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম ও খুলনায় দুটি টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ১৯৮১ সাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন রঙিন অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেছে। চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় ১৯৮৪ সালে ও পরবর্তীতে টাঙ্গাইলের তালিবাবাদে দুটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে আমরা পৃথিবীর যে-কোনো স্থান থেকে প্রেরিত দৃশ্য আমাদের টেলিভিশন সেটে সরাসরি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি।

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় অর্ধডজন বেসরকারি টেলিভিশন চালু রয়েছে। এগুলো হল—চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, এনটিভি, বাংলা ভিশন, চ্যানেল-১, একুশে টিভি, বৈশাখী প্রভৃতি। বিষয়বৈচিত্র্য ও উপস্থাপন-কৌশলে কয়েকটি টিভি চ্যানেল বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

উপসংহার

বর্তমান যুগ গতিশীলতার যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। পৃথিবীকে জানতে হলে, বর্তমান জীবনকে সজীব করে রাখতে হলে আমাদের জীবনে নৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য টেলিভিশনের প্রয়োজন অপরিহার্য। তবে এ মাধ্যমটি যেন কিছু নীতিমালার ভিত্তিতে সম্প্রচারিত হয় সেদিকে সচেতন থাকতে হবে। 🕮

সংবাদপত্র

সূচনা

সংবাদপত্র ছাড়া আধুনিক সভ্যতার কথা ভাবা যায় না। দেশ-বিদেশের বিচিত্র সংবাদ প্রতিদিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। তাই আধুনিক সভ্যতার বাণীবাহক হচ্ছে সংবাদপত্র। প্রতিদিন ভোরবেলা যে-জিনিসটি সবার আগে প্রত্যাশিত তা হচ্ছে সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের উদ্ভব

পৃথিবীর কোন দেশে সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের প্রচলন হয় তার সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে এটা জানা যায়, কাগজ আবিষ্কারের কিছুদিন পর সংবাদপত্রের প্রথম প্রচলন হয় ইতালির ভেনিস শহরে। মুদ্রণযন্ত্র, বিদ্যুৎ ও বেতার আবিষ্কারের ফলে সংবাদপত্র শিল্পের আরও প্রসার এবং উন্নতি ঘটে। পৃথিবীতে শিক্ষার হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের চাহিদাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। প্রথম বাঙালি সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে।

সমাজের মুখপত্র, দেশগঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা

সংবাদপত্র হচ্ছে দেশ ও সমাজের মুখপত্র। সাংবাদিকদের উচিত সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরা। এজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

সংবাদপত্রের বর্তমান রূপ

আগে সংবাদপত্র বলতে শুধু বোঝাত সংবাদ পরিবেশনের কাগজ মাত্র। সেখানে অন্য কিছু থাকত না। আজকাল একটি দৈনিক পত্রিকায় শুধু সংবাদ থাকে না, থাকে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র, মহিলাজগৎ, ধর্ম, ফ্যাশন, কৌতুক, কার্টুন ও ক্রীড়াবিভাগ। তা ছাড়া শিশুদের জন্য শিশু বিভাগ, মহিলাদের জন্য রয়েছে মহিলা বিভাগ। সংবাদপত্র এখন রাজনৈতিক মত প্রচারের বিশেষ শক্তিশালী যন্ত্র বিশেষ।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবাদপত্রকে বলা হয় রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। জনমত গঠন ও মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রে রয়েছে সংবাদপত্রের মূল্যবান ভূমিকা।

সংবাদপত্রের ক্ষতিকর দিক

সংবাদপত্র সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্তও করতে পারে। কোনো দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রুচি ও বিশ্বাসকে তুলে ধরে সংবাদপত্র সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কাজেই, সংবাদপত্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ক্ষতিও করতে পারে বেশ। তবে এক্ষেত্রে পাঠকদের লক্ষ রাখতে হবে কোনটা সঠিক ও কোনটা মিথ্যা।

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা

তথ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা শহর থেকে প্রায় ৫০০টিরও বেশি বাংলা দৈনিক, ১০টি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাসহ বহু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

উপসংহার

বর্তমান যুগ হচ্ছে অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগ। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষকে যেমন জানতে পারি, তেমনি জানতে পারি নিজেদের। তবে এক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় দরকার তা হল বস্তুনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের। এরূপ সংবাপত্রের মাধ্যমেই আমরা দেশ ও বহির্বিশ্বের সঠিক সংবাদ ও অগ্রগতির ধারা সম্পর্কে অবহিত হতে পারব। 🕮

ভ্রমণ

দেশভ্রমণ

সূচনা

মানুষ চিরকাল একভাবে জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার নিত্যনতুন কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করবার আকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক। কারণ, বৈচিত্র্যের মধ্যেই জীবনের আনন্দ। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মধ্যে যে কত বিচিত্র জায়গা, বিভিন্ন মানুষ ও নানা রকম দৃশ্যাবলি আছে তার অন্ত নেই। আমরা সাধারণ মানুষ জগৎ সম্বন্ধে কতটুকুই-বা জানি! বিরাট অজানা রাজ্যের কিছুটা না জানলে জীবনের সার্থকতা থাকে না। আমাদের পরিচিত আবেষ্টনীর বাইরে গেলে এই একই পৃথিবীর মধ্যে এবং একই মানবসমাজের মধ্যে কতই-না পার্থক্য। প্যারিস অথবা নিউইয়র্কে গেলে দেখা যায় বর্তমান সভ্যতার কী বিপুল সমারোহ, বিলাসব্যসন, ব্যস্ততা ও কোলাহলের কী অন্তহীন আয়োজন।

ভ্রমণে অর্জিত হয় বাস্তব অভিজ্ঞতা

দেশ-বিদেশ ভ্রমণে যে-শিক্ষা হয় সে-শিক্ষা বই পড়ে আয়ত্ত করা যায় না। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি অপেক্ষা একজন ভ্রমণকারী জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনেক বেশি জানেন। কারণ পুঁথি-পুস্তকে যা আমরা পড়ি তা প্রাণহীন অবস্থায় থেকে যায়। কিন্তু যখন আমরা ভ্রমণে নানা দেশ ও জাতির সাক্ষাৎ পরিচয় পাই, তখন বইয়ের জগৎ আমাদের সামনে

প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। যেসব দেশ ও মানুষ সম্বন্ধে বইতে পড়ে মনে রাখতে প্রাণান্ত হতে হয়, তাদের সাথে একবার চাক্ষুষ পরিচয় হলে মনের মধ্যে চিরকাল তা জাগরূক হয়ে থাকবে। ইতিহাসে যাদের কীর্তি মনকে নাড়া দিতে পারেনি, তাঁদের লীলাস্থলগুলো একবার স্বচক্ষে দেখলে তা আমাদের উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলে। যেসব প্রাচীন জায়গায় বহু সভ্যতার উত্থান-পতন, বহু ভাগ্যের ভাঙাগড়া হয়ে গিয়েছে সেসব জায়গায় একবার গেলে মনে হয়, সুদূর অতীত যেন স্মৃতির অন্ধকার হতে চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ভ্রমণ থেকে শিক্ষা

আবার প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো অজ্ঞাত দ্বীপে অথবা কোনো দুর্গম উপত্যকায় গেলে দেখা যায় ঐসব জায়গায় মানুষ আধুনিক সভ্যতার সর্বপ্রকার স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে।

ভ্রমণের উপকারিতা

ভ্রমণ মানুষের মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করে বলে আমাদের ছন্দহীন বাঁধাধরা জীবনে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিচিত্র নরনারী, বিভিন্ন দেশ এবং জনপদ দেখে মানুষের হৃদয়ের উদারতা ও প্রশান্তি বেড়ে যায়। যারা চিরকাল একই জায়গায় কাটিয়েছে তাদের দৃষ্টি সংকুচিত ও মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতার অভাবে মানুষ জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে অপারগ হয়। কিন্তু যারা দেশ-বিদেশ ঘুরে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করে তারা উদার ও উন্মুক্ত মন নিয়ে জীবন ফুলে–ফলে গৌরবময় করতে সক্ষম হয়। ভ্রমণের ফলে মানুষের ভ্রান্ত মত ও বিকৃত ধারণা দূর হয়, দৃষ্টি খুলে যায়।

ভ্রমণকাহিনী পাঠ

ভ্রমণের যে আনন্দ ও উপকার তা আংশিক পাওয়া যায় ভ্রমণকাহিনীতে। ভ্রমণকাহিনীর মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীর কত বিচিত্র রহস্য ও আনন্দ সৌন্দর্যই না আমরা জানতে পারি। মর্কোপোলের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে প্রাচীন পৃথিবীর অজ্ঞাতপরিচয় জীবন আমাদের মানসগোচর হয়। রবীন্দ্রনাথের *রাশিয়ার চিঠি*, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *দ্বীপময় ভারত*, মনোজ বসুর *চীন দেখে এলাম*, সৈয়দ মুজতবা আলীর *দেশে বিদেশে* ও *জলে ডাঙায়*, মুহম্মদ আবদুল হাই-এর *বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন* প্রভৃতি বই পড়ে আমরা দেশভ্রমণের আনন্দ অনুভব করি। অন্নদাশংকর রায়ের *পথে প্রবাসে* বা *জাপানে* পড়ে আমরা বিলেত ও ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপ ও জাপানের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল মর্মবাণী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। তবে দেশ-বিদেশের ভ্রমণকাহিনী পড়ে যতই জ্ঞান লাভ করা যাক না কেন প্রত্যক্ষভাবে ও বাস্তবে দেশভ্রমণ না করলে কোনো জ্ঞানই সম্পূর্ণ হয় না। তাই দেশভ্রমণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে— 'তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর'।

উপসংহার

মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করবার জন্য দেশভ্রমণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর এ উপদেশ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যখন একজন মানুষ দেশভ্রমণে বেরোয়। 📖

আমার বিমানভ্রমণের অভিজ্ঞতা

পঙ্খীরাজ ঘোড়া আর পুষ্পকরথের কথা যেদিন গল্প-কাহিনীতে প্রথম পড়েছিলাম সেদিন অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবছিলাম— এটা কী করে সম্ভব আকাশে মহাশূন্যে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে পঙ্খীরাজ ঘোড়া অথবা ঘোড়ায় টানা সুসজ্জিত রথ!

কিন্তু আমার অবাক হওয়ার বহু আগেই যে মানুষ আকাশযান অর্থাৎ বিমান আবিষ্কার করেছে— এমনকি রকেটে চড়ে চাঁদে ঘুরে এসেছে তাও জানতাম। তবুও কেমন জানি বিস্ময় লাগত মানুষ শূন্যের ওপর দিয়ে নীল আকাশের হৃদয় চিরে— মেঘের ভেলা কেটে ভাসতে ভাসতে উড়তে উড়তে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলেছে। কত হাজার যোজন দূরের পথকে করেছে কয়েক ঘণ্টার পথ। ইচ্ছা ছিল এজন্যই, একদিন বিমানে চড়ে পাড়ি দেব দূরের কোনো দেশে। অবশ্য দূরদেশে বিমানে পাড়ি দেওয়ার সুযোগ না হলেও একদিন সুযোগ এসে গেল নিজের দেশে বিমানভ্রমণের তা সে যত কাছেরই হোক।

দিনক্ষণ আগে স্থির ছিল না। তবে আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হওয়ার একদিন আগে বাবা রাজশাহী যাবেন জরুরি কাজে, দুদিন থাকবেন জানালেন। বললেন তাঁর সঙ্গে যেতে। গত বছর বাড়ি যাইনি, তাই রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু দুদিন মাত্র বলাতে মনটা সায় দিতে চাইছিল না। তবুও বাবা যখন বললেন তিনি বিমানে যাবেন, তখন মনটা আনন্দ ও উত্তেজনায় নেচে উঠল। কারণ এর আগে আমি কোনোদিন বিমানে চড়িনি। কেমন যেন এক অজানা চাঞ্চল্যে হৃদয়টা নেচে উঠল। রবীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর *জীবনস্মৃতি*তে পড়েছি—যেদিন তিনি প্রথম রেলগাড়িতে চড়ে কলকাতা থেকে বোলপুর যাচ্ছিলেন সেদিনের প্রচণ্ড আনন্দ আর উত্তেজনার কথা। তাঁর নাকি ভয় ছিল পাছে তিনি ট্রেনের ঝাঁকুনিতে না বাইরে ছিটকে পড়ে যান। আমার মনেও সেরকম একটা অব্যক্ত চাঞ্চল্য যেন সারাক্ষণ তুমুল আন্দোলন তুলছিল।

প্রতীক্ষিত দিনটি এসে গেল। সেদিন ছিল ২৮শে মার্চ ১৯৯৭। বাবা অগ্রিম টিকিট করে এনেছেন। মার্চের ২৯ তারিখ সকাল পৌনে দশটায় আমাদের উড্ডয়নের সময়। অবশ্য সাড়ে আটটার মধ্যেই আমাদের রিপোর্ট করতে হবে বিমানবন্দরে। তাই সকাল সাড়ে আটটায় যথারীতি আমরা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে কাউন্টারে টিকিট দেখিয়ে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যথাসময়ে ঘোষিত হল আমাদের যাত্রার সময় হয়েছে, বিমান প্রস্তুত।

বাংলাদেশ বিমানের ফকার এফ-২৭-এ ঢুকতেই দরজায় একজন বিমানবালা বিনম্র হাসিতে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বিমানের মাঝামাঝি ছিল আমাদের দুজনের আসন। বাবাকে বললাম, আমি জানালার পাশেই বসব। বিমান আকাশে উড়বার আগে একজন বিমানবালা এসেই অনেকগুলো দৈনিক পত্রিকা হাতের কাছে ধরলেন। আমি একটি বাংলা দৈনিক নিলাম। এর কিছুক্ষণ পর ট্রেতে করে আনা হল লজেন্স। আমি কয়েকটা লজেন্স নিলাম। এরপর বিমান ছাড়বার পালা। বৈমানিক আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে শুভযাত্রা কামনা করে বিমান ছাড়বার ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড আওয়াজে পুরো বিমানটি থরথর করে কেঁপে উঠল। আমার বেশ ভয় করছিল। তবে কৌতূহল ছিল বেশি। বিমান প্রচণ্ড গতিতে প্রচণ্ডতর গর্জন করে রানওয়ে দিয়ে প্রথমে আস্তে আস্তে এবং পরে দ্রুত ছুটে চলতে হঠাৎ হিস করে উপরে উঠে গেল। এবার মনে হল এটা যেন স্থির হয়ে গেছে, চলছে যেন কত আস্তে আস্তে। ওঠার সময়ই জানালা দিয়ে লক্ষ করছিলাম কীভাবে উড়াল দিয়ে আমরা উঠে যাচ্ছি একটু তেরচা হয়ে উপরের দিকে। সবুজ মাঠ প্রান্তর মনে হচ্ছিল দাবা খেলার ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড ছকের মতো। গাছপালা, ঘরবাড়ি যেন ছবির মতো মাটির সঙ্গে লেগে আছে। এরপর দেখতে পেলাম সাদা তুলোর মতো মেঘ আমাদের পায়ের নিচে। আমরা তখন মেঘের উপর দিয়েই যাচ্ছিলাম। বৈমানিক ঘোষণা করলেন, আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে সুন্দর আবহাওয়ায় ২১,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছি।

বিমান চলছে আর আমি দেখছি আমার পড়া সেই পুষ্পকরথ থেকে আকাশের অপরূপ দৃশ্য। বেশি সময় লাগল না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এসে গেলাম রাজশাহীর সীমানায়। প্রমত্ত পদ্মায় চর জেগেছে, পানি শুকিয়ে যাচ্ছে কাগজে পড়েছিলাম। এবার স্বচক্ষে দেখলাম, সত্যিই তো! পদ্মাকে বিমান থেকে মনে হচ্ছিল যেন চিকন একখানা দীর্ঘ দড়ি। মাঝে চরগুলোর বালি চিক-চিক করছে।

প্রথম বিমানভ্রমণে বমি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই বাবা কাগজি লেবু, এভোমিন ট্যাবলেট ইত্যাদি সঙ্গে নিয়েছিলেন আমার জন্য। বিমান-নামবার সময়ও একটু বিপজ্জনক। বাবা বিমান অবতরণের ঘোষণার আগেই আমার সিট-বেল্ট বাঁধতে বললেন। ত্রিশ মিনিট ভ্রমণেই আমরা এসে গেলাম রাজশাহী বিমানবন্দরে। ভালোই লাগল— পদ্মা এক্সপ্রেসে ঢাকা থেকে রাজশাহী আসতে যেখানে সময় লাগত প্রায় এগারো ঘণ্টা, বাসে আসতে লাগত সাত ঘণ্টা বা আরও বেশি সে-পথ কত আরামে এসে গেলাম আধঘণ্টার একটু বেশি সময়ের মধ্যে। আধুনিক বিজ্ঞান এভাবে দূরকে করেছে কত নিকট, জীবনকে করেছে কত গতিময় ভাবতেই অবাক লাগল।

জীবনের এই প্রথম বিমানভ্রমণের অভিজ্ঞতা আনন্দ, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য ও বিস্ময়ে আমার মনকে পরিপূর্ণ করে তুলল। এ বিমানভ্রমণ আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনাও বটে। 📖

রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা

[সংকেত]

সূচনা— বাংলাদেশের যোগাযোগ-ব্যবস্থায় রেল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। ভ্রমণ— চট্টগ্রাম থেকে মহানগর প্রভাতীযোগে ঢাকা— যাত্রার পূর্বপ্রস্তুতি— চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে আগমন-যাত্রা শুরু— পথের দৃশ্য— রেলভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা— রেলের ভেতরে খাবারদাবার— ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছা। কমলাপুর রেলস্টেশনের দৃশ্য। উপসংহার।

সভ্যতার পরিচয়

লোহা

সূচনা

বর্তমান সভ্যতার অন্যতম প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য উপাদান লোহা। লোহা দালান নির্মাণের ভিত্তি হিসাবেই কাজ করে না, লোহা মানবসভ্যতারও ভিত্তি।

আবিষ্কার

বন্য পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আদিমকালের মানুষ একদিন লোহা আবিষ্কার করেছিল। আত্মরক্ষার প্রয়োজন থেকে এর আবিষ্কার, কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ আত্মরক্ষা কবচটি মানুষের সভ্যতাকেও তার নিজের অবয়বের মতো দৃঢ়তর ও কঠিনতর করেছে।

লোহার বিবরণ

লোহা খনিজ পদার্থ। লোহা খনিতে থাকে, পর্বতের গায়েও থাকে। খনিতে যে লোহা পাওয়া যায় তা অঙ্গার, গন্ধক প্রভৃতি খনিজ ধাতুর সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এসব ধাতু থেকে গলিয়ে লোহা বিশুদ্ধ করতে হয়। তবে পর্বতের গায়ে যে-লোহা পাওয়া যায় তা পাথরের সঙ্গে মিলে থাকে এবং আস্ত লৌহপিণ্ড আকারেও পাওয়া যায়।

প্রকারভেদ

সাধারণ লোহা থেকে তিন রকমের লোহা তৈরি হয়। যথা— ঢালাই লোহা, পেটা লোহা ও ইস্পাত। পেটা লোহার সঙ্গে প্রয়োজনমতো অঙ্গার মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি হয়। লোহার মধ্যে ইস্পাত সবচেয়ে শক্ত। এর প্রয়োজনও অধিক, দামও বেশি।

প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লোহার প্রয়োজন বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। কৃষকের জন্য, গৃহস্থের জন্য, বৈজ্ঞানিকের জন্য—সবার জন্য লোহা প্রয়োজন। লোহা দিয়ে তৈরি হয় গৃহস্থের দা, কুড়াল, কোদাল, হাতুড়ি, কাঁচি ইত্যাদি। বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ থেকে শুরু করে কৃষকের লাঙলের ফলা, কাস্তে, মজুরের হাতুড়ি আর শাবল তৈরির কাজে লোহা প্রয়োজন। বাড়ি প্রস্তুত করতে হলে, যানবাহন তৈরি করতে হলে লোহার প্রয়োজন অপরিহার্য। দেশরক্ষার জন্য নানাবিধ অস্ত্রপাতিও লোহার দ্বারাই তৈরি হয়। এক কথায় বলা যেতে পারে বর্তমান সভ্যতার প্রধান নিয়ামক হল লোহা।

খনি ও কারখানা

রাশিয়া, ইংল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা, সুইডেন প্রভৃতি দেশে প্রচুর লোহা পাওয়া যায়। ভারতেও লোহার খনি আছে। বাংলাদেশে এখনও লোহার খনির সন্ধান পাওয়া যায়নি। লোহার জন্য আমাদের অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হয়।

উপসংহার

কথায় আছে হাতি মরলেও লাখ টাকা, তেমনি লোহা যেখানে যে-অবস্থাতেই থাকুক লোহার দাম ও প্রয়োজন কমে না। সোনা দামি বটে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজনে লোহাও কম দামি নয়। 🕮

কাগজ

[মানবসভ্যতা বিকাশে কাগজ]

সূচনা

সভ্যতার প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রে কাগজের প্রয়োজন অপরিহার্য। বর্তমান যুগে কাগজ শিক্ষার ও রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম প্রয়োজনীয় বস্তু।

বর্ণনা

কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ তালপাতা, ভুর্জপত্র ও গাছের বাকল দিয়ে লেখার কাজ চালাত। কিন্তু এসব উপাদান সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর এবং ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। ক্রমে ক্রমে কাগজ আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে সেসব অসুবিধা দূর হয়েছে।

ইতিহাস

অনেকের মতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে চীন দেশে রেশম থেকে কাগজ তৈরি হত। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, চীনা কারিগর টৎসাই লুন (Ts'ailun) সম্রাট হো ডি-এর রাজত্বকালে সর্বপ্রথম গাছের বাকল, শন, ছেঁড়া কাপড় থেকে মণ্ড তৈরি করে ১০৫ খ্রিষ্টাব্দে কাগজ তৈরি করেন। আমাদের দেশে বহুকাল যাবৎ চীনদেশের কাগজ এবং তুলট কাগজের ব্যবহারের প্রচলন ছিল। ক্রমে বিভিন্ন দেশে উন্নতমানের কাগজ বের হওয়ায় পুরনো কাগজের ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

চীনের ন্যায় আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে কাগজ তৈরি করা হত। তবে সে-কাগজ ছিল হাতের তৈরি। বর্তমান যুগে হাতের তৈরি কাগজের দ্বারা দেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এ চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের দেশে চন্দ্রঘোনা, পাকশি ও খুলনায় তিনটি আধুনিক কাগজের কল স্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি কাগজকলও স্থাপিত হয়েছে।

উপকরণ

ঘাস, পাট, শন, বাঁশ, কাঠ ও কাপড় ইত্যাদি দিয়ে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে বাঁশ, সুন্দরী ও গেওয়া কাঠ এবং আখের ছোবড়া থেকে কাগজ তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে মণ্ড তৈরি হতে শুরু করে নির্দিষ্ট আকারের যাবতীয় কাগজ যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

ছেঁড়া কাপড়, ঘাস প্রভৃতির অভাবে ইউরোপে কাঠ হতেও কাগজ প্রস্তুত করা হয়। চামড়া দ্বারা মূল্যবান কাগজ প্রস্তুত হয়। চামড়ার তৈরি কাগজ দীর্ঘস্থায়ী ও সুদৃঢ় বলে মূল্যবান দলিলপত্রাদিতে ঐ কাগজ ব্যবহৃত হয়। এস এস সি, এইচ এস সি ও কলেজের সার্টিফিকেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ডিপ্লোমা ইত্যাদির সনদপত্র পুরু মূল্যবান কাগজে ছাপা হয়।

শ্রেণীভেদ

উৎপাদনভেদে কাগজের গুণের যেমন তারতম্য হয় তেমনি মূল্যেরও তারতম্য হয়। ডিমাই, ক্রাউন, ফুলসক্যাপ প্রভৃতি নানা আকারের কাগজ যেমন হয় তেমনি প্রয়োজন অনুযায়ী আজকাল পাতলা, মোটা, মসৃণ, অমসৃণ ও রঙিন, অফসেট প্রভৃতি নানা রকমের ও নানা রঙের কাগজ প্রস্তুত হয়।

বাংলাদেশে কাগজশিল্প

দুটি সরকারি কাগজ কল ছাড়াও বাংলাদেশে এখন প্রায় পাঁচ ছটি বেসরকারি কাগজ কল স্থাপিত হয়েছে—সেগুলো নানা ধরনের উন্নতমানের কাগজ তৈরি করছে। তার পরও বিদেশ থেকে আমাদের প্রচুর কাগজ আমদানি করতে হচ্ছে।

উপসংহার

বর্তমান জগতে কাগজের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা বলে শেষ করা যায় না। কাগজ আবিষ্কারের ফলে মানবসভ্যতার এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। কাজেই কাগজকে মানবসভ্যতার উন্নতির ভিত্তি বলা যেতে পারে। কাগজ না হলে বই ছাপা, রাষ্ট্র পরিচালনা, সংবাদপত্র ছাপা সম্ভব হত না। কাগজ না হলে মোটের ওপর সভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি হত। আধুনিক যুগে কাগজ আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা তথা মানবসভ্যতার বিকাশের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। 🕮

বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষিজাত পণ্য

বাংলাদেশের কৃষক

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার শতকরা পঁচাশিজন লোক নির্ভর করে কৃষির ওপর। বাকি পনেরো জন মাত্র শিল্প, ব্যবসায়, চাকরি ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত। সুতরাং বাংলাদেশ কৃষকের দেশ একথা বললে হয়তো কিছুমাত্র অত্যুক্তি

হয় না। কারণ, তারাই বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ, ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, এদেশে কৃষকরাই সর্বাপেক্ষা অবহেলিত এবং তাদের অবস্থাই সবচেয়ে বেশি শোচনীয়।

কৃষিনির্ভরতা

অন্যদিকে এদেশের যাবতীয় সম্পদ অর্জিত হয় কৃষির মাধ্যমে। কৃষির সাহায্যেই আমরা আমাদের খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ফলমূল ও তরিতরকারি উৎপাদন করি। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য হল পাট। পাট কৃষিজাত দ্রব্য; শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও পাওয়া যায় এ কৃষিজাত দ্রব্য থেকে। যে-বছর দেশে ভালো ফসল হয় সে-বছর দেশের অবস্থাও হয় সচ্ছল এবং যে-বছর ভালো ফসল হয় না সে-বছর দেশেও দেখা দেয় অনটন, অর্থাভাব। যে-বছর ফসল হয় খুব কম, দেখা দেয় অজন্মা; সে-বছর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, অনাহারে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে এদেশের সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কৃষির ওপর। অথচ আমাদের দেশে কৃষকেরা সবচাইতে বেশি বঞ্চিত, অবহেলিত ও অভাবগ্রস্ত। তাই কৃষকের উন্নতি না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি কোনোদিন সম্ভব নয়।

কৃষকদের দুরবস্থা

একদিন বাংলাদেশ ছিল সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা চির-আনন্দের দেশ। বাংলাদেশের মাঠভরা ছিল সোনালি ধান, গোলাভরা ছিল গরু আর পুকুরভরা ছিল মাছ। ইংরেজদের শাসনকাল থেকে এদেশের কৃষকদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ব্রিটিশ আগমনের পর থেকে গ্রামবাংলার মানুষ শহরমুখী হতে আরম্ভ করে। কারণ, কুটিরশিল্পের পরিবর্তে তখন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে এদেশে। গ্রামের অনেক মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। তারা আস্তে আস্তে পাড়ি জমায় শহরের দিকে। ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হওয়ায় জমির মালিক হল জমিদাররা। তার পর থেকে এদেশের কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হতে থাকে। নানা অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এদেশের কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

বাংলাদেশের কৃষক মানে এখন দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। রোগ-শোক-পুষ্টিহীনতা ও দারিদ্র্যের পেষণে জরাজীর্ণ বাংলার কৃষক আজ প্রায় নিঃস্ব। এখন কৃষক বলতে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে এক করুণ মূর্তি। গ্রামের এক জীর্ণ কুটিরে তার বাস, মাথার ওপর কোনো রকমে একটি ছাউনি আর চারদিকে কোনো রকমে বেড়া দিয়ে তারা দিন যাপন করছে দুর্ভাগ্যের চরম অভিশাপের মধ্যে।

ভূমিহীন কৃষক

বাংলাদেশের শতকরা পঁচানব্বই জন কৃষক ভূমিহীন। তাদের নিজের জমি না থাকায় কষ্টার্জিত ফসলের মোটা অংশটুকু জমির মালিককে দিয়ে তাদের হাতে এমন কিছু থাকে না। দুঃখ দারিদ্র্য তাদের কোনোদিন শেষ হয় না, যে-তিমিরে তাদের জীবন সে-তিমিরেই থেকে যায় সারা জীবন। বছরের বেশির ভাগ সময় একজন কৃষককে কাটাতে হয় অর্ধাহারে বা অনাহারে। কৃষকদের এ অবস্থা হওয়ার আরও কিছু কিছু কারণ রয়েছে। আমাদের দেশের কৃষকসমাজ আধুনিক শিক্ষার কোনো স্পর্শ পায় না। তাই তারা জানে না ফসল উৎপাদনের আধুনিক উপায়। কম পরিশ্রমে অধিক ফসল লাভের যে-পন্থা সেটা তাদের জানা নেই। তা ছাড়া নানা অপচয় ও অশিক্ষার ফলে পরিবারের লোকসংখ্যার চাপ তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। গ্রামের কৃষকরা দূরদর্শী নয়। তারা নানা সামাজিক সংস্কার পালন করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে ঋণ শোধ করতে না পেরে দেউলিয়া হয়ে যায় অনেকে।

কৃষকদের জন্য করণীয়

এদেশ যখন কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিই যখন এদেশের প্রধান সম্পদ, তাই কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের। তাদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। ভূমিহীন কৃষকদের ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষিঋণ যেন ঠিকমতো ভূমিহীন কৃষকদের হাতে পড়ে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকদের কাছে স্বল্পমূল্যে সার ও কৃষিসরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। গ্রাম্য মোড়ল, ফড়িয়া ও কিছুসংখ্যক অসাধু কৃষি বিভাগের কর্মচারীর হাত থেকে কৃষকের হাতে যেন কৃষি-সাহায্য ঠিকমতো পৌঁছায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

সরকারি কর্মসূচি

সরকার বর্তমানে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সাক্ষর করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা দল বেঁধে অভিযান চালাচ্ছে। এতে গ্রামবাংলার কৃষকরা সচেতন হবে, তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে এখন তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে। সরকার নানারকম প্রচারমাধ্যমের দ্বারা কৃষিকাজের নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে ও উৎসাহ দিয়ে বর্তমানে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করছেন। কৃষকদের কৃষি উপকরণ, সার সরবরাহ ও জমিবণ্টন ছাড়া বছরের অন্য সময় কাজ করবার জন্য কুটিরশিল্পের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা হলে কৃষকরা ঘরের কোণে অলস ও নিশ্চেষ্ট হয়ে আর বসে থাকবে না।

উপসংহার

একদিন এই বাংলাদেশকে কবি কল্পনা করেছিলেন সোনার বাংলারূপে। আমাদের দেশে এখনও যে-সম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভূমির উর্বরতা আছে তাতে এদেশকে সত্যিই আমরা রূপায়িত করতে পারব সোনার বাংলায়। তবে পরিবর্তন করতে পারে যারা তারা হল এদেশের কৃষক। তাই কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তিত হলে, কৃষির উন্নতি হলে, তবে এদেশ হবে সুন্দর, এদেশ হবে সত্যিকারের সোনার বাংলা। 🕮

কৃষিকাজে বিজ্ঞান

সূচনা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করছে, প্রকৃতির বিপুল সম্পদে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলছে। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে উন্নতির নব নব স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার আর শুভ কল্যাণকর শক্তি মানুষকে দিন দিন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিচ্ছে। বিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও নিয়ে আসছে স্বাচ্ছন্দ্য ও নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনা।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

যেদিন থেকে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল, যেদিন সে পাথরের অস্ত্র নিয়ে বন্য পশুর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল, যেদিন সে চাকা গড়তে পারল প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু। মানুষ সেদিন আবিষ্কার করল অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় তার ক্ষুদ্র অবয়বে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম অথচ প্রবল বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্ক। প্রকৃতির রহস্য ভেদ করার জন্য নব নব আবিষ্কার করল সে। প্রকৃতিতে আবিষ্কার করার নেশায় মানুষ অস্থির হয়ে উঠল, কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। তাই প্রকৃতি প্রদত্ত শস্যসম্পদে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। সে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে নিজের রুচি ও চাহিদাকে পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করেছে।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান

মানুষ খাদ্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষিকার্য প্রাচীন কলাকৌশল ও আদিম স্তর কাটিয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছে গেছে। জলসেচের ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, বীজ সংরক্ষণ, বিভিন্ন রকমের সারের ব্যবহার, ভূমিসংরক্ষণ ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি কৃষিবিজ্ঞানের অবদান। পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ফসলের জমির পরিমাণ সীমিত। এ সীমিত কর্ষণযোগ্য জমিতে বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ ক্ষুধার্তের অন্ন সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান

উন্নত দেশসমূহে আজ কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। জমিকর্ষণ, সারপ্রয়োগ, বীজবপন, সেচকার্য, ফসল কাটা, মাড়াই এবং বাছাই ইত্যাদি সব কাজ আজ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদন করা হচ্ছে। ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ করে মেশিন দিয়ে জমিতে বীজ বপন করা হয়। তার আগে বপনের জন্য সংরক্ষিত বীজ-বাছাইকাজও যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। জমিতে প্রয়োজনমতো সার দেওয়া কিংবা ফসলে পোকা লাগলে পোকা দমনের জন্য কীটনাশক ছিটানোর কাজও যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। আজকের যুগে ফসলের জমিসেচের জন্য মানুষ আর চাতক পাখির মতো

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি শস্য জন্মানোর অন্তরায় হয় না। আজ মানুষ গভীর নলকূপ এবং পাম্পের সাহায্যেও জমিতে সেচ দেয়। ফসল কাটার যন্ত্রের সাহায্যে একদিকে ফসল কাটছে অন্যদিকে মাড়াই হয়ে শস্য ও খড় আলাদা হয়ে যাচ্ছে। উন্নত দেশের লোকেরা কৃষিকার্যকে যান্ত্রিক করে ফেলেছে। শীতপ্রধান দেশে 'শীত নিয়ন্ত্রিত' ঘর বানিয়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের শাকসবজি এবং ফলমূল উৎপন্ন করছে।

বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে সৌদি আরব, কুয়েত, প্রভৃতি ঊষর মরুভূমি অঞ্চলে সেচ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে সোনার ফসল ফলাচ্ছে। বিজ্ঞান কৃষিকাজে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে কৃষিকাজে বিজ্ঞান

আমাদের দেশেও এখন কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। জমিকর্ষণে অবশ্য ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাচ্ছে না জমির খণ্ডবিখণ্ডতার কারণে। তবে সেচকার্যের জন্য মানুষ এখন আর বৃষ্টিধারার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। এখন সেচের জন্য ব্যবহার করা হয় গভীর নলকূপ এবং মেশিনচালিত পাম্প। বপনের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত ধরনের বীজ। বীজ সংরক্ষণে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে নেওয়া হয়। ক্ষেতে পোকা লাগলে তার দমনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে। শস্যের রোগবালাই দমনের জন্য এখন কৃষকরা শিখে নিচ্ছে টেকসই প্রযুক্তি ও নানারকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে এখন। বিজ্ঞানের সাহায্যে আগে যে-জমিতে এক ফসল হত, এখন সেখানে তিন ফসল হয়। ইরি, পাইজাম প্রভৃতি জাতের ধান বেশি উৎপাদনশীল। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের কৃষিকাজকে এখনও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করা হয়নি। বিজ্ঞানের অবদানকে ব্যাপকভাবে দেশের চাষাবাদের ক্ষেত্রে লাগাতে পারলে আমাদের খাদ্যসমস্যার সমাধান করা যাবে।

কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে এবং জীব-বৈচিত্র্যের বিপুল ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। অতিমাত্রায় গভীর নলকূপ স্থাপনেও পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। তাই বর্তমানে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবসার ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ধানের উৎপাদন

আমাদের দেশে যে-ধান উৎপন্ন হয় তা জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। তা ছাড়া প্রায় প্রতি বছর বন্যা ও খরার ফলে আমাদের দেশে কোনো বছরই ধানের উৎপাদন লক্ষমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয় না। এজন্য প্রতি বছর আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় প্রায় পঁচিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে চালের পরিবর্তে বিকল্প খাদ্য হিসেবে এখন গম ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তবে বাঙালির দীর্ঘদিনের ভাত খাওয়ার অভ্যাস ব্যাপকভাবে কোনোদিনই পরিবর্তিত হবে না।

উপসংহার

পৃথিবীর আদিমকাল থেকেই খাদ্যশস্য হিসেবে ধান থেকে উৎপাদিত চাল খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ *ঋগ্বেদে* 'ধান্য' কথাটির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় তখনও ধানের চাষ করা হত। ঋগ্বেদের রচনাকাল হল আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছরেরও আগে। পাঁচ হাজার বছরেরও আগে মিশরের ফারাওদের 'মমির' গায়ে চিত্রিত ছবিতেও দেখা যায় ধানগাছের ছবি। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে ধান ও চালের যে একটা সম্পর্ক আছে তা সহজেই বোঝা যায়। 📖

পাট : সোনালি আঁশ

সূচনা

পাটকে বলা হয় সোনালি আঁশ। কারণ বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল হল পাট। পাটের আঁশ যেমন দেখতে সোনালি চুলের মতো তেমনি এর মূল্যও সোনার মতো দামি। তাই পাটের অপর নাম স্বর্ণসূত্র।

পরিচয়

পাট এক রকমের তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। পাটগাছ পাঁচ থেকে দশ হাত লম্বা হয় এবং আধ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ মোটা হয়। পাটগাছ সোজা ও লম্বা হয়। এ গাছের কোনো ডালপালা থাকে না। মাথার আগায় থাকে একগুচ্ছ সবুজ পাতা। পাটগাছের রং সবুজ হলেও পাটের রং সাদা ও লালচে ধরনের হয়।

প্রকারভেদ

আমাদের দেশে সাধারণত দুপ্রকার পাট উৎপন্ন হয়। এক প্রকার পাটের পাতা ও গাছের আবরণ অত্যন্ত তেতো। কোনো কোনো পাটগাছের পাতা একটু মিস্ট ধরনের হয়। এ পাতা শাক হিসাবে খাওয়া হয়।

পাট চাষের সময়, পদ্ধতি, উৎপত্তি-স্থান

উষ্ণ জলবায়ু আর প্রচুর বৃষ্টিপাত পাটচাষের পক্ষে উপযোগী। যেসব জমি প্রতিবছর পানিতে ডুবে যায় এবং যেসব জমিতে প্রচুর পলিমাটি পড়ে সেসব দোআঁশলা মাটিতে পাট জন্মে প্রচুর। লাল রঙের বগী পাট উঁচু জমিতে ভালো জন্মে। বাংলাদেশের জলবায়ু পাটচাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

পাটের জমিতে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করলে জমির উর্বরাশক্তি বাড়ে। আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাটের জমি ভালো করে চাষ দিয়ে বীজ বুনতে হয়। সময়মতো বৃষ্টি না হলে পাট নষ্ট হয়ে যায়। পাটের চারা-গাছগুলো যখন বড় হতে থাকে তখন ঘনঘন নিড়ানি দিয়ে গাছের আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। ঘনঘন জন্মানো গাছ থেকে কিছু চারাগাছ তুলে নিলে ফলন ভাল হয়।

পাট তোলার সময় হল শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। এসময় পাট কেটে ছোট ছোট আঁটি করে বেঁধে রাখতে হয়। কুড়ি পঁচিশ দিন আঁটিগুলি পানিতে ডুবিয়ে রাখলে পাতাগুলো ঝরে যায় এবং পাটের বাকলাগুলো নরম ও আলগা হয়ে ওঠে। খড়ি থেকে ছুলে নিয়ে বাকলাগুলো পানিতে ভালো করে ধুয়ে শুকানোর পরই পাওয়া যায় পাট। পৃথিবীতে বাংলাদেশই হল সর্বাধিক পাট উৎপাদনকারী দেশ। সারা পৃথিবীর প্রায় সত্তর ভাগ পাট এদেশেই জন্মে। তা ছাড়া ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও মায়ানমার প্রভৃতি দেশেও পাট উৎপন্ন হয়।

প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাটের নানাবিধ প্রয়োজন রয়েছে। পাট থেকে কাপড়, কার্পেট, চট, থলে, বস্তা ও দড়ি প্রভৃতি তৈরি হয়। আমাদের দেশে পাট থেকে 'জুটন' নামে এক শ্রেণীর ভারী মূল্যবান কাপড় ও পাটখড়ি দিয়ে 'পারটেকস' তৈরি হচ্ছে। তা ছাড়া পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানের নানারকম কুটিরশিল্প সামগ্রী এখন প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। পাটখড়ি দিয়ে কাগজও তৈরি হয়। গ্রামে পাটখড়ি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং অনেক দরিদ্র চাষি পাটখড়ি দিয়ে বাড়ির বেড়া তৈরি করে থাকে। পাটগাছের কচি পাতা আমরা শাক হিসেবে খাই।

পাটকল-পরিস্থিতি

আমাদের দেশে এক সময় ছোট বড় প্রায় ৩০টির বেশি পাটকল ছিল। এক সময় আমাদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা আশি ভাগ আসত পাট রপ্তানি থেকে। তবে সে-যুগ এখন আর নেই। আমাদের দেশে যেসব পাটকল রয়েছে তাতে কয়েক লক্ষ লোক কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল ছিল আমাদের দেশের এক সময়কার গৌরব। কিন্তু অতিরিক্ত লোকসানের কারণে সরকার ২০০২ সালে এ পাটকল বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বেকার হয়ে পড়েছে প্রায় তিরিশ হাজার লোক।

বাংলাদেশে পাট-পরিস্থিতি

বর্তমানে বাংলাদেশে পাটের চাষ ও পাটের বাজারজাতকরণ এক চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ও অন্য পাটকলগুলোর অব্যবস্থার কারণে পাটচাষিরা পাট বিক্রির উন্মুক্ত বাজার আর পাচ্ছে না।

উপসংহার

আমাদের দেশে পাট চাষিরা যাতে পাটের ন্যায্যমূল্য পায় সেদিকে সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, পাটের বহুমুখী ব্যবহার বাড়াতে হবে। বিশ্বের বাজারে যেন আমাদের পাটের চাহিদা আরও বাড়ে সে জন্য বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে। 📖

চা

সূচনা

চা সুস্বাদু পানীয়। আজকাল আমাদের দেশে গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সব জায়গায় চায়ের প্রচলন খুব বেশি।

উৎপত্তিস্থান

চা-এর আদি উৎপত্তিস্থান চীন দেশ। চীনাদের কাছ থেকে চা-এর ব্যবহার সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানকালে ভারত ও শ্রীলংকার চা পৃথিবীবিখ্যাত। ভারতের দার্জিলিং-এ অত্যন্ত উন্নতমানের চা উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশের পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া ও ফটিকছড়ি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কিছু কিছু চা উৎপাদিত হয়। তা ছাড়া উত্তরবঙ্গেও চা উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে মোট ১৫৬টি চা-বাগান রয়েছে। বাংলাদেশের চা পাকিস্তান, আফিগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে বেশ জনপ্রিয়।

প্রকারভেদ

চা নানা জাতের হয়ে থাকে। যথা—পিকো, মাউকা, কম্পু ও কিনাংস। এর মধ্যে কিনাংস সবচেয়ে উন্নতমানের। তা ছাড়া গুঁড়া চা ও পাতা চা— দুরকমের চাপাতা রয়েছে। আমাদের দেশে সবুজ চায়ের কদর খুব বেশি।

চাষের নিয়ম

চায়ের চাষ খুব সহজ নয়। সাধারণত বৃষ্টিবহুল ঢালু পাহাড়ি অঞ্চলে চায়ের চাষ হয়। চা-এর চারাগাছগুলোকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ফাঁক ফাঁক করে লাগাতে হয়। চা-গাছ আট-দশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। তবে গাছগুলোকে অত বাড়তে দেওয়া হয় না। তিন-চার ফুটের একটু বেশি হলেই চা-গাছ ছেঁটে দিতে হয়। চা-গাছের গোড়া এবং আশপাশের জায়গা খুব পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। চা-বাগানে কিছুদূর পরপর 'ছায়াতরু' লাগানো হয়। চা-চাষের জন্য প্রচুর যত্ন নিতে হয়। চায়ের অপর নাম 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'। চায়ের কোমল সবুজ পাতাগুলো ছিঁড়ে নেওয়া হয়। তারপর সেগুলোকে নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে নানা ধরনের চা তৈরি করা হয়।

চা তৈরির নিয়ম

চা-তৈরি করতে হলে একটি পাত্রে পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হয়। ফুটন্ত পানিতে পরিমাণমতো চা-পাতা ঢেলে দিয়ে মিনিট পাঁচেক সিদ্ধ করে নামিয়ে নিতে হয়। তারপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে চায়ের কাপে চা ঢালতে হয়। চিনি ও দুধ যার যার রুচি অনুযায়ী পরিমাণমতো নিতে হয়। চীন ও পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা দুধ-চিনিমিশ্রিত চা খায় না বললেই চলে। তারা শুধু সুঘ্রাণযুক্ত লিকার খেতে পছন্দ করে। চীনারা ও জাপানিরা সুন্দর চা তৈরি করতে জানে। লেবুর রস মেশানো চা-কে লেমন চা বলে। তা ছাড়া অনেকে আদা, দারুচিনি ও লং মিশিয়ে চা খেতে ভালোবাসে।

উপকারিতা

চা বেশ উপকারী পানীয়। চা-পানে শরীরের অলসতা ও জড়তা দূর হয়, কাজ করতে ভালো লাগে। সর্দি, কাশি ও গলাব্যথায় চা খেলে আরাম পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অতিথি মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য এর চেয়ে সস্তা আর কিছুই নেই। আমরা চা রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি।

উপসংহার

দুঃখজনক হলেও সত্য যে দীর্ঘদিনের সংস্কারের অভাবে আমাদের দেশের অনেকগুলো চা-বাগানের উৎপাদন দিন দিন এতই কমে যাচ্ছে যে, অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন হয়তো একদিন আমাদের চা আমদানি করতে হবে। তবে আশার কথা যে দিন দিন চায়ের দাম বাড়ছে এবং এতে চা-উৎপাদনকারীরা লাভবান হচ্ছে। 📖

বাংলাদেশের নদী

বাংলাদেশের নদনদী

সূচনা

বাংলাদেশ হল নদীমাতৃক দেশ। এদেশে রয়েছে ছোটবড় প্রায় সাতশ নদী। সূক্ষ্ম তারের মতো এদেশকে আকীর্ণ করে রেখেছে অসংখ্য নদী। নদীর তীরে গড়ে উঠেছে বসতি, নদীর দুতীরে ফলছে সোনালি ফসল আর নানাবিধ শস্য। নদীগুলো যেন এদেশকে তাদের স্নেহধারা দিয়ে গড়ে তুলেছে। এজন্য এদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ।

প্রধান প্রধান নদী

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী হচ্ছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, গোমতী, মাতামুহুরী ও কর্ণফুলী প্রভৃতি।

পদ্মা

গঙ্গা নদীর যে প্রধান ধারাটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তার নাম পদ্মা। পদ্মানদী রাজশাহী জেলার দক্ষিণ সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পদ্মানদীর শাখানদীগুলো হচ্ছে গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, মধুমতী, কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভৃতি।

মেঘনা

মেঘনার জন্মস্থল ও উৎসধারা আসামের পাহাড়ে। সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলিত স্রোত আজমিরিগঞ্জের কাছে এসে কালনী নাম ধারণ করেছে এবং ময়মনসিংহ জেলার ভৈরববাজারের কাছে এসে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস ও চাঁদপুরের ডাকাতিয়া মেঘনার দুটি প্রধান শাখানদী। মেঘনা বর্ষায় অত্যন্ত প্রমত্ত রূপ ধারণ করে এবং এসময় এর দুতীরের ভাঙন ভয়াবহ রূপ নেয়।

যমুনা

যমুনার আদি উৎস হিমালয়। তিব্বতের সাঙ্পু নদী আসামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করেছে। ব্রহ্মপুত্রের এ-ধারা বাংলাদেশের রংপুর জেলার রংপুরের নিকট প্রবেশ করে যমুনা নাম ধারণ করেছে। যমুনা নদী গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মানদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র একসময় ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। এ ব্রহ্মপুত্র পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। যমুনা নদীর প্রধান শাখানদীগুলো হল তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতি।

কর্ণফুলী

ভারতের লুসাই পাহাড়ে জন্ম হয়েছে কর্ণফুলী নদীর। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী বঙ্গোপসাগরে এসে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলীর মোহনা অত্যন্ত গভীর। এজন্য এখানে ভিড়তে পারে দেশ-বিদেশের বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলীর মোহনা থেকে দশ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। কর্ণফুলী অত্যন্ত বেগবতী নদী। এজন্য কর্ণফুলীর উজানে বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। কর্ণফুলীর ওপর বাঁধ দেওয়ার ফলে যে কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। কর্ণফুলীর তীরে গড়ে উঠেছে রাঙামাটি ও কাপ্তাই শহর, তৈরি হয়েছে কর্ণফুলী কাগজ ও রেশম শিল্প কারখানা।

অন্যান্য প্রধান নদী

রাজশাহীর মহানন্দা, বরিশালের কীর্তনখোলা, মৌলভীবাজারের মনু, ঢাকার বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী।

আমাদের জীবনযাত্রায় নদ–নদীর প্রভাব

আমাদের দেশ নদীপ্রধান দেশ। নদীর সঙ্গে আমাদের জীবনধারা ওতপ্রোতভাবে বাঁধা। বাংলাদেশের অনেকগুলো জেলায় যাতায়াতের প্রধান ও একমাত্র উপায় হল নদীপথ। তা ছাড়া নদীতে মাছ ধরে এদেশের বহু মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের কাব্যসাহিত্যেও রয়েছে নদীর প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীমউদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা ও আল–

মাহমুদের কবিতায় আমাদের নদীর সৌন্দর্য চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মনের *তিতাস একটি নদীর নাম*, হুমায়ূন কবিরের *নদী ও নারী*, কাজী আবদুল ওদুদের *নদীবক্ষে* ও আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী* উপন্যাসে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

উপসংহার

এদেশের নদী একদিকে আমাদের যেমন করে তুলেছে সাহসী ও দুর্জয়, তেমনি অন্যদিকে করে তুলেছে স্নেহশীল। বাংলাদেশের অনেক নদী আমাদের দুঃখেরও কারণ ঘটায়। তার পরও এদেশের নদনদী তাই যেন আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ও অর্থনীতির সম্মিলিত জীবনপ্রবাহের উৎস। 🕮

চাঁদে অভিযান

[সংকেত]

সূচনা— চাঁদ একসময় ছিল কল্পনার বস্তু, সৌন্দর্য ও নানা গল্পগাথার স্বপ্নপুরী। অজানাকে জানা— অজানাকে জানার প্রেরণা থেকে চাঁদে অভিযান। প্রথম অভিযাত্রী— নীল আর্মস্ট্রং ও তাঁর সাথি। চাঁদের মাটিতে অবতরণ— কী দেখলেন তাঁরা, তাঁদের অনুভূতি। স্মরণীয় দিন— মানবসভ্যতার ইতিহাস নতুন অধ্যায়। উপসংহার— মানুষের এ অভিযাত্রা থেমে থাকেনি। 🕮

কম্পিউটার

[সংকেত]

ভূমিকা— বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কম্পিউটার— উদ্ভাবন— ১৮০৩ সালে ব্রিটিশ গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজ। নতুন সংস্করণ নতুন নতুন সুবিধা। কম্পিউটারের কার্যপদ্ধতি— বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কাজ— কম্পিউটার জগৎ— সমস্যা। উপসংহার— সঠিক ও সময়োপযোগী ব্যবহার প্রয়োজন। 🕮

দ্বিতীয় ভাগ: বিরচন

বাগ্‌ধারা

প্রতিটি ভাষায় এমন কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ থাকে, যার সাধারণ অর্থের বাইরে অন্য অর্থ থাকে। এসব শব্দ বা পদ বাক্যে বিশেষ তাৎপর্যময় অর্থ প্রকাশ করে। এ পদগুলোকে বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি বলে। বাক্যে এ ধরনের পদ ব্যবহারে বক্তার বক্তব্য স্পষ্ট ও ব্যঞ্জনাদীপ্ত হয়। আসলে ভাষা-ব্যবহারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বাগ্‌ধারা তৈরি হয়। এর নেপথ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিক নানা ঘটনা বা প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে থাকে। বাগ্‌ধারা ভাষার একটি গৌরবময় ঐতিহ্য। যে-জাতির ভাষা যত প্রাচীন তার ভাষায় বাগ্‌ধারার ব্যবহার তত বেশি। বাঙালি জাতির প্রায় হাজার বছরের ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য রয়েছে। অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য অজস্র বাগ্‌ধারা রয়েছে। বাগ্‌ধারা ভাষাকে শক্তিশালী, ব্যঞ্জনাময় ও তাৎপর্যময় করে তোলে। বাংলা ভাষাতেও বহু বাগ্‌ধারা আছে। এখানে কতকগুলো উদাহরণ দেওয়া গেল :

অ

অর্ধচন্দ্র দান (গলাধাক্কা দেওয়া)— চোরটার মায়াকান্নায় কর্ণপাত কোরো না; বেশ করে অর্ধচন্দ্র দান করে বিদায় কর।

অগ্নিপরীক্ষা (চরম পরীক্ষা)— বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে চরম অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে জয়লাভ করেছে।

অকূলে কূল পাওয়া (নিরুপায় অবস্থা হতে উদ্ধার পাওয়া)— এই ঘোরতর দুর্দিনে তোমার সাহায্য পেয়ে যেন অকূলে কূল পেলাম।

অকূল পাথার (মহাবিপদ)— অকূল পাথারে খোদা তুমিই আমার ভরসা।

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (অসম্ভব কার্যসম্পাদন করা)— কাজটা খুবই কঠিন, কিন্তু এখন বন্ধুর অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হচ্ছে।

অন্ধকার দেখা (বিপদে পড়ে ভয় ও ভাবনায় আকুল হওয়া) — পিতৃমাতৃহীন আকবর দেনার দায়ে দুচোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

অক্ষরে অক্ষরে (সম্পূর্ণভাবে)— তার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলবে, আমরা জানতাম।

অ আ ক খ — (প্রাথমিক জ্ঞান) দর্শন বিষয়ে তার অ আ ক খ জ্ঞান নেই।

অয় বট (প্রাচীন ব্যক্তি)— আব্দুল করিম বেঁচে আছে অয় বট হয়ে।

আগড়ম বাগড়ম (অর্থহীন কথা)— আগড়ম বাগড়ম না করে আসল কথা বল।

অতি চালাকের গলায় দড়ি (বেশি চালাকির পরিণাম) — অতি চালাকের অনেক সময় গলায় দড়ি পড়ে।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট (অতিরিক্ত লোভ করলে সব হারাতে হয়) — বেশি লোভ করতে নেই, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হয়।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা (পরিস্থিতি বিবেচনায় কার্যক্রম গ্রহণ)— আগেভাগে কিছু ভাবতে পারছি না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেব।

অকাট মূর্খ (জড়বুদ্ধিসম্পন্ন) — তার মতো অকাট মূর্খের দ্বারা এসব কাজ দশ বছর পরও হবে না।

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) — প্রায় বছরখানেক ভুগে কাল রাতে রহিম সাহেব অক্কা পেয়েছেন।

অকালকুষ্মাণ্ড (অকর্মণ্য) — ছেলেটি বড়ই অকালকুষ্মাণ্ড, ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন) — বৃদ্ধা জননীর অন্ধের যষ্টির মতো পুত্রটি অকালে প্রাণ হারাল।

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) — তার নিকট এ বিষয়ে তোষামোদ করা আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা।

অগস্ত্য যাত্রা (শেষ প্রস্থান)— শ্বশুরের সাথে ঝগড়া করে জামাতা একেবারে অগস্ত্য যাত্রা করল।

অহি-নকুল সম্বন্ধ (চিরশত্রু)- চাচা-ভাইপোর মধ্যে একেবারে অহি-নকুল সম্বন্ধ; সামান্য ব্যাপার নিয়ে কতবার যে লড়াই হয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী (অল্পবিদ্যার গর্ব)— অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী বলেই অর্বাচীন জব্বার মিয়া বাংলাদেশের সেরা বৈজ্ঞানিক ড. কুদরাত-ই-খুদার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমালোচনায় অগ্রসর হল।

অগাধ জলের মাছ (অত্যন্ত কৌশলী)- কথাবার্তা সাদাসিধে হলেও লোকটি অগাধ জলের মাছ; ওর প্রকৃত পরিচয় পেতে একটু দেরি হবে।

অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয়) — কী ভাই সাবের। তুমি যে একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠলে; কতদিন তোমাকে দেখি না।

আ

আমড়াগাছি করা (তোষামোদ করা) — চতুর ব্যক্তিরা নির্বোধ ধনী লোককে আমড়াগাছি করে নিজেদের কাজ হাসিল করে।
আসরে নামা (কাজে অবতীর্ণ হওয়া) — আসরে যখন নামতেই হবে তখন ঘোমটা দিলে কি চলে?
আঁকুপাঁকু করা (ছটফট করা) — তার মতো এমন অহেতুক আঁকুপাঁকু করতে দেখে কার না গা জ্বলে!
আকাশ থেকে পড়া (অপ্রত্যাশিত) — হঠাৎ লটারির চল্লিশ লক্ষ টাকা পেয়ে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল।
আক্কেল সেলামী (ভুলের মাসুল) — বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ করতে গিয়ে তিনশ টাকা অক্কেল সেলামী দিতে হল হাবিবকে।
আগুন নিয়ে খেলা (ভয়ংকর বিপদ) — শ্রমিকদের নিয়ে দলবাজি করা আগুন নিয়ে খেলার সমান।
আগুনে ঘি ঢালা (রাগ বাড়ানো) — তার ঘোর বিপদের সময় দেনার টাকা চেয়ে আগুনে ঘি ঢালল রহিম।
আটকপালে (হতভাগা) — আটকপালে জব্বারের জীবনে সুখ আসবে কী করে?
আঠারো আনা (বেশি সম্ভাবনা) — এবার পরীক্ষায় তার পাস করার সম্ভাবনা আঠারো আনা।
আমতা আমতা করা (অস্পষ্টভাবে উত্তর দেওয়া) — আমতা আমতা না করে সোজাসাপটা বলে ফেল, কী বলতে চাও?
আপন কোলে ঝোলটানা (নিজের স্বার্থ দেখা) — আহমদের মতো লোভী লোক আপন কোলে ঝোল টানবে, সেটাই স্বাভাবিক।
আকাশ-কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) — বসে বসে আকাশ-কুসুম ভেবো না, কাজ কর।
আকাশ-পাতাল (ব্যবধানে বিশালতা) — কার সঙ্গে কার তুলনা করছ ভাই, উভয়ের মধ্যে তো আকাশ-পাতাল তফাত।
আক্কেল গুড়ুম (বুদ্ধি লোপ) — কালকের ছেলে মতি, সে তোমার টাকা কেড়ে নিল, শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।
আঙুল ফুলে কলা গাছ (হঠাৎ ধনী হওয়া) — আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে বলেই ধরাকে সরা জ্ঞান করতে নেই।
আদায় কাঁচকলায় (ঘোর শত্রুতা) — খালিদ ও রফিকের মধ্যে মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত নেই, উভয়ের সম্পর্কটা একেবারে আদায় কাঁচকলায়।
আঁধার ঘরের মানিক (প্রিয়বস্তু) — একমাত্র পুত্রটি ছিল বিধবা মাতার আঁধার ঘরের মানিক, সে-ও চিরদিনের জন্য বিদায় নিল।
আদার বেপারী (সামান্য বিষয়ে ব্যস্ত ব্যক্তি) — কীহে, তুমি আদার বেপারী হয়ে জাহাজের খবর নিতে চাও? লাভ কিছুই হবে না।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) — রহিম ভাই অযোগ্য, তার মতো আমড়া কাঠের ঢেঁকি দিয়ে কাজ হবে না।
আসমান-জমিন ফারাক (অনেক প্রভেদ) — বাবুল ও কামালের পরীক্ষার ফল আসমান-জমিন ফারাক।
আষাঢ়ে গল্প (গাঁজাখুরে) — বন্যায় বিলে ইলিশ মাছ পাওয়া গেছে এ যেন এক আষাঢ়ে গল্প।
আহ্লাদে আটখানা (অত্যন্ত খুশি) — প্রাইজবন্ডে দশ হাজার টাকা পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়েছ দেখছি!
আসর গরম করা (সভাজনদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি) — যাকে বলে আসর গরম করা বক্তৃতা, তাই দিয়ে সভাপতি সাহেব সকলকে মাতিয়ে তুললেন।
আসলে মুষল নেই, ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া (ঠিকমত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব) — নিজের সংসারে নজর নেই, উনি গেছেন বন্ধুর সংসার আগলাতে। এ যেন আসলে মুষল নেই, ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া।
আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা করা) — এসব বলে অর্ণবকে আকাশে তুলো না, তা হলে লেখাপড়া ভেস্তে যাবে।
আদা-জল খেয়ে লাগা (কোমর বেঁধে লাগা) — ব্রতী গতবার পরীক্ষায় ভালো করেনি তাই এবার আদা-জল খেয়ে পড়তে লেগেছে।
আতে ঘা (মনে ব্যথা দেওয়া) — দিপু তোমার আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলেছে, তুমি ভীরু বলে এখনও চুপ করে রয়েছ।
আগুন লাগা সংসার (নষ্ট হচ্ছে এমন সংসার) — তোমার এই আগুন-লাগা সংসারে উন্নতি হবে কী করে বল তো।
আপন পায়ে কুড়োল মারা (নিজের অনিষ্ট করা) — কুসংসর্গে মিশে তুমি নিজেই নিজের পায়ে কুড়োল মারছ।

আলালের ঘরের দুলাল (ধনীর সযত্নে লালিত সন্তান) — তুমি হচ্ছ আলালের ঘরের দুলাল, এত কষ্ট করে হোটেলে থাকতে পারবে না।

আড়িপাতা (লুকিয়ে শোনা) — আজকাল টেলিফোনে আড়ি পেতে গোপন তথ্য জানার আইন হচ্ছে।

আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা) — তুমি একটি কুঁড়ের বাদশাহ, আঠারো মাসে তোমার বছর, তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

ই

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) — শহরে অনেক ছেলে খারাপ সঙ্গলাভে ইঁচড়ে পেকে যায়, তাদের সঙ্গে চলতে নেই।

ইলশে গুঁড়ি (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি) — সারাদিন ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি, কোথাও বের হতে পারছি না, অসহ্য।

ইলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) — ছেলের বিয়েতে মিয়া সাহেব ইলাহি কাণ্ড করলেন।

ইঁদুরকপালে (মন্দভাগ্য) — ওরে নাফিজ, তুই ইঁদুরকপালে। একের পর এক তোর সবাই মরে গেল।

ঈ

ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) — বিদেশ থেকে ছেলে ফিরে এলে বাবা-মা যেন ঈদের চাঁদ ফিরে পেলেন।

উ

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (অযোগ্য স্থানে মূল্যবান দ্রব্য রাখা) — তোমার মতো নির্বোধকে উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ানো এক কথা।

উজানের কৈ (সহজলভ্য) — পরীক্ষায় পাশ করাকে উজানের কৈ যারা ভাববে তারা নির্ঘাত ফেল করবে।

উঠতি বয়স (যৌবনের প্রথমদিক) — উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা হঠাৎ কুপথে যেতে পারে।

উঠতে-বসতে (যখন-তখন) — শাশুড়ি বউকে উঠতে-বসতে খোঁটা দেয়।

উঠবস করানো (অপরের ওপর কর্তৃত্ব দেখানো) — বউ স্বামীর শাসন মানে না, উল্টো স্বামীকে উঠবস করায়।

উঠেপড়ে লাগা (দৃঢ়সংকল্প) — এবার পরীক্ষায় পাস করার জন্য আজাদ উঠেপড়ে লেগেছে।

উড়ু উড়ু করা (অস্থির স্বভাব) — উড়ু উড়ু করলে পড়াশোনা হবে কী করে?

উড়ো কথা (গুজব) — উড়ো কথায় কান দেওয়া বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়।

উত্তম মধ্যম দেওয়া (প্রহার করা) — চোরকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদায় দেওয়া হল।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (একের দোষ অপরের ওপর চাপানো) — চুরি করল স্বপন, আর শাস্তি পেল রতন, একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) — উড়নচণ্ডী হয়ে আর কতদিন বাপের হোটেলে কাটাবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।

উভয়সংকট (দুই দিকেই বিপদ) — অফিসার সাহেবের কথা রক্ষা করলে সত্যের খেলাপ হয় আর না করলে চাকরি রাখা কঠিন—আমার হয়েছে উভয়সংকট।

উড়ো চিঠি (ভিত্তিহীন পত্র বা সংবাদ) — আরে বাপু এত ভয় পাচ্ছ কেন, এতো উড়ো চিঠি, নাম নেই, ঠিকানা নেই।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অযাচিতভাবে এসে সর্বেসর্বা হওয়া) — জীবনে যাকে দেখিনি সেই মেজো জা উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন সংসারে।

উনিশ-বিশ (সামান্য পার্থক্য)– উনিশ-বিশ যা হোক দু-দলই ভালো খেলেছে।

ঊ

ঊনপাঁজুরে (মন্দভাগ্য) – ঊনপাঁজুরে মেয়ের কোনো আশা নেই।

এ

এক গোয়ালের গরু (এক শ্রেণীভুক্ত) — শামীম, বরকত, এক গোয়ালের গরু, সন্ধ্যার পর এক জায়গাতে পাওয়া যাবে।

এক বনে দুই বাঘ (প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী) — এক বাড়িতে দুদলের নেতা, প্রতিদিন বিবাদ, এ যেন এক বনে দুই বাঘ।

একাই একশ (অসাধারণ কুশলী) — সোহেল একাই একশ, আর কাউকে এ-কাজের জন্য লাগবে না।

এলাহি কাণ্ড (রাজকীয় বা খুব বড় রকমের) — আরে মজিদ, তোমাদের বাড়িতে এত হইচই কিসের? সব দেখছি এলাহি কাণ্ড।

এলোপাথাড়ি (বিশৃঙ্খলা) — গৃহস্বামীর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণে ডাকাতদল পলায়ন করল।

এক হাত লওয়া (প্রতিশোধ) — বড় সাহেবের পিছনে আর লাগবে? কেমন সে এক হাত নিয়েছে।

একচোখা (পক্ষপাত) — সেলিম চৌধুরীর মতো এমন একচোখা মানুষ আমি আর দেখিনি।

এক ঢিলে দুই পাখি মারা (এক প্রচেষ্টায় উভয় উদ্দেশ্য সাধন করা) — চল, মেলাও দেখব, সওদাও করব— এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে।

একক্ষুরে মাথা মুড়ানো (একই অবস্থা বা স্বভাববিশিষ্ট) — যেমন বড় ভাই তেমনি ছোট ভাই, উভয়েই একক্ষুরে মাথা মুড়ানো; টাকার জন্য এরা করতে পারে না এমন কাজ জগতে নেই।

এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ এক বারই আসে না) — আমার টাকা কয়টা নিয়ে দেখা নেই; আচ্ছা দেখা যাবে এক মাঘে শীত যায় কি না!

ঔ

ঔষধ পড়া (প্রভাবে পড়া) —এবার বাবাই ওর পড়াশোনার খবর নিচ্ছেন, ঠিক জায়গা থেকে ঔষধ না পড়লে ওর পড়াশোনা হত না।

ঔষধ ধরা (কাঙ্ক্ষিত ফললাভ) —বড় বাবুর তিরস্কারে বাবুল পড়াশোনায় মন দিয়েছে। ঔষধে ধরেছে নিশ্চয়।

ক

কেউকেটা (তুচ্ছ, যেমন-তেমন —এখানে 'সর্বেসর্বা' অর্থে ব্যবহৃত) — স্থানীয় এমপি সাহেব একজন কেউকেটা লোক, তাকে ধরলে স্কুলের কাজটা হতে পারে।

কান ভারী করা (কুপরামর্শ দান) — কুপরামর্শ দিয়ে ওর কান ভারী করার কোনো মানে হয় না।

কান খাড়া করা (সতর্ক হওয়া) — ঝোপের ধারে বাঘের গর্জন শুনে শিকারী কান খাড়া করল।

কথার কথা (প্রসঙ্গাত যা বলা হয়) — আমি যা বললাম তা কেবল কথার কথা, আসলে কী ঘটে, বলা যায় না।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অসম্ভব বস্তু) — তোমার সেদিনকার আষাঢ়ে গল্পটা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতোই আমাদের কাছে উপভোগ্য হয়েছিল।

কুল কাঠের আগুন (তীব্র জ্বালা) — পুত্রশোকাতুর পিতা একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে অন্তরে কুল কাঠের আগুন অনুভব করছে।

কুনোব্যাঙ (সীমিত জ্ঞান) — কুসংস্কারে বশীভূত হলে মানুষমাত্রই কুনো ব্যাঙ হয়ে পড়ে, স্বাধীন চিন্তাশক্তি লোপ পায়।

কুপোকাত (পরাজিত) — মোহাম্মদ আলির কাছে লিস্টন মুষ্টিযুদ্ধে একেবারে কুপোকাত হয়ে গেল।

কচ্ছপের কামড় (সহজে যা ছাড়ে না) — জুয়ার নেশা কচ্ছপের কামড়ের মতো, একবার ধরলে কখনই ছাড়তে পারবে না।

কম্বলের লোম বাছা (অকাজ করা) — কম্বলের লোম বেছে লাভ নেই, সত্যিকার অর্থে কিছু কর।

কর্তার ইচ্ছাই কর্ম (প্রভুর নির্দেশে কাজ) — আমি তো বড় সাহেবের সহকারী। আমি কী করব, তিনি যা বলবেন তাই হবে, কর্তার ইচ্ছাই কর্ম।

কলমের খোঁচা (অসৎভাবে সাধিত আদেশ) — বড় সাহেবের এক কলমের খোঁচায় কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেল।

কাকজোছনা (ক্ষীণ চন্দ্রালোক) — কাকজোছনায় বাঁশ বাগানের ভিতর দিয়ে যেতে আমার ভয় হয়।

কাকতালীয় (আকস্মিক যোগাযোগ) — বাবা বাড়ি এলেন আর আমার অসুখ ভালো হয়ে গেল, কাকতালীয় ব্যাপার মনে হল।

কাগজে কলমে (লিখিতভাবে) — তোমার অভিযোগ কাগজে কলমে দেখাও, মুখের কথায় বিশ্বাস নেই।

কাজের কথা (প্রয়োজনীয়) — কাজের কথা থাকলে বল, বাজে কথা শোনার সময় নেই।

কাজের কাজি (কর্মদক্ষ) — লোকটা ঠিকই কাজের কাজি। এত বড় কাজ কেমন সুষ্ঠুভাবে শেষ করল।

কাঞ্চনমূল্য (অগ্নিমূল্য) — লোকটি আলু গুদামজাত করে বসে আছে কাঞ্চন মূল্য পাবার আশায়।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা (যন্ত্রণায় নতুন মাত্রা যোগ করা) — পুরনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার দরকার নেই।

কাঠখড় (আয়োজন) — মেয়ের বিয়ে দিতে অনেক কাঠখড় দরকার।

কানকাটা (নির্লজ্জ) — তার মতো কানকাটা লোককে দিয়ে বৈধ-অবৈধ সবই সম্ভব।

কানপাতলা (নির্বিচারে অন্যের লাগানো কথায় বিশ্বাস করে এমন লোক) — এমন কানপাতলা লোকের কাছে তোমার গোপন কথা বলা ঠিক হয়নি।

কানামাছি খেলা (শিশুদের খেলা) — কানামাছি খেললে জীবন চলবে না, বাস্তববাদী হতে হবে।

কানে আঙুল দেওয়া (না শোনার চেষ্টা করা) — রিক্সাওয়ালার অশ্লীল কথা শুনে সবাই কানে আঙুল দিল।

কানে মন্ত্র দেওয়া (কুপরামর্শ দান) — বাজে লোকের কানমন্ত্র শুনে নিজের ক্ষতি করা ঠিক নয়।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ (বিপজ্জনক পরিণতি) — কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুতে পারে, আর ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না বাপু।

কোমর বাঁধা (দৃঢ়সংকল্প) — বর্গীরা সব এল, কোমর বেঁধে আয়।

কাকস্নান (সংক্ষিপ্ত গোছল) — দুমিনিটে স্নান শেষ, এ তো দেখছি কাকস্নান।

কচু বনে কালাচাঁদ (অপদার্থ) — পড়াশুনার নাম নেই, পোশাকের কী ঘটা! এমন কচু বনের কালাচাঁদ আর দেখিনি।

কথায় চিড়ে ভেজে না (ফাঁকা আওয়াজে কাজ হয় না) — লোকের উপকার করতে গেলে শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না, কাজ দেখানো চাই।

কলুর বলদ (নির্বিকারে পরিশ্রম করা) — সে না বুঝেসুঝে কেবল কলুর বলদের মতো খেটে মরে।

কল্কে পাওয়া (পাত্তা পাওয়া) — কেমন ভাই নতুন জামাই, বিয়ে করতে যাবার সময় আমাদের নিয়ে যাবে, এখন দেখছি, তোমার কল্কে পাওয়াই ভার হল।

ক অক্ষর গোমাংস (বর্ণপরিচয়হীন মূর্খ) — আরে বলছ কী, ব্যারিস্টার সাহেবের ছেলে হয়ে কিনা ক অক্ষর গোমাংস!

কপাল কাটা (অদৃষ্ট মন্দ হওয়া) — বিধবার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তার কপাল কেটেছে।

কুঁড়ের বাদশা (ভয়ানক কুঁড়ে) — তুমি দেখছি একটা কুঁড়ের বাদশা, খেয়েদেয়ে আয়েসে সময় কাটালে সংসার চলবে কী করে?

কংস মামা (নির্মম আত্মীয়) — কংস মামার হাত থেকে উদ্ধার না পেলে আর বাঁচা নেই, জীবন যায়-যায়।

কড়ায় গণ্ডায় (পুরোপুরি) — আপনার পাওনা আমি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেব; চিন্তা করবেন না।

কাকভূষণ্ডী (দীর্ঘজীবী ব্যক্তি) — কবি কায়কোবাদ প্রায় একশ বছর বেঁচে কাকভূষণ্ডী হতে চেয়েছিলেন।

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা (অল্প বয়সে বিগড়ানো) — শিশুকাল থেকে ছেলেদের দিকে নজর না রাখলে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরবে।

কাঁচা পয়সা (নগদ প্রচুর উপার্জন) — ভালো ডাক্তার হতে পারলে কাঁচা পয়সার অভাব নেই।

কেতাদুরস্ত (পরিপাটি) — ওহে বাবু শুধু কেতাদুরস্ত হলেই চলবে না, কিছু বিদ্যাও থাকতে হবে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (শত্রু দ্বারা শত্রু নাশ) — শত্রুকে দিয়ে শত্রু জব্দ করেছে সে। তার জানা আছে কী করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।

খ

খাতির জমা (নিরুদ্বিগ্ন) — পেনশনের পুরো টাকা পেয়ে রহিম সাহেব নিশ্চিন্ত। এখন তার খাতির জমা হয়ে বসার সময়।

খিচুড়ি পাকানো (জটিল করা) — দেখ বাপু, কী বলবে সোজাসাপটা বলে ফেল, খিচুড়ি পাকিও না।

খয়ের খাঁ (ধামাধরা) — মীরজাফর ইংরেজদের খয়ের খাঁ হওয়ায় দেশবাসীর কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছেন।

খাল কেটে কুমির আনা (বিপদ ডেকে আনা) — ওর মতো বদমায়েশ লোককে স্থান দিয়ে আমি যেন খাল কেটে কুমির এনেছি, ওর জন্যই আমাকে বিপদে পড়তে হল।

গ

গোল্লায় যাওয়া (নষ্ট হওয়া) — ক্যাপ্টেন সাহেবের অমন তুখোড় ছেলে গোল্লায় গিয়েছে, সে চুপে চুপে নেশা করে।

গভীর পানির মাছ (ধূর্ত) — রহমত আলী তো গভীর পানির মাছ, তার মর্ম বোঝা মুশকিল।

গদাই লস্করী চাল (আলসেমি) — ওহে, তাড়াতাড়ি হাত চালাও, অমন গদাই লস্করী চালে কাজ করলে সব পণ্ড হবে।

গোকুলের ষাঁড় (বেকার, ভবঘুরে) — চৌধুরী সাহেবের মেজো ছেলেটি লেখাপড়াও শেখেনি, অপর কোনো কাজকর্মও করে না, গোকুলের ষাঁড় হয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়।
গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা) — গৌরচন্দ্রিকা না করে আসল কথা বল বাপু।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন) — তোমার চাকরি হলে তবে তুমি খাওয়াবে, আমাদের সেই আশায় বসে থাকতে হবে! এ যে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের ব্যাপার!
গোড়ায় গলদ (শুরুতেই ভুল) — ওহে তোমার দিন তো খারাপ, তা নইলে কি গোড়ায় গলদ হয়?
গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধভাবে অনুসরণ) — গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে বেড়ালে জীবনে কিছুই করতে পারবে না।
গরিবের ঘোড়া রোগ (অবস্থার অতিরিক্ত চাওয়া) — গরিবের ঘোড়া রোগ ভালো নয়।
গরু খোঁজা করা (তন্নতন্ন করে খোঁজা) — তোমাকে গতকাল বাজারে গরু খোঁজা করে খুঁজেছি।
গা-ঢাকা (আত্মগোপন) — সন্ত্রাসীরা গা-ঢাকা দিয়েছে।
গা তোলা (নড়েচড়ে ওঠা) — সারাদিন আড্ডা দিয়ে সাব্বিরেরা এবার গা তুলল।
গায়ের ঝাল ঝাড়া (শোধ লওয়া) — আর কিছু পারে বা না পারে, কুকথায় পঞ্চমুখ হয়ে সে গায়ের ঝাল ঝাড়তে পারবে।
গায়ে পড়া (অযাচিত) — তোমার গায়ে পড়া কথায় কী আসে যায়, আমরা মোটেই তাতে কোনো গুরুত্ব দিই না।
গুড়ে বালি (আশায় নিরাশ হওয়া) — তুমি কি মনে করেছ যে, আমার কাছে টাকা ধার পাবে, সে গুড়ে বালি।

অনুশীলনমূলক কাজ

---

১. **নিচের বাগ্‌ধারাগুলো দিয়ে বাক্য রচনা কর :**
অকূল পাথার, অমাবস্যার চাঁদ, আক্কেল গুড়ুম, আক্কেল সেলামি, আষাঢ়ে গল্প, আঁদুর পেঁদুর, উড়নচণ্ডী, ঊনপাঁজুরে, কড়ায়গণ্ডায়, কেতাদুরস্ত, চোখের মণি, ছ-কড়া ন-কড়া, টইটম্বুর, টনক নড়া, দহরম মহরম, শাপে বর, সাত-সতেরো, হাতে-নাতে।

২. **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

ক. 'হাড়হদ্দ' কথাটির বিশিষ্ট অর্থ হল—
১. হাড় ও মাংস
২. ভালোমন্দ
৩. নাড়িনক্ষত্র
৪. স্বাস্থ্যবিধি

খ. 'দুধের মাছি' কথাটির বিশিষ্ট অর্থ হল—
১. দুধে পড়া মাছি
২. সুসময়ের বন্ধু
৩. বিশৃঙ্খল অবস্থা
৪. দুঃসময়ের সহচর

গ. 'গলগ্রহ' কথাটির বিশেষ অর্থ হল—
১. গলা কাটা
২. নিজের বোঝা নিজে বহন
৩. পরের বোঝা হয়ে থাকা
৪. অন্যের মঙ্গলচিন্তা

বাক্য-সংকোচন

একটি বাক্যাংশ বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কিংবা পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক পদ বাক্য বা শব্দকে একটি শব্দে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বাক্য-সংকোচন বা বাক্যসংক্ষেপ বলে। অর্থাৎ কোনো বাক্য বা বাক্যাংশকে একটি যৌগিক বাক্যে পরিণত করাকে বাক্য-সংকোচন বলে। বাক্য-সংকোচন অল্প কথায় বাক্যকে গতিশীল ও শ্রুতিমধুর করে। এতে মূল অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না।

বাক্য-সংকোচনের কতিপয় উদাহরণ :

অ

অকালে পেকেছে যে	অকালপক্ব।
অহংকার করে যে	অহংকারী।
অন্যদিকে মন যার	অন্যমনা।
অবশ্যই ঘটবে যা	অবশ্যম্ভাবী।
অক্ষির সম্মুখে	প্রত্যক্ষ, সম্মুখে।
অক্ষির অগোচরে	পরোক্ষ।
অভিজ্ঞতার অভাব যার	অনভিজ্ঞ।
অবসরের অভাব	অনবসর।
অরিকে দমন করে যে	অরিন্দম।
অনেকের মধ্যে এক	অন্যতম।
অন্য ভাষায় পরিবর্তিত	অনূদিত।
অঘটন ঘটাতে নিপুণ যে	অঘটনঘটনপটীয়সী।
অকালে জাত কুমড়া	অকালকুষ্মাণ্ড।
অনুকরণ করবার ইচ্ছা	অনুচিকীর্ষা।
অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক	অনুসন্ধিৎসু।
অপকার করতে ইচ্ছা করে যে	অপচিকীর্ষু।
অলংকারের ঝঙ্কার	শিঞ্জিত।
অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে কাজ করে যে	অবিমৃষ্যকারী।
অস্ত যাচ্ছে যা	অস্তায়মান।
অশ্বের ডাক	হ্রেষা।
অকালে যে বোধন	অকালবোধন।
অন্য গাছের উপর যে গাছ জন্মে	পরগাছা।
অন্য উপায় নেই	অগত্যা।
অসম সাহস যার	অসমসাহসী।
অন্তিমকাল উপস্থিত যার	মুমূর্ষু।
অতি দীর্ঘ নয় যা	নাতিদীর্ঘ ।
অনেক দেখেছেন যিনি	বহুদর্শী।
অনায়াসে করা যায় যা	আয়াসসাধ্য।
অভিনয় করে যে	অভিনেতা।
অল্প কথা বলে যে	অল্পভাষী।

আ

আগে বর্তমান যে	অগ্রবর্তী।
আগে জন্মেছে যে	অগ্রজ।
আগে গমন করে যে	অগ্রগামী।
আসমানের মতো রং	আসমানি।
আল্লাহকে বিশ্বাস করে না যে	নাস্তিক।
আল্লাহকে বিশ্বাস করে যে	আস্তিক।
আঘাত পায়নি যে	অনাহত।
আচারের নিষ্ঠা আছে যার	আচারনিষ্ঠ।
আদরের সঙ্গে	সাদরে।
আট মাস মাতৃগর্ভে থেকে জন্মে যে	আটশে।
আত্মা বা নিজ সম্পর্কে সম্পর্কিত	আত্মীয়।
আটপ্রহর যা পরা যায়	আটপৌরে।
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত।
আপনাকে ভুলে থাকে যে	আত্মভোলা, আপনভোলা।
আপনার রং (বর্ণ) লুকায় যে	বর্ণচোরা।
আঠাযুক্ত যা	আঠালো।
আরাধনার যোগ্য	আরাধ্য।
আকাশে চরে যে	আকাশচারী, খেচর।

ই

ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	ইন্দ্রজিৎ।
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে	জিতেন্দ্রিয়।
ইতিহাস লেখেন বা জানেন যিনি	ঐতিহাসিক।
ইহার তুল্য	ঈদৃশ।
ইহলোকে যা সামান্য নয়	অলোকসামান্য।

ঈ

ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার	আঁষ্টে।
ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে	আস্তিক।

উ

উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে যার	উচ্চাকাঙ্ক্ষী।
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে	কৃতজ্ঞ।
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে	অকৃতজ্ঞ।
উপকারীর অপকার করে যে	কৃতঘ্ন।
উড়ে যাচ্ছে যা	উড্ডীয়মান।
উড়ছে যা	উড্ডীন।
উপকার করবার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা।

এ

একবার ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	**ওষধি**।
একই সময়ে	**যুগপৎ**।
একই সময়ে বর্তমান	**সমসাময়িক**।
একই বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট যার	**একাগ্রচিত্ত**।
এখনও যার বালকত্ব দূর হয়নি	**নাবালক**।
একই মায়ের সন্তান	**সহোদর**।
একই সঙ্গে পাঠ করে যারা	**সহপাঠী**।
একই গুরুর শিষ্য	**সতীর্থ**।

ক

কণ্ঠ পর্যন্ত	**আকণ্ঠ**।
কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত	**আকর্ণ**।
কর্মে অতিশয় কুশল	**কর্মঠ**।
কথায় ব্যক্ত করা যায় না যা	**অব্যক্ত**।
কু (কুৎসিত) যে আচার	**কদাচার**।
কাঠের দ্বারা নির্মিত	**কাঠরা**।
কেউ জানতে পারে না এমনভাবে	**অজ্ঞাতসারে**।
কথায় বর্ণনা করা যায় না যা	**অনির্বচনীয়**।
কোথাও হতে ভয় নেই যার	**অকুতোভয়**।
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	**বন্ধুর**।
কোকিলের ডাক	**কুহু**।
কষ্টে অতিক্রম করা যায় যা	**দুরতিক্রম্য**।
কী কর্তব্য তা যে বুঝতে পারে না	**কিংকর্তব্যবিমূঢ়**।

খ

খাওয়ার ইচ্ছে	**ক্ষুধা**।
খাওয়ার যোগ্য	**খাদ্য**।

গ

গৃহিণীর কাজ	**গিন্নিপনা**।
গভীর রাত্রি	**নিশীথ**।

ঘ

ঘরসম্বন্ধীয়	**ঘরোয়া**।
ঘটকের কাজ	**ঘটকালি**।

ক্ষ

ক্ষমার যোগ্য	**ক্ষমার্হ**।

ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত	**ক্ষুৎপীড়িত।**

চ

চক্ষু দ্বারা নিষ্পন্ন	**চাক্ষুষ।**
যার চক্ষুলজ্জা নেই	**চশমখোর।**
চুরিতে হাত পাকিয়েছে যে	**পাকাচোর।**
চৈত্র মাসের ফসল	**চৈতালি।**

জ

জয়ের জন্য যে উৎসব	**জয়তি।**
জানা নেই যা	**অজ্ঞাত।**
জানা আছে যা	**জ্ঞাত।**
জানবার ইচ্ছা	**জিজ্ঞাসা।**
জানতে পারে না এমনভাবে	**অজ্ঞাতে।**
জয় সূচনা করে এমন	**জয়সূচক।**
জয়সূচক উৎসব	**জয়োৎসব।**
জয় করবার ইচ্ছা	**জিগীষা।**
জানু পর্যন্ত লম্বিত বা দীর্ঘ	**আজানুলম্বিত।**
জীবিত থেকেও যে মৃত	**জীবন্মৃত।**
জন্ম হতে আরম্ভ করে	**আজন্ম।**
জনরব শুনে যে হাজির হয়	**রবাহূত।**

ত

তুলার তৈরি	**তুলোট।**
তন্তু দ্বারা বয়ন করে যে	**তন্তুবায়।**
ত্বরায় গমন করে যে	**তুরগ, তুরঙ্গ।**
তিনটি ফলা বা ফল-এর সমাহার	**ত্রিফলা।**
তীর ছোড়ে যে	**তীরন্দাজ।**

দ

দুবেলা ভাতের বিনিময়ে কাজ করে যে	**পেটেভাতে।**
দেখবার ইচ্ছা	**দিদৃক্ষা।**
দুবার যার জন্ম	**দ্বিজ।**
দেশকে ভালোবাসেন যিনি	**দেশপ্রেমিক।**
দিবসের শেষ ভাগ	**অপরাহ্ণ।**
দিবসের মধ্য ভাগ	**মধ্যাহ্ন।**
বেশি ধন-সম্পত্তি আছে যার	**ধনাঢ্য।**

ধ

ধূলিধূসরিত হয়ে যে উৎসব সম্পন্ন হয়	**ধুলোট**।

ন

নদী মাতা যার	**নদীমাতৃক**।
নৌকা বেয়ে জীবিকা অর্জন করে যে	**নাবিক**।
নিজেকে যে পণ্ডিত মনে করে	**পণ্ডিতম্মন্য**।
নিতান্ত দগধ হয় যখন	**নিদাঘ**।
নিজ জীবনের কথা	**আত্মকথা/আত্মকাহিনী**।
রাত্রিকালে চরে বেড়ায় যে	**নিশাচর**।
নাচে যে মেয়ে	**নাচুনি**।

প

পরে কী হবে ভাবে না যে	**অদূরদর্শী**।
পট আঁকে যে	**পটুয়া**।
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন যিনি	**লব্ধপ্রতিষ্ঠিত**।
পান করবার ইচ্ছা	**পিপাসা**।
পাওয়া যায় যা	**পাওনা**।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত	**আপাদমস্তক**।
পরে কী ঘটবে ভেবে দেখে না যে	**অপরিণামদর্শী**।
পিতার ভ্রাতা	**পিতৃব্য**।
পঙ্‌ক্তিতে বসবার অযোগ্য	**অপাঙ্‌ক্তেয়**।
পা ধোয়ার জল	**পাদ্য**।
পরিব্রাজকের ভিক্ষা	**পরিব্রজ্য**।
পরিমিত ব্যয় করেন যিনি	**মিতব্যয়ী**।
প্রিয় বাক্য বলে যে নারী	**প্রিয়ংবদা**।
প্রথমে মধুর হলেও পরিণামে তা নয়	**আপাতমধুর**।
প্রায়মৃত	**মৃতকল্প**।
প্রতিকার করবার ইচ্ছা	**প্রতিচিকীর্ষা**।
পূর্বে বশ ছিল না এখন হয়েছে	**বশীভূত**।
প্রভা বেশিক্ষণ থাকে না যার	**ক্ষণপ্রভা**।

ফ

ফেলা যায় যা	**ফেলনা**।
ফাঁস দিয়ে মানুষ মারে যে	**ফাঁসুড়ে**।
ফুল হতে তৈরি বা উৎপন্ন যা	**ফুলেল**।

ব

বয়সের তুল্য	**বয়স্য**।
বলবার ইচ্ছা	**বিবক্ষা**।

বমন করবার ইচ্ছা	**বিবমিষা।**
বালকের অহিত (হিতকর নয়) যা	**বালাই।**
বহুর মধ্যে একজন	**শ্রেষ্ঠ।**
ব্যাঙের ছানা	**ব্যাঙাচি।**
বেশি ধন-সম্পত্তি আছে যার	**ধনাঢ্য।**
বেশি শীতও নয় বেশি গরমও নয়	**নাতিশীতোষ্ণ।**
বেশি কথা বলে যে	**বাচাল।**
বেশি কথা বলেন না যিনি	**মিতভাষী।**
বন্দোবস্ত নেই যেখানে	**বেবন্দোবস্ত।**
বাক্য ও মনের অগোচর	**অবাঙমানসগোচর।**
বালক থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সবাই	**আবালবৃদ্ধবনিতা।**
বিদেশে থাকে যে	**প্রবাসী।**
বিদ্যালাভ করেছেন যিনি	**কৃতবিদ্য।**
বিশ্বজনের জন্য হিতকর	**বিশ্বজনীন।**
বন্দনা করবার যোগ্য	**বন্দনীয়।**
বীণার ঝংকার	**নিক্বণ।**

ভ

ভবিষ্যতে কী হবে ভাবে না যে	**অপরিণামদর্শী।**
ভুজ বা বাহুতে ভর করে চলে যে	**ভুজঙ্গম।**
ভাই বা ভ্রাতাদের মধ্যে সদ্ভাব	**সৌভ্রাত্র।**
যা সহজে ভাঙে	**ভঙ্গুর।**
ভোজন করবার ইচ্ছা	**বুভুক্ষু।**
ভিক্ষার অভাব	**দুর্ভিক্ষ।**

ম

মরণ পর্যন্ত	**আমরণ।**
মৃত্যু পর্যন্ত	**আমৃত্যু।**
মরার মতো	**মৃতপ্রায়।**
ময়ূরের ডাক	**কেকা।**
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক	**মুমুক্ষু।**
ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ যার	**ময়ূরকণ্ঠি।**
মৃত্যু অতি নিকটে যার	**মুমূর্ষু, আসন্নমৃত্যু।**
মাটি ভেদ করে ওঠে যা	**উদ্ভিদ।**
মশাল বহন করে যে	**মশালচি**

য

যা শিরে ধারণ করবার যোগ্য	**শিরোধার্য।**

যা যুক্তিসংগত নয়	**অযৌক্তিক।**
যা সহজে লাভ করা যায়	**সুলভ।**
যা ভেদ করা দুঃসাধ্য	**দুর্ভেদ্য।**
যা বিশ্বাস করা যায় না	**অবিশ্বাস্য।**
যা অনেক কষ্টে সাধন করা যায়	**দুঃসাধ্য।**
যা সম্পন্ন করা যায় না	**অসাধ্য।**
যা কষ্টে লাভ করা যায়	**দুর্লভ।**
যা ভস্মে পরিণত হয়েছে	**ভস্মীভূত।**
যা হতে পারে না	**অসম্ভব।**
যা আশা করা যায় তার বেশি	**আশাতীত।**
যা কষ্টে লঙ্ঘন করা যায়	**দুর্লঙ্ঘ্য।**
যা শব্দ করছে	**শব্দায়মান।**
যা নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে	**পরিবর্তনশীল।**
যা সংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা যায় না	**অসংখ্য, সংখ্যাতীত।**
যা আঘাত করলেও সহজে ভাঙে না	**ঘাতসহ।**
যা দমন করা যায় না	**দুর্দমনীয়।**
যা জল দান করে	**জলদ।**
যা ধ্যানের যোগ্য	**ধ্যেয়।**
যা উদিত হচ্ছে	**উদীয়মান।**
যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না	**অনির্বচনীয়।**
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে	**অধীত।**
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	**ভূতপূর্ব।**
যা দেখা যায় না	**অদৃশ্য।**
যা পানের যোগ্য	**পেয়।**
যা লেহন করে খেতে হয়	**লেহ্য।**
যা চুষে খেতে হয়	**চূষ্য।**
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়	**চর্ব।**
যা কথায় বর্ণনা করা যায় না	**অবর্ণনীয়।**
যা নষ্ট হয়	**নশ্বর।**
যা মর্মকে স্পর্শ করে	**মর্মস্পর্শী।**
যা বিনা কষ্টে লাভ করা হয়েছে	**অযত্নলব্ধ।**
যা বলা হয়নি	**অনুক্ত।**
যা বুকে হেঁটে গমন করে	**উরগ।**
যা সরোবরে জন্মে	**সরোজ।**
যা বপন করা হয়েছে	**উপ্ত।**
যা অল্প অল্প গরম	**কবোষ্ণ।**

যা বেশি গরমও নয়, ঠান্ডাও নয়	**নাতিশীতোষ্ণ।**
যা হতে ধূম্র বা ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে	**ধূমায়মান।**
যা কষ্টে জয় করা যায়	**দুর্জয়।**
যা জলে ও স্থলে চরে	**উভচর।**
যা জলে জন্মে	**জলজ।**
যা উচ্চারণ করা যায় না	**অনুচ্চার্য।**
যা নষ্ট হয় না	**অবিনশ্বর।**
যা অমৃতের মতো কাজ করে	**অমৃতায়ন।**
যা অবশ্যই ঘটবে	**অবশ্যম্ভাবী।**
যা চিন্তা করা যায় না	**অচিন্তনীয়।**
যা আগে চিন্তা করা যায়নি	**অচিন্ত্যপূর্ব।**
যা লোকবিদিত	**লৌকিক।**
যা পরকাল-সম্বন্ধীয়	**পারলৌকিক।**
যা বলা উচিত নয়	**অবাচ্য, অকথ্য।**
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না	**অনন্যসাধারণ।**
যা সাধারণত দেখা যায় না	**অসাধারণ।**
যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি	**অদৃষ্টপূর্ব।**
যা পুনঃ পুনঃ দুলছে	**দোদুল্যমান।**
যা পান করতে হয়	**পানীয়।**
যা বলা হচ্ছে	**বক্ষ্যমাণ।**
যা সহজে পরিপাক হয় না	**দুষ্পাচ্য।**
যা ধ্যানের দ্বারা জানা যায়	**ধ্যানগম্য।**
যা দ্বারা জানা যায়	**বিদ্যা।**
যা দ্বারা লেখা যায়	**লেখনী।**
যা বালকের মধ্যে দেখা যায়	**বালসুলভ।**
যা দ্বারা ছেদন করা যায়	**ছেনি, ছেদনি।**
যা ভাসছে	**ভাসমান।**
যা খুব দীর্ঘ নয়	**নাতিদীর্ঘ।**
যা ঘটবে	**ভাবী।**
যা সহজে করা যায় না	**দুরূহ, দুষ্কর।**
যা প্রমাণ করা যায় না	**অপ্রমেয়।**
যার এ পর্যন্ত দাড়ি ওঠেনি	**অজাতশ্মশ্রু।**
যার কোথাও হতে ভয় নেই	**অকুতোভয়।**
যার জায়া যুবতী	**যুবজানি।**
যার দুহাত সমান চলে	**সব্যসাচী।**
যার মূলে ঈর্ষা আছে	**ঈর্ষামূলক।**
যার অন্য উপায় নেই	**অনন্যোপায়।**
যার অনেক দেখাশুনা আছে	**বহুদর্শী।**
যার গন্ধ ভালো	**সুগন্ধি।**

যার ভাতের অভাব	**হাভাতে।**
যার সকল ধন নষ্ট হয়ে গেছে	**হৃতসর্বস্ব।**
যার অন্য কোনো গতি নেই	**অনন্যগতি।**
যার হুঁশজ্ঞান নেই	**বেহুঁশ।**
যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে	**উচ্চাকাঙ্ক্ষী।**
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	**প্রত্যুৎপন্নমতি।**
যার মমতা নেই	**নির্মম।**
যার দয়া নেই	**নির্দয়।**
যার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে	**জাতিস্মর।**
যার নাম কেউ জানে না	**অজ্ঞাতনামা।**
যার উদরই সবকিছু	**উদরসর্বস্ব।**
যার এক বিষয়ে চিত্ত আবদ্ধ	**একাগ্রচিত্ত।**
যার বুদ্ধি পরিপক্ব হয়নি	**অপরিপক্ববুদ্ধি।**
যার পুত্র হয়নি	**অপুত্রক।**
যে জমিতে দুবার ফসল হয়	**দোফসলি।**
যে নারী প্রিয় কথা বলে	**প্রিয়ংবদা।**
যে স্ত্রীর বশীভূত	**স্ত্রৈণ।**
যে পুরুষ বিয়ে করেছে	**কৃতদার, বিবাহিত।**
যে অনবরত রোদন করছে	**রোরুদ্যমান।**
যে নারীর সন্তান বাঁচে না	**মৃতবৎসা।**
যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে	**বাস্তুহারা, উদ্বাস্তু।**
যে বন হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ	**শ্বাপদসংকুল।**
যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে	**নবোঢ়া।**
যে নারী জীবনে একটিমাত্র সন্তান প্রসব করেছে	**কাকবন্ধ্যা।**
যে ভূমিতে ফসল ফলে না	**ঊষর, মরুভূমি।**
যে পরে জন্মগ্রহণ করেছে	**অনুজ।**
যে গাছ কাজে লাগে না	**আগাছা।**
যে নারীর হাসি সুন্দর	**সুচিস্মিতা।**
যে নারীর বিয়ে হয়নি	**অনূঢ়া, কুমারী।**
যে নারীর চক্ষু সুন্দর	**সুনয়না।**
যে নারীর স্বামী, পুত্র নেই	**অবীরা।**
যে নারীর সন্তান হয় না	**বন্ধ্যা, বাঁজা।**
যে কোনো বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে	**বীতস্পৃহ।**
যে নারী বীরসন্তান প্রসব করে	**বীরপ্রসূ।**
যে শিশু স্তন্য পান করে	**স্তন্যপায়ী।**
যে দিনে একবার মাত্র আহার করে	**একাহারী।**
যে সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে	**সাপুড়ে।**
যে বিবেচনা করে কাজ করে না	**অবিবেচক।**
যে সবকিছু ভক্ষণ করে	**সর্বভুক।**

যে বৃক্ষে ফল হয়, ফুল হয় না	**বনস্পতি।**
যে নারী দেখতে সুন্দর	**সুদর্শনা।**
যে নারীর দাঁত সুন্দর	**সুদন্তী।**
যিনি বক্তৃতা দিতে পটু	**বাগ্মী।**
যে নারীর সুন্দর কেশ আছে	**সুকেশা।**
যে ডাক্তার রোগ হাতড়িয়ে মরে	**হাতুড়ে।**
যে সব অত্যাচার সহ্য করে	**সর্বংসহা।**
যার শেষ নেই	**অশেষ।**

শ

শুভক্ষণে জন্ম যার	**ক্ষণজন্মা।**
শক্তিকে অতিক্রম না করে	**যথাশক্তি।**
শিক্ষাগ্রহণ করছে যে	**শিক্ষানবিশ।**
শত্রুকে হনন করে যে	**শত্রুঘ্ন।**

ল

লোকমুখে যা শোনা যায়	**জনরব, জনশ্রুতি।**
লবণাক্ত নয় যা	**আলুনি।**

র

রাত্রির প্রথম ভাগ	**পূর্বরাত্র।**
রাত্রির শেষ ভাগ	**পররাত্র।**
রাজা অথচ ঋষি	**রাজর্ষি।**

স

সন্তান প্রসব করে যে	**প্রসূতি।**
সব জানেন যিনি	**সবজান্তা।**
সমান পতি যার	**সপত্নী।**
সোনার মতো রং যার	**সোনালি।**
সেবা করার ইচ্ছা	**শুশ্রূষা।**
স্থলে চরে যে	**স্থলচর।**
সমগ্র জীবনব্যাপী	**যাবজ্জীবন।**

হ

হিসাব করে না যে	**বেহিসাবি।**
হিত চিন্তা করে যে	**হিতৈষী।**
হাতির ডাক	**বৃংহিত।**
হত্যা করবার ইচ্ছা	**জিঘাংসা।**
হরিণের চামড়া	**অজিন।**

অনুশীলনমূলক কাজ

১. নিচের বাক্যগুলো সংকুচিত করে লেখ:

আয় বুঝে ব্যয় করলে আর্থিক কষ্টে পড়তে হয় না।
আমি দিনের শেষভাগে সেখানে যাব।
গ্রামের শেষ প্রান্তে যেখানে মৃত গবাদিপশু ফেলা হয় সে জায়গাটি খুবই অপরিচ্ছন্ন।
লোকটির স্বভাবে অনেক বিপরীত ভাব লক্ষ করা যায়।
বর্তমানে দেশি সাগর কলা সহজে পাওয়া যায় না।
পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ও ধনসম্পদ চিরস্থায়ী হয় না।
তার এ কাজটি প্রশংসার যোগ্য।

২. নিচের বাক্যাংশগুলো এক কথায় প্রকাশ কর :

উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার।
যা কোনোভাবেই নিবারণ করা যায় না।
একই গুরুর শিষ্য।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত।
অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে এমন ব্যক্তি।
বাঁচতে ইচ্ছুক।
সুরের ধ্বনি।
শ্রবণমাত্র যার মুখস্থ হয়।

৩. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

নিচের ডান পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে সংকুচিত শব্দের মিল কর :
ময়ুরের ডাক — হ্রেষা
বীণার ধ্বনি — গুঞ্জন
ঘোড়ার ডাক — কেকা
সিংহের গর্জন — নাদ
পাখির ডাক — কূজন

প্রতিশব্দ

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।
বাবা-মা সবসময় সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন।
তার সঙ্গে কথা বলার কোনো অভিপ্রায় আমি প্রকাশ করিনি।
মনের সব বাসনা কখনও পূর্ণ হয় না।
বড় হতে হলে আকাঙ্ক্ষাকে বড় করতে হবে।
মনের মধ্যে মহৎ কাজ করার স্পৃহা জাগ্রত করতে হবে।

উপরের বাক্যগুলো লক্ষ করলে দেখতে পাবে প্রত্যেক বাক্যেই ঐ শব্দগুলোর অর্থ এক এবং একটি অপরটির সমার্থ। এখানে ইচ্ছা শব্দের প্রতিশব্দ কামনা, অভিপ্রায়, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা।

এরূপ সমার্থ শব্দ একটি অপরটির প্রতিশব্দ। বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যে-শব্দগুলোর একার্থবোধক অনেক প্রতিশব্দ আছে। যে-ভাষা যত সমৃদ্ধ সে-ভাষার শব্দভাণ্ডারে সমার্থ বা প্রতিশব্দের প্রাচুর্যও তত বেশি। এখানে 'ইচ্ছা' শব্দের সমার্থ শব্দ হচ্ছে কামনা, অভিপ্রায়, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা।

রচনা লেখাসহ যে-কোনো সৃষ্টিশীল রচনায় একই শব্দের নানা প্রতিশব্দ বা সমার্থ জানা থাকলে বাক্যকে সুন্দর, প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর করা যায়। এতে রচনার শ্রীবৃদ্ধি হয়, ভাষা হয় সরস ও বৈচিত্র্যময়। এজন্য ভাষায় প্রতিশব্দ বা সমার্থ শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। নিচে কতগুলো পরিচিত শব্দের প্রতিশব্দ বা সমার্থ শব্দ দেওয়া হল :

অ

অগ্নি : আগুন, অনল, বহ্নি, শিখা, হুতাশন, সর্বভুক, বিভাবসু, দহন, পাবক, বৈশ্বানর, জাতবেদ্য, সর্বশুচি।
অধিক : বেশি, অতিশয়, খুব, প্রচুর।
অল্প : কম, ঈষৎ, অপ্রচুর, যৎসামান্য, একটু, কিঞ্চিৎ।
অতিশয় : অতি, অধিক, অত্যধিক, খুব, অতিশয়।
অতিথি : আগন্তুক, অভ্যাগত, গৃহাগত, মেহমান।
অশ্ব : ঘোড়া, ঘোটক, তুরগ, তুরংগম, তুর, বাজী।
অন্ন : ভাত, ওদন।
অপবাদ : অপমান, অখ্যাতি, নিন্দা।
অন্ধকার : তিমির, তমিস্রা, তমঃ, আঁধার।
অচল : গতিহীন, অটল, স্থির, অনড়, অব্যবহার্য।

আ

আকাশ : গগন, নভ, অন্তরী, অম্বর, ব্যোম, আসমান, অভ্র, নভোমণ্ডল।
আঙিনা : উঠান, অঙ্গন, প্রাঙ্গণ, চত্বর।
আনন্দ : আহ্লাদ, হর্ষ, আমোদ, উল্লাস, খুশি, পরিতোষ, প্রফুল্লতা, প্রীতি, সন্তোষ, সুখ।
আদেশ : আজ্ঞা, হুকুম, অনুমতি, অনুশাসন, উপদেশ, নিয়োগ।
আফসোস : পরিতাপ, দুঃখ, মনস্তাপ।
আলো : আলোক, কিরণ, কর, আভা, বিভা, প্রভা, জ্যোতি, নূর।

ই

ইচ্ছা : বাসনা, কামনা, ঈপ্সা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, আকাড়া, অভিপ্রায়, অভিলাষ, অভিরুচি, সাধ, মনোরথ, রুচি।
ইতি : সমাপ্তি, শেষ, পরিশেষ, অবসান ।

ঈ

ঈশ্বর : ধাতা, বিধাতা, বিভু, বিধি, স্রষ্টা, বিশ্বপতি, জগদীশ, ভগবান, পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, প্রভু, অন্তর্যামী, জগৎপতি, ঈশ, পরমেশ, জগৎপিতা।

ঈর্ষা : পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, হিংসা।

উ

উল্লাস : আনন্দ, খুশি, স্ফূর্তি, আমোদ।

উগ্র : প্রচণ্ড, নিষ্ঠুর, রুক্ষ, কর্কশ, তীক্ষ্ণ, তীব্র, কড়া, প্রখর।

উজ্জ্বল : দীপ্তিমান, আলোকিত, উদ্ভাসিত, শোভমান, প্রজ্বলিত।

উত্তম : উৎকৃষ্ট, প্রধান, ভদ্র, অগ্রণী, বরেণ্য।

ঊ

ঊষা : প্রভাত, প্রত্যূষ, ভোর, সকাল।

ঊর্মি : তরঙ্গ, ঢেউ, জলপ্রবাহ।

ঊহ্য : অনুল্লিখিত, অব্যক্ত, অনুক্ত।

ঋ

ঋণ : দেনা, কর্জ, ধার।

এ

এবং : আর, ও।

ঐ

ঐরাবত : হাতি, হস্তী, মাতঙ্গ, গজ, করী, দ্বিপ, কুঞ্জর।

ও

ওষ্ঠ : ঠোঁট, অধর।

ঔ

ঔষধ : ওষুধ, দাওয়াই, প্রতিষেধক।

ক

কিরণ : আলো, রশ্মি, জ্যোতি, প্রভা, অংশু, দীপ্তি, বিভা, কর, আভা।

কেশ : চুল, অলক, কুন্তল, চিকুর।

কোকিল : পিক, বসন্তদূত, অন্যপুষ্ট, পরভৃৎ, কলকণ্ঠ।

কপাল : ললাট, ভাল।

কাক : বায়স, পরভৃৎ।

কুল : সমাজ, জাতি, বর্ণ, গণ, সমূহ, যূথ।

খ

খর : কর্কশ, তীব্র, তীক্ষ্ণ, ধারালো, প্রবল।

খবর : সংবাদ, বার্তা, তত্ত্ব, সন্দেশ, সন্ধান।

খাঁটি : বিশুদ্ধ, ভেজালহীন, অকৃত্রিম, আসল, সারগর্ভ।

খারাপ : মন্দ, কু, বদ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অভদ্র, অশ্লীল, রুক্ষ, উগ্র, বিকল।

খেচর : পাখি, পী, বিহগ, বিহঙ্গ, দ্বিজ, খগ।

গ

গরু : গাভী, গো, ধেনু, ধবলী।
গাল : গন্ড, কপোল।
গৃহ : ঘর, বাটি, বাড়ি, আবাস, আগার, আলয়, নিলয়, নিবাস, নিকেতন, সদন, ভবন, ধাম, পুরী।
গ্রন্থ : পুঁথি, বই, পুস্তক, শাস্ত্র।

ঘ

ঘরনী : গৃহিণী, স্ত্রী, পত্নী, জায়া, দারা, সহধর্মিণী, বিবি, বেগম, কলত্র, কর্ত্রী।
ঘন : মেঘ, অভ্র, জলধর, নিবিড়, মোটা, জমাট, প্রবল, পয়োদ, গভীর।

চ

চন্দ্র : শশাঙ্ক, শশী, শশধর, নিশাচর, সুধাকর, সুধাংশু, হিমাংশু, ইন্দু, বিধু, তারাপতি, চন্দ্রমা, চাঁদ, হিমকর, নিশানাথ, নিশাকান্ত, মৃগাঙ্ক, শীতাংশু।
চঞ্চল : অস্থির, চপল, ব্যাকুল, কম্পিত, বিচলিত।
চতুর : বুদ্ধিমান, নিপুণ, কুশল, ধূর্ত, ঠগ।
চক্ষু : অক্ষি, লোচন, নেত্র, নয়ন, চোখ।

ছ

ছলনা : ছল, কপটতা, ভণিতা, চাতুরী, ন্যাকামি, ছলাকলা।
ছাত্র : বিদ্যার্থী, শিক্ষার্থী।
ছেলে : পুত্র, নন্দন, তনয়।

জ

জল : পানি, বারি, নীর, সলিল, অম্বু, পয়, জীবন, উদক, পেয়, পানীয়।

ঝ

ঝড় : প্রভঞ্জন, ঝঞ্ঝা, ঝটিকা, তুফান, বাত্যা।

ট

টীকা : ব্যাখ্যা, টিপ্পনী।
টোপর : শিরস্ত্রাণ, মুকুট, টুপি।

ঠ

ঠাট্টা : উপহাস, রসিকতা, বিদ্রূপ, শ্লেষ, মশকরা।

ড

ডর : ভয়, শঙ্কা, ত্রাস।

ঢ

ঢেউ : তরঙ্গ, ঊর্মি, বীচি।

ত

তীর : কূল, পাড়, ধার, তট, কিনারা, বেলাভূমি, সৈকত।

থ

থোকা : গোছা, স্তবক, মালা, মুষ্টি, থোক।

দ

দয়া : অনুকম্পা, করুণা, অনুগ্রহ, কৃপা, মেহেরবানি।
দুঃখ : বেদনা, বিষাদ, কষ্ট, বিষণ্ণতা।
দাঁত : দন্ত, দশন, দন্তক।
দরজা : দ্বার, দুয়ার, প্রবেশপথ।
দিবা : দিন, দিবস, অহ।
দেহ : কায়া, শরীর, কলেবর, গা, গাত্র।
দাস : ভৃত্য, চাকর, অনুগত, অধীন।
দীন : অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র, কাতর, হীন।

ধ

ধন : বিত্ত, বিভব, বৈভব, ঐশ্বর্য, অর্থ, টাকা-পয়সা, নিধি, বিভূতি, সম্পদ।
ধীর : মন্থর, মৃদু, অচঞ্চল, শান্ত, নম্র, বিবেচক।

ন

নাক : নাসা, নাসিকা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়।
নদী : কল্লোলিনী, কলস্বিনী, গাঙ, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, তটিনী, প্রবাহিনী, তরঙ্গিনী, নির্ঝরিণী, শৈবলিনী, সরিৎ।
নারী : রমণী, কামিনী, ভামিনী, অবলা, ললনা, অঙ্গনা, ভার্যা, সীমন্তিনী, মহিলা, কান্তা, প্রমদা।

প

পণ্ডিত : মনীষী, সুধী, বিদ্বান, বিজ্ঞ।
পদ্ম : কমল, শতদল, উৎপল, পঙ্কজ, সরোজ, অরবিন্দ, তামরস, কোকনদ, নলিনী, রাজীব, ইন্দবীর, পুণ্ডরী, সরোরুহ।
পর্বত : পাহাড়, গিরি, ভূধর, অচল, শৈল, আদ্র, নগ, ধরাধর, মহীধর।
পৃথিবী : বসুমতী, বসুন্ধরা, বসুধা, বিশ্ব, ধরণী, ধরিত্রী, মেদিনী, অবনী, মহী, ক্ষিতি, ভূমি, ভুবন, জগৎ, দুনিয়া, সর্বংসহা।
পী : বিহঙ্গ, খগ, বিহঙ্গম, দ্বিজ, খেচর, পাখি, অণ্ডজ।
পুষ্প : কুসুম, ফুল, প্রসূন, পুষ্প, রঙ্গন।
বাতাস : বায়ু, পবন, সমীর, সমীরণ, প্রভঞ্জন, হাওয়া, অনিল, বাত, মরুৎ, গন্ধবহ।
বন : অরণ্য, জঙ্গল, বিপিন, কান্তার, অরণ্যানী।
বৃক্ষ : তরু, গাছ, উদ্ভিদ, মহীরুহ, শাখা, পাদপ, বিটপী।
বস্ত্র : বসন, কাপড়, পোশাক, অম্বর, পরিচ্ছদ, বাস।
বিবাহ : পরিণয়, বিয়ে, পাণিগ্রহণ, উদ্বাহু, শাদি।
বিজলি : চপলা, সৌদামিনী, অশনি, ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ, তড়িৎ।

ভ

ভয় : আতঙ্ক, ডর, ত্রাস, শঙ্কা, ভীতি।
ভালো : উত্তম, বেশ, উৎকৃষ্ট, অনবদ্য, চমৎকার, প্রকৃষ্ট।

ভুজঙ্গ : নাগ, সাপ, সর্প, ফণী, আশীবিষ, বিষধর, অহি।
ভ্রমর : মধুকর, মধুপ, অলি, ষট্পদ।

ম

মেঘ : জলদ, জলধর, নীরদ, বারিদ, ঘন, জীমূত, কাদম্বিনী, অভ্র, অম্বুদ, তোয়দ, বলাহক।
মৃত্যু : মরণ, নিধন, জীবনাবসান, বিনাশ, স্বর্গলাভ, লোকান্তর, পরলোকগমন, তিরোধান, দেহত্যাগ, প্রাণবিয়োগ, মহাপ্রয়াণ, মহাযাত্রা, পটল তোলা, অন্তিম যাত্রা।
মাতা : মা, জননী, প্রসূতি, গর্ভধারিণী।

য

যুদ্ধ : সংগ্রাম, সমর, সংঘর্ষ, বিগ্রহ, আহব, রণ, দ্বন্দ্ব।

র

রাত্রি : রাত, রজনী, যামিনী, নিশীথিনী, বিভাবরী, শর্বরী, নিশা, ক্ষণদা, নিশি।
রব : শব্দ, ধ্বনি।
রাজা : শাসক, নৃপতি, নরপতি, নৃপ, ভূপতি, ভূপাল, নরেন্দ্র, প্রজাপাল।

ল

লোচন : চক্ষু, নয়ন, নেত্র, আঁখি, চোখ।

শ

শরীর : গা, দেহ, তনু, কায়া, অঙ্গ, কলেবর।

ষ

ষাঁড় : বৃষ, ষণ্ড।

স

সমুদ্র : সাগর, রত্নাকর, পারাবার, বারিধি, জলধি, অর্ণব, সিন্ধু, পায়োনিধি, অম্বুধি, পাথার।
সমূহ : পুঞ্জ, বৃন্দ, রাশি, সব, গণ, সকল, সমুদয়, কুল, নিচয়, নিকর।
সুন্দরী : অভিরাম, সুশ্রী, রূপসী, বামা, বরাঙ্গনা।
সূর্য : দিনমণি, দিবাকর, প্রভাকর, ভাস্কর, তপন, বরুণ, মিহির, রবি, ভানু, অংশুমালী, সবিতা।
সাপ : সর্প, ভুজঙ্গ।
স্বামী : পতি, নাথ, কান্ত, দয়িত, বল্লভ।
স্বর্ণ : কাঞ্চন, হেম, কনক, সোনা, সুবর্ণ।

হ

হাত : হস্ত, কর, পাণি, ভুজ, বাহু।

ক্ষ

ক্ষীণ : পাতলা, রোগা, চিকন।
ক্ষমা : মার্জনা, মাফ করা।

অনুশীলনমূলক কাজ

১। প্রতিশব্দ কাকে বলে? প্রতিশব্দের কেন প্রয়োজন?

২। নিচের প্রত্যেকটি বাক্যের ডান পাশে কয়েকটি করে প্রতিশব্দ দেওয়া হল। সুপ্রযুক্ত প্রতিশব্দ দ্বারা বাক্যের শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

ক. বল বীর উন্নত মম — । মাথা, শির, মস্তক.
খ. অল্প — কাতর অধিক শোকে পাথর। দুঃখে, শোকে, বেদনায়.
গ. আমি — পাড়ি দেব, আমি সওদাগর। সাগর, অর্ণব, জলধি.
ঘ. — ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গি এল দেশে। ছেলে, পুত্র, তনয়.
ঙ. আমাদের ছোট — চলে বাঁকে বাঁকে। তটিনী, স্রোতস্বতী, নদী.

৩। নিচের মোটা অক্ষরের শব্দগুলোর পরিবর্তে সঠিক প্রতিশব্দ বসাও :

ক. বীরভোগ্যা **অবনী**।
খ. **কুসুম** আপনার জন্য ফোটে না।
গ. কানা ছেলের নাম **পদ্মনেত্র**।
ঘ. **উৎকৃষ্ট** নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. 'তপন' শব্দের সঠিক সমার্থ শব্দ কোনটি?

১. কনক ২. সূর্য
৩. মেদিনী ৪. শশধর

খ. 'বরুণ'-এর সমার্থ শব্দ কোনটি?

১. সিন্ধু ২. সমুদ্র
৩. মহানদ ৪. মিহির

গ. 'নদী' শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ কোনটি ?

১. সমুদ্র ২. তটিনী
৩. দিঘি ৪. জলাশয়

ঘ. 'ভূমি' শব্দের সমার্থ শব্দ কোনটি ?

১. হিমাদ্রি ২. পৃথিবী
৩. অবনী ৪. অনিল

ঙ. 'বিজলি'-এর সমার্থ শব্দ কোনটি ?

১. কিরণ ২. জ্যোতি
৩. বিদ্যুৎ ৪. অর্ণব

পরিভাষা

পরিভাষা বলতে কী বুঝি

অপর ভাষা থেকে রূপান্তরিত ও নতুনরূপে সৃষ্ট বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দ হল 'পরিভাষা'। ভাষার প্রয়োজনে; জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য; শিক্ষা, প্রশাসন ও বিভিন্ন পেশায় ব্যবহারের জন্য আমাদের নিত্যনতুন শব্দের প্রয়োজন পড়ে। সে প্রয়োজন মেটাতে আমাদের বাংলা শব্দসম্ভারে প্রতিনিয়ত সংযোজিত হচ্ছে নানা ভাষার শব্দ। যেসব শব্দ অন্য ভাষা থেকে পরিবর্জিত, রূপান্তরিত বা অনুবাদিত না হয়ে আমাদের ভাষায় সরাসরি বা হুবহু ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোকে আমরা চিহ্নিত করি বিদেশি শব্দ হিসেবে। আর যেসব শব্দ অন্য ভাষা থেকে ভাবগত অর্থ অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলায় রূপান্তরিত করা হয়েছে সেগুলোকে বলি 'পরিভাষা' বা পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজি Terminology শব্দের রূপান্তরিত বাংলা প্রতিশব্দ 'পরিভাষা'। 'পরিভাষা'— এ শব্দটিও একটি পরিভাষা-শব্দ। অন্যদিকে 'পরিভাষা' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'পরি' উপসর্গ যোগে 'ভাষা'— পরিভাষা, এভাবে শব্দটি সৃষ্ট। বাংলা ভাষায় শব্দ গঠন ও বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার বা শব্দভান্ডার (Vocabulary) বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি 'পরিভাষা' বা পারিভাষিক শব্দেরও প্রয়োজন রয়েছে যথেষ্ট। বাংলা ভাষায় এমন অনেক বিদেশি শব্দ আছে যেগুলো ঐ ভাষার শব্দ হিসেবে সরাসরি ও অবিকৃতভাবে যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে তেমনি বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে নতুন পারিভাষিক শব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন— প্রাইমারি স্কুল— প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেকেন্ডারি স্কুল— মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হায়ার সেকেন্ডারি— উচ্চমাধ্যমিক, টেকস্টবুক — পাঠ্যপুস্তক, টেকস্টবুক বোর্ড— পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। এভাবে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট অজস্র শব্দ যেমন বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করে পারিভাষিক শব্দ হিসেবে আমরা নিয়ত ব্যবহার করছি, তেমনি অর্থনীতি (Economics), সমাজবিজ্ঞান (Social Science), দর্শন (Philosophy), ভূগোল (Geography), ইতিহাস (History), পৌরনীতি (Civics) ইত্যাদি বহু পারিভাষিক শব্দ আমরা ব্যবহার করছি।

পরিভাষা সৃষ্টির পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষার এ পরিভাষা সৃষ্টি একদিনে হয়নি। প্রায় দুশ বছর সময় ধরে এরূপ পরিভাষা আমাদের ভাষায় নতুন নতুন ভাবে সংযোজিত হচ্ছে। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কারণে ও পৃথিবীব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের অব্যাহত সংযোগ ঘটছে। একটি জীবন্ত ও প্রবহমান ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা এসব শব্দ নিজের শব্দভান্ডারে ও ভাষাশৈলীর গঠনে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। প্রখ্যাত ধ্বনিবিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন— 'বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতির দিকে এবং বোধগম্যতার দিকে লক্ষ রেখে আমাদের পরিভাষা নির্মাণ করতে হবে।' পরিভাষা সৃষ্টির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'রাষ্ট্রভাষাকে যাবতীয় শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম করতে হলে রাষ্ট্রভাষার পরিভাষা সৃষ্টি করতে হবে।' সুতরাং বাংলা ভাষায় পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সহজেই বোঝা যায়।

আমাদের শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা বাংলা হলেও উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদান এখনও পুরোপুরি সহজগম্য হয়ে ওঠেনি। এজন্য অনেকে আমাদের পরিভাষা সৃষ্টির অভাবকে দায়ী করেন। তবে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদেশি শাসকদের বাংলা শেখানোর জন্য বিশেষত প্রশাসনিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞানচর্চার অব্যাহত এই প্রচেষ্টা চলে আসছে। বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সেসব পাঠ্যপুস্তকে যথাযথ পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের উদ্যোগও তখন থেকে চলে আসছে।

বাংলা ভাষায় পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — তাঁদের মতামত যেমন জানিয়েছেন তেমনি বাংলা ভাষায় নতুন পরিভাষাও সৃষ্টি করেছেন। ১৯৭৪ সালে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান ও পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রয়োজন আরও গুরুত্ব পায়।

পরিভাষা সৃষ্টির নীতিমালা

তবে বাংলা ভাষায় পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যেসব শব্দ আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহারে পরিচিত হয়ে পড়েছে ও গৃহীত হয়েছে সেগুলোর পরিভাষা সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন—রিকশা শব্দটি আমাদের এতই পরিচিত যে যদি এর পরিবর্তে বাংলা পরিভাষা 'ত্রিচক্রযান' চালাতে চেষ্টা করি তা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তেমনি রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ইত্যাদি শব্দের পারিভাষিক শব্দ হল বেতার, দূরদর্শন, দূরালাপনী। এসব শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারের সঞ্চয় বাড়িয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিত্যব্যবহার্য শব্দ হিসেবে রেডিও, টেলিভিশন ও টেলিফোন অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে—Registration, Certificate, Report ইত্যাদি ইংরেজি শব্দের পারিভাষিক শব্দ—নিবন্ধন, সনদ, অভীক্ষা ইত্যাদি পরিভাষা প্রচলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ Compulsary Education-এর পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছিলেন 'অবশ্য-শিক্ষা'। 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা' পরিভাষাকে তিনি 'কদর্য' বলে অভিহিত করেছিলেন। অথচ কালের প্রবাহে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা'ই গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর তৈরি করা অনেক পারিভাষিক শব্দ কালের সীমা পেরিয়ে আমাদের নিত্যব্যবহার্য বাংলা শব্দ হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। যেমন—Apathy– অনীহা, Resident– আবাসিক, Optional– ঐচ্ছিক, A copy, Transcript- প্রতিলিপি ইত্যাদি।

পৃথিবীর যে-কোনো জীবন্ত ভাষা গতিশীল। ভাষা নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। নদীর স্রোতে দুপারের অনেক বস্তু পড়ে একাকার হয়ে যায়, মিশে যায়, গলে যায়। তেমনি যে-কোনো সৃষ্টিশীল ভাষায় অনেক অপর ভাষার শব্দও একাত্ম হয়ে যায়। তারপরও ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে, জ্ঞানচর্চার পরিধি বাড়াতে হলে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়। তবে এসব সৃষ্ট পরিভাষা হতে হবে সহজবোধ্য, অর্থাৎ বিশেষ অর্থজ্ঞাপক ও প্রায়োগিক। বাংলা ভাষায় গৃহীত 'পরিভাষা' নিচের কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. শিক্ষা
২. সাধারণ প্রশাসনিক
৩. বৈজ্ঞানিক
৪. বিচার-সম্পর্কীয়
৫. বাণিজ্যিক
৬. দাপ্তরিক
৭. পদনাম

পরিভাষার উদাহরণ

শিক্ষাবিষয়ক

A

Academic—কেতাবি, একাডেমিক, প্রাতিষ্ঠানিক
Academic supervision—একাডেমিক তত্ত্বাবধান
Academy—একাডেমি, আকাদেমি
Admission test—ভর্তি পরীক্ষা
Advanced reader—অগ্রণী পাঠক
Adaptation—অভিযোজন
Agenda—আলোচ্যসূচি
Affective domain—আবেগিক ক্ষেত্র
Adolescent education—কৈশোর শিক্ষা
Academic year—শিক্ষাবর্ষ
Action plan—কর্মপরিকল্পনা
Admission—ভর্তি
Advancement—অগ্রগতি
Associating method—অনুষঙ্গ পদ্ধতি
Achievement test—অর্জন অভীক্ষা
Assimilation—আত্তীকরণ
Arithmatic—গণিত
Art of knowledge—জ্ঞানশৈলী

Adaptability—গ্রহণক্ষমতা
Assessment of reading skill—পড়ার দক্ষতা নিরূপণ
Application—প্রয়োগ
Age cohort—বয়ঃগুচ্ছ
Alternative education—বিকল্প শিক্ষা
Apposite education—যথার্থ শিক্ষা
Anagram—শব্দবিন্যাস
Apprenticeship—শিক্ষানবিশ
Advocacy—সপক্ষতা
Acting—ভারপ্রাপ্ত
Address of welcome—অভিনন্দনপত্র
Annual prize giving ceremony—
বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান
Approval—অনুমোদন
Audio—শ্রব্য
Average—গড়
Algebra—বীজগণিত
Exhibition—শিল্প প্রদর্শনী
Anthology—সাহিত্য-সংকলন
Activity based education—কর্মভিত্তিক শিক্ষা
Assignment—নির্ধারিত কাজ
Assumption—পূর্বানুমান
Advanced level—প্রাগ্রসর স্তর
Adult education—বয়স্কশিক্ষা
Abstract concept—বিমূর্ত ধারণা
Attitude—দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভঙ্গি
Aim—লক্ষ্য
Assessment—মূল্যায়ন
Ability—সক্ষমতা
Archives—অভিলেখাগার
Acting Principal—ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
Annual—বার্ষিক
Attested—সত্যায়িত
Audio-visual aid—দৃশ্য-শ্রব্য সহায়ক
Alphabetic—বর্ণানুক্রমিক
Art—কলা
Answerscript—উত্তরপত্র
Attendence—উপস্থিতি
Accountability—দায়বদ্ধতা
Annual scheme of work—বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

B

Bilingual—দ্বিভাষিক
Bulletin—বুলেটিন
Booklet—পুস্তিকা
Bio-data—জীবনবৃত্তান্ত
Book fair—বইমেলা
Benchmark Survey—তুল্যমান জরিপ
Brain storming—ব্রেন স্টর্মিং, চিন্তা অনুধ্যান
Basic education—মৌলিক শিক্ষা
Basic literacy—মৌলিক সাক্ষরতা
Brochure—পুস্তিকা
Book—বই, পুস্তক
Broadcast—সম্প্রচার
Break of study—অধ্যয়ন-ছেদ (বিরতি)
Bad language—অপভাষা
Brain-drain—মেধাপাচার
Basic learning needs—মৌলিক শিখনচাহিদা
Basic level—মৌলিক স্তর

C

Case study—কেস স্টাডি, ঘটনা সমীক্ষা
Cognative skill—জ্ঞানমূলক দক্ষতা
Criteria—নির্ণায়ক
Certificate—সনদ, অভিজ্ঞানপত্র
Chancellor—আচার্য
Child-centred—শিশুকেন্দ্রিক
Civil society—নাগরিক সমাজ
Concept paper—ধারণাপত্র
Caption—শিরোনাম
Cartoon—ব্যঙ্গচিত্র
Chart—চিত্র, লেখ
Check—পরীক্ষা

Class—শ্রেণী
Competency based—যোগ্যতাভিত্তিক
Competency based curriculum—যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম
Copy-right—গ্রন্থস্বত্ব
Curriculum dissimination—শিক্ষাক্রম বিস্তরণ
Checklist—চেকলিস্ট
Community learning centre (CLC)—সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র
Camp—কর্মশিবির
Complementery learing material—পরিপূরক শিখন উপকরণ
Co-education–সহশিক্ষা
Curriculum—শিক্ষাক্রম
Community school—সমাজ বিদ্যালয়
Curriculum & Syllabus—শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি
Catechism—প্রশ্নোত্তর শিক্ষা
Content—বিষয়সূচি
Criteria—মানদণ্ড
Continuing education—বহমান শিক্ষা
Core-trainer—মুখ্য প্রশিক্ষক
Competition—প্রতিযোগিতা
Cognative domain—জ্ঞানমূলক শিক্ষণ-ক্ষেত্র

D

Drop out—ঝরে পড়া
Drill—ড্রিল, অনুশীলন
Dyslexia—পাঠের অক্ষমতা
Difficulty level—কাঠিন্যের মাত্রা
Drop out rate—ঝরে পড়ার হার
Dictation—শ্রুতলিপি
De-schooling—স্কুল মুক্তকরণ

E

Examination Fobia—পরীক্ষাভীতি
Essential learning contineum—আবশ্যকীয় শিখনক্রম
Efficacy—ফলপ্রসূতা
Experimentation—পরীক্ষা-নিরীক্ষা
Effectiveness—কার্যকারিতা
Equity—সমতা

F

Facilitating— সহায়তাদান
Field training—মাঠ প্রশিক্ষণ
Foundation—বুনিয়াদি
Field testing—মাঠ-পরীক্ষণ
Feedback—ফলাবর্তন
Foundation training—বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

G

Group learning—দলগত শিখন
Group teaching—দলগত শিক্ষাদান
Group work—দলগত কাজ
Globalization—বিশ্বায়ন, গোলকায়ন

I

Implementation—বাস্তবায়ন
Interpersonal—আন্তঃব্যক্তিক
Inclusive education—একীভূত শিক্ষা
Ink—কালি
Information kit—তথ্যসামগ্রী
Intensive inspection—নিবিড় পরিদর্শন
Innovative education—উদ্ভাবনমূলক শিক্ষা
In-service training—কর্মকালীন প্রশিক্ষণ
Input-process-output—যোগান-প্রক্রিয়া-ফলাফল
Information source—তথ্যসূত্র

Information system—তথ্যব্যবস্থা
Information flow—তথ্যপ্রবাহ
Invigilator—পরীক্ষাকক্ষ তত্ত্বাবধায়ক
Illiterate—নিরক্ষর

L

Learner—শিক্ষার্থী
Learning—শিখন
Learning needs—শিখন চাহিদা
Learning centre—শিখনকেন্দ্র
Life long learning—জীবনভর শিখন
Learning achivement—শিখন অর্জন
Learning outcome—শিখনফল
Learning Test—শিখন অভীক্ষা
Learning strategy—শিখনকৌশল
Learning readiness—শিখন প্রস্তুতি
Learning sequence—শিখন-পরম্পরা
Learning materials—শিখনসামগ্রী
Liberal promotion policy—নমনীয় প্রমোশন নীতি
Liberal—নমনীয়
Literacy programme—সাক্ষরতা কর্মসূচি
Literacy—সাক্ষরতা
Learning goal–শিক্ষার–অভিলক্ষ্য
Limited literacy skill—সীমিত সাক্ষরতা দক্ষতা
Learning import—শিক্ষার যোগান

M

Microteaching—অনুশিক্ষণ
Motivation—প্রেষণা
Monitoring—পরিবীক্ষণ
Module—মডিউল
Mass education—গণশিক্ষা

O

Objectives—উদ্দেশ্য
Observation process—পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া
Open-ended question—উন্মুক্ত প্রশ্ন
Over learning—অতিশিখন

P

Participatory—অংশগ্রহণমূলক
Participatory approach—অংশগ্রহণমূলক পন্থা
Performing indicators—পারদর্শিতা সূচক
Practice teaching—অনুশীলন পাঠদান
Pre-primary—প্রাক–প্রাথমিক
Primary level—প্রাথমিক স্তর
Peer-learning—জুটিতে শিখন

Q

Questionaire—প্রশ্নমালা
Question Bank—প্রশ্নব্যাংক

R

Resource material—সহায়ক উপকরণ

S

Self assessment—স্বমূল্যায়ন
Synthesis—সংশ্লেষণ
Stakeholders—অংশীজন
Syllabus—পাঠ্যসূচি

T

Textbook— পাঠ্যপুস্তক
Text material— পাঠসামগ্রী
Textual— পাঠভুক্ত
Terminology— পরিভাষা
Teacher centered— শিক্ষককেন্দ্রিক
Teacher trainer— শিক্ষক প্রশিক্ষক
Teaching learning materials— শিক্ষণ-শিখনসামগ্রী
Teaching method— শিক্ষণ পদ্ধতি
Teacher training— শিক্ষক প্রশিক্ষণ
Team work— দলগত কাজ

U

University— বিশ্ববিদ্যালয়
Universal— সর্বজনীন
Uniformity— সমতা
Unlearning— শিখন পরিহার
Vice -Chancellor— উপাচার্য
Vice- Principal— উপাধ্যক্ষ
Vocation— বৃত্তি
Vocational— বৃত্তিমূলক
Vocabulary— শব্দভাণ্ডার
Vision— কল্পচিত্র
Vertical— উলম্ব
Verbal— বাচনিক

W

Workbook— ওয়ার্ক বুক, অনুশীলন পুস্তিকা

X

X-Ray— এক্স-রে

Z

Zebra crossing— জেব্রা ক্রসিং, জেব্রাপারাপার
Zonal— আঞ্চলিক
Zoo— চিড়িয়াখানা

প্রতিষ্ঠানিক নামের পারিভাষিক রূপ

National Curriculum & Textbook Board— জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
Directorate of Primary & Mass Education— প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর।
Board of Secondary & Higher Education— মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
Bangladesh Secretariate— বাংলাদেশ সচিবালয়।
Directorate of Secondary & Higher Education— মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর।
Metrological Directorate— আবহাওয়া অধিদপ্তর।
United Nations Organization— জাতিসংঘ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।
Ministry of Education— শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS)— বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো।
Atomic Energy Centre— আণবিক শক্তিকেন্দ্র।
National Museum— জাতীয় জাদুঘর।
Election Commission— নির্বাচন কমিশন।
United Nations Childrens Fund (UNICEF)— জাতিসংঘ শিশু তহবিল।

Directorate of Inspection & Audit—পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর।
National Book Centre—জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।
National Archives—জাতীয় অভিলেখাগার।
Institute of Education & Research—শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।
Institute of Arts & Crafts—চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট।
Primary Teachers Training Institute—প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।
Teachers Training College—শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ।
Campaign for Popular Education—গণসাক্ষরতা অভিযান।
Thana Education Resource Centre (TERC)—থানা শিক্ষা রিসোর্স সেন্টার।
National Curriculum Development Centre—জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র।
Anti Corruption Commission—দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সাধারণ ব্যবহারিক পরিভাষা

A

Abstract—সার, সংক্ষিপ্ত
Acceptance—গ্রহণ, স্বীকৃতি
Accident insurance—দুর্ঘটনা বীমা
Account—হিসাব
Accountancy—হিসাববিদ্যা
Accumulation—সঞ্চয়ন
Accused—অভিযুক্ত
Acknowledge—স্বীকার করা
Acknowledgement—স্বীকার
Acting—ভারপ্রাপ্ত
Active partner— সক্রিয় অংশীদার
Aid—সাহায্য
Aided—সাহায্যপ্রাপ্ত
Airforce—বিমানবাহিনী
Air hostess—বিমানবালা
Airport—বিমানবন্দর
Alias—ওরফে
Air conditioned—শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
Alliance—মৈত্রীজোট
Address—ঠিকানা, ভাষণ
Allotment—বরাদ্দ
Allottee—আবণ্টনপ্রাপ্ত
Allow—মঞ্জুর করা
Allowances—ভাতা
Analysis—বিশ্লেষণ
Address of welcome—অভিভাষণপত্র, সংবর্ধনাপত্র
Ad hoc—অনানুষ্ঠানিক
Ad interim—অন্তর্বর্তীকালীন
Adjournment—মূলতুবি
Administration—প্রশাসন
Administrative—প্রশাসনিক
Administrator—প্রশাসক
Admission—ভর্তি
Admission test—ভর্তি পরীক্ষা
Admit card—প্রবেশপত্র
Adult education—বয়স্কশিক্ষা
Adult suffage—বয়স্ক ভোটাধিকার
Advance—অগ্রিম
Advertisement—বিজ্ঞাপন
Adviser—উপদেষ্টা
Advocate—অ্যাডভোকেট
Aeronautics—বিমানবিদ্যা
Affidavit—শপথপত্র, হলফনামা
Affiliated—সম্বন্ধীকৃত
Agenda—আলোচ্যসূচি
Agreement—চুক্তি
Appraisal—মূল্যায়ন
Apprentice—শিক্ষানবিশ
Approval—অনুমোদন
Approximately—আনুমানিক

Annex—সংলগ্ন, বাড়তি অংশ
Announcement—ঘোষণা
Annual—বার্ষিক
Anonymous—অজ্ঞাতনামা, বেনামি
Apology—ত্রুটিস্বীকার
Appeal—আপিল
Appendix—পরিশিষ্ট
Applicant—আবেদনকারী
Application—আবেদন
Appoint—নিয়োগ করা
Appointed—নিযুক্ত
Appointment—নিয়োগ
Authority—কর্তৃপক্ষ
Author—লেখক
Autonomous—স্বায়ত্তশাসিত
Average—গড়
Attendance—হাজিরা
Architect—স্থপতি
Architecture—স্থাপত্য
Archives—মহাফেজখানা
Arrear—বকেয়া
Art—কলা
Article—অনুচ্ছেদ
Artisan—কারিগর, শিল্পী
Assembly—পরিষদ
Assessee—করদাতা
Assessment—মূল্যায়ন
Asset—পরিসম্পদ
Assistant—সহকারী
Associate—সহযোগী
Association—সংঘ
Atlas—ভূচিত্রাবলি
Attest—প্রত্যয়ন করা, সত্যায়ন করা

B

Ballot—ভোট
Banned—নিষিদ্ধ
Banquet—ভোজসভা
Bargaining—দরকষাকষি
Bilingual—দ্বিভাষী
Birth rate—জন্মহার
Blockade—অবরোধ
Broadcast—সম্প্রচার
Bodyguard—দেহরক্ষী
Bulletin—বুলেটিন
Bonus—বোনাস
Bureau—ব্যুরো, সংস্থা
Bureaucrat—আমলা
Book post—খোলা ডাক
Bearer—বাহক
Bibliography—গ্রন্থবিবরণী
Biennial—দ্বিবার্ষিক
Bilateral—দ্বিপাক্ষিক
Bio-data—জীবনবৃত্তান্ত
Biography—জীবনী
Branch—শাখা
Breach of trust—বিশ্বাসভঙ্গ
Brochure—পুস্তিকা
Bonafide—প্রকৃত
Booking—টিকিট ক্রয়
Bumping—ওঠানামা
Bureaucracy—আমলাতন্ত্র

C

Cabinet—মন্ত্রিপরিষদ
Calculate—হিসাব করা
Calculator—অনুগণক
Calender—পঞ্জিকা
Candidate—প্রার্থী
Call—তলব
Campaign—অভিযান
Chamber—সভাকক্ষ
Chancellor—আচার্য
Chapter—অধ্যায়

Capital—পুঁজি
Caretaker—তত্ত্বাবধায়ক
Cargo—পণ্যবাহী জাহাজ
Casual—নৈমিত্তিক
Casual leave—নৈমিত্তিক ছুটি
Catalogue—তালিকা
Category—পর্যায়
Census—আদমশুমারি
Century—শতাব্দী
Ceramics—মৃৎশিল্প
Certificate—সনদপত্র
Certify—প্রত্যয়ন করা
Code—সংকেত
Cold war—স্নায়ুযুদ্ধ
Collaborator—সহযোগী
Colony—উপনিবেশ
Commentary—ভাষ্য
Commentator—ভাষ্যকার
Community—সম্প্রদায়
Compulsory—বাধ্যতামূলক
Circular—পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি
Circulate—প্রচার করা
Cite—উল্লেখ করা
Citation—উদ্ধৃতি
Claim—দাবি
Clearance—খালাসপত্র
Convoy—বহর
Control—নিয়ন্ত্রণ
Conveyance—পরিবহনে ব্যবহৃত
Conference—সম্মেলন
Copy—প্রতিলিপি
Copyright— গ্রন্থস্বত্ব
Cosmetics—প্রসাধনী
Council—পরিষদ
Condition—শর্ত
Conduct—আচরণ
Confession—স্বীকারোক্তি
Confidential—গোপনীয়
Confirmation—নিশ্চিত প্রমাণ
Consent—সম্মতি

D

Data—উপাত্ত
Debate—বিতর্ক
Decimal—দশমিক
Defunct—লুপ্ত
Degree—মাত্রা, মান, ডিগ্রি, উপাধি
Deligation—প্রতিনিধিবর্গ
Delivery—বিলি, অর্পণ
Directorate—অধিদপ্তর
Discharge—বরখাস্ত, খালাস
Discount—বাটা, পূর্ণমূল্য থেকে কিছু পরিমান ছাড়
Dismiss—পদচ্যুত করা
Disposal—নিষ্পত্তি
Diary—দিনপঞ্জি
Diploma—ডিপ্লোমা, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র
Diplomat—কূটনীতিক
Dipositor—আমানতকারী
Direction—নির্দেশ
Director—পরিচালক
Director General—মহাপরিচালক
Draft—খসড়া
Dual—দ্বৈত
Dummy—প্রতিরূপ
Dividend—লভ্যাংশ
Donor—দাতা

E

Edition—সংস্করণ
Editor—সম্পাদক
Edited—সম্পাদিত
Education—শিক্ষা
Emergency—জরুরি
Emigration—অভিবাসন
Employee—কর্মচারী

Educationist—শিক্ষাবিদ
Efficiency—কর্মদক্ষতা
Election—নির্বাচন
Electorate—নির্বাচকমণ্ডলী
Embargo—অবরোধ
Estimate—মূল্যানুমান, প্রাক্কলন
Examine—পরীক্ষা করা
Examination—পরীক্ষা
Examiner—পরীক্ষক
Excuse—অজুহাত
Exhibition—প্রদর্শনী
Exit—নির্গম
Expulsion—বহিষ্কার
Eye wash—ধোঁকা
Employer—নিয়োগকর্তা
Employment—চাকুরি
Emporium—বাণিজ্যকেন্দ্র
Encyclopeadia—বিশ্বকোষ
Enquiry—তদন্ত, অনুসন্ধান
Enrol—তালিকাভুক্ত করা
Enterpriser—উদ্যোক্তা
Entry—ভুক্তি, জমা, প্রবেশ
Envelope—খাম, লেফাফা
Environment—পরিবেশ
Expenditure—ব্যয়
Expert—বিশেষজ্ঞ
Extra—অতিরিক্ত

F

Fact—ঘটনা, তথ্য
Faculty—অনুষদ
Fair—মেলা
Fair price—ন্যায্য মূল্য
Fare—যাত্রী ভাড়া
Fitness—যোগ্যতা
Ferry—খেয়া, খেয়াঘাট
Figure—অঙ্ক, চিত্র
File—নথি
Founder—প্রতিষ্ঠাতা
Fund—তহবিল

G

Gallary—গ্যালারি
Gist—সারমর্ম
Global—বৈশ্বিক
Godown—গুদাম
Grading—শ্রেণীবিভাগ
Graduate—স্নাতক
Gross total—সর্বমোট
Gate keeper—দ্বাররক্ষী
Gradation—পর্যায়
Grade—ক্রমবিন্যাস
Graded—পর্যায়িত
Gratuity—আনুতোষিক
Gross—মোটমাট
Gymnasium—ব্যায়ামাগার

H

Handicraft—হস্তশিল্প
Handloom—তাঁত
Hawker—ফেরিওয়ালা, হকার
Hoarder—মজুদদার
Holiday—ছুটির দিন
Humidity—আর্দ্রতা
Headline—শিরোনাম
Hearing—শুনানি
Honorarium—সম্মানী
Hostage—জিম্মি
Housing—আবাসন
Humanity—মানবতা

I

Identity—পরিচয়
Inquiry—অনুসন্ধান

Immigrant—অভিবাসী
Illegible—দুষ্পাঠ্য
Illustrated—সচিত্র
In-charge—ভারপ্রাপ্ত
Inspection—পরিদর্শন
Invigilator—পর্যবেক্ষক
Inspectress—পরিদর্শিকা
Intellectual—বুদ্ধিজীবী
Institute—সংস্থা, প্রতিষ্ঠান
Instruction—নির্দেশ
Interim—অন্তর্বর্তীকালীন
Internal—অভ্যন্তরীণ
Interpreter—দোভাষী
Invoice—চালান
Irregular—অনিয়মিত
Issue—প্রেরণ, প্রচারিত

J

Jetty—জেটি
Job—কর্ম, চাকরি
Join—যোগদান করা
Judicial—বিচারিক
Justice—ন্যায়, বিচারক
Journal—পত্রিকা
Judge—বিচারক
Judgement—রায়

L

Layman—অবিশেষজ্ঞ
Leaflet—প্রচারপত্র
Lease—ইজারা
Leave—ছুটি
Lecture—বক্তৃতা
Lecturer—প্রভাষক
Legal—বৈধ
Literate—সাক্ষর
Loan—ঋণ
Lump—থোক
Liability—দায়
Liaison—সংযোগ
Lien—পূর্বস্বত্ব
Limited—সীমাবদ্ধ
Linguist—ভাষাতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ
List—সূচি, তালিকা
Literal—আক্ষরিক
Lobbing—তদবির
LPR- Leave preparatory to retirement—অবসরপ্রস্তুতি মূলক ছুটি

M

Mail—ডাক
Mailtrain—ডাকগাড়ি
Makeup—রূপসজ্জা
Map—মানচিত্র
Mass-education—গণশিক্ষা
Mass Media—গণমাধ্যম
Maternity—মাতৃসদন
Measure—মাপ
Mandate—আজ্ঞা
Manifesto—ইশতেহার
Memo—স্মারক
Mission—মিশন
Minimum—লঘিষ্ঠ, ন্যূনতম
Miscellaneous—বিবিধ
Mediator—মধ্যস্থ
Medium—মাধ্যম

O

On demand—চাহিবামাত্র
On deputation—প্রেষণে
Option—ইচ্ছা
Organization—সংগঠন
Optional—ঐচ্ছিক
Order—আদেশ
Ordinary—সামান্য, মামুলি
Out-post—ফাঁড়ি

Original—মূল
Out-door—বহিস্থ
Overtime—ওভারটাইম, অধিকাল

P

Package—মোড়ক
Paid—পরিশোধিত
Pamhplet—পুস্তিকা
Para—অনুচ্ছেদ
Paragraph—অনুচ্ছেদ
Parallel—সমান্তরাল
Panel—নামসূচি
Permission—অনুমতি
Payslip—বেতনপত্র
Penalty—দণ্ড, শাস্তি
Pending—মূলতবি
Pen-picture—লেখচিত্র
Permit—অনুমতিপত্র
Petition—দরখাস্ত
Percent—শতকরা
Per diem—দৈনিক
Phase—পর্ব
Photograph—আলোকচিত্র, ফটো
Photoprint—ফটো ছাপা
Press—সংবাদপত্র, ছাপাখানা
Price list—মূল্য-তালিকা
Primary—মুখ্য, প্রাথমিক
Printer—মুদ্রাকর
Private—ব্যক্তিগত, বেসরকারি
Parity—সমতা
Passport—ছাড়পত্র
Picnic—বনভোজন
Poll—ভোট গ্রহণ
Pollution—দূষণ
Population—জনসংখ্যা
Portfolio—দফতর
Post office—ডাকঘর
Postage—ডাকমাশুল
Post Box—ডাকবাক্স
Poster—প্রাচীরপত্র
Precis—সারমর্ম
Preface—ভূমিকা
Preference—অগ্রাধিকার
Profession—পেশা, বৃত্তি
Profile—পার্শ্বচিত্র
Prohibited—নিষিদ্ধ
Proposal—প্রস্তাব
Provision—বিধান
Please Turn Over (PTO) পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
Publicity—প্রচার
Purchase—ক্রয়
Put up—পেশ করা

Q

Quality—গুণ, উপযোগিতা
Query—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন
Queue—সারি
Questionnaire—প্রশ্নমালা
Question-answer method—প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি
Question book—প্রশ্ন-পুস্তিকা
Quorum—প্রয়োজনীয় গণপূর্তি
Quarter—চতুর্থাংশ
Quota—যথাংশ
Quote—উদ্ধৃত করা
Quotation—উদ্ধৃতি

R

Rank—পদমর্যাদা
Rate—হার
Ratio—অনুপাত
Receipt—রসিদ
Reform—সংস্কার
Region—অঞ্চল

Register—খাতা, নিবন্ধ
Registered—নিবন্ধিত
Regular—নিয়মিত
Rehearsal—মহড়া
Release—মুক্তি
Report—প্রতিবেদন
Reporter—প্রতিবেদক
Reprint—পুনর্মুদ্রণ
Resident—আবাসিক, আবাসী
Rural—গ্রামীণ
Regional—আঞ্চলিক
Reminder—তাগিদ
Remit—প্রেরণ করা
Remittance—প্রেরণ
Renewal—নবায়ন
Retail—খুচরা
Retired—অবসরপ্রাপ্ত
Retirement—অবসর
Roll—তালিকা, পঞ্জি
Routine—রুটিন

S

Salary—বেতন
Sale—বিক্রয়
Salinity—লবণাক্ততা
Sample—নমুনা
Sanction—অনুমোদন, মঞ্জুরি
Satellite—উপগ্রহ
Schedule—তফসিল, তলিকা, সময়সূচি
Screening—বাছাই
Scrutiny—সমীক্ষা, নিরীক্ষা
Saving—সঞ্চয়
Secondary—মাধ্যমিক
Secretariat—সচিবালয়
Seminar—সেমিনার
Session—অধিবেশন
Skill—দক্ষতা
Society—সমাজ
Speaker—স্পিকার
Specimen—নমুনা
Spokesman—মুখপাত্র
Sponsor—পোষক
Seasonal—মৌসুমি
Script—লিপি
Secretary—সচিব, সম্পাদক
Stock—মজুদ

T

Table—সারণী, তালিকা
Technical—কারিগরি
Technology—প্রযুক্তিবিদ্যা
Telegraph—তার
Tradition—ঐতিহ্য
Traditional—ঐতিহাসিক
Trained—প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Transport—পরিবহন
Theory—তত্ত্ব, মত
Term—শর্ত, শব্দ, পদ
Terminology—পরিভাষা
Testimonial—প্রশংসাপত্র
Test—পরীক্ষা, অভীক্ষা
Transfer—বদলি
Translation—অনুবাদ
Travel—ভ্রমণ

U

Unanimous—সর্বসম্মত
Uniform—উর্দি
Urgent—জরুরি
Universal—বিশ্বজনীন
Urban—পৌর

V

Valid—বৈধ
Vide—দ্রষ্টব্য

Venue—স্থান
Verify—প্রতিপাদন
Via—মাধ্যমে, পথ দিয়ে
Volunteer—স্বেচ্ছাসেবক
Violation—লঙ্ঘন
Viva Voce—মৌখিক পরীক্ষা
Volume—আয়তন, খণ্ড
Voucher—রসিদ

W

Wages—মজুরি
Wholesale—পাইকারি
White paper—শ্বেতপত্র

Y

Yard—অঙ্গন
Yearly—বার্ষিক

Z

Zonal—আঞ্চলিক
Zoo—চিড়িয়াখানা
Zone—অঞ্চল

অনুশীলনমূলক কাজ

১. পরিভাষা বলতে কী বোঝ?
২. পরিভাষা তৈরির সময় কোন কোন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়?
৩. পরিভাষা, প্রতিশব্দ ও অনূদিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
৪. নিচের কোন শব্দটি পরিভাষা?
   ক. প্রতিবেদন
   খ. প্রত্যয়
   গ. প্রতিশ্রুতি
   ঘ. প্রত্যেক
৫. Syllabus শব্দের পরিভাষা কোনটি?
   ক. পাঠক্রম
   খ. পাঠ্যবস্তু
   গ. পাঠ্যসূচি
   ঘ. পাঠ
৬. নিচের শব্দগুলোর পরিভাষা লেখ।
   Adult, Biography, Botany, Booklet, Calender, Terminal, Effective, Principal, Class-room, Terminology, Test, Vocabulary, Advisor.
৭. নিচের যে-বাক্যে পরিভাষার যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে সেখানে (√) টিক চিহ্ন দাও আর যে-যে বাক্যে যথার্থ প্রয়োগ হয়নি সেসব বাক্যে (x) ক্রস চিহ্ন দাও।
   আমাদের পাঠক্রম (Syllabus) বেশ দীর্ঘ।
   ইংরেজি Term শব্দ থেকে পরিভাষা শব্দের উৎপত্তি।
   তিনি তিন দিন যাবৎ হাসপাতালে (Hospital) শয্যাশায়ী।
   আমাদের শ্রেণীকক্ষ (Class-room) বেশ প্রশস্ত।
   এখন বিশ্বায়নের (Globalization) যুগ।
   খবরটি বেতারে সম্প্রচারিত (Broadcast) হয়েছে।
   তিনি আমাদের দলনেতা (Team leader)।
   আমাদের জ্ঞানভিত্তিক (Knowledge based) সমাজ গড়তে হবে।
   তিনি গণিতের (Mathemetics) শিক্ষক।
   ছেলেটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (Blind)।
   পরিবেশ (Environment) বাঁচাতে হলে অধিক বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
৮. নিচের প্রতিষ্ঠানগুলোর পারিভাষিক রূপ লেখ:
   Bangladesh Academy for Rural Development
   Bangladesh Naval Head Quarter
   Bangladesh Road Transport Corporation
   Bangladesh School Text Book Board
   Directorate of Family Planning
   National Board of Revenue
   Bangladesh National Assembly
   Ministry of Home
   Directorate of Housing
   Ministry of Primary & Mass Education
   Directorate of Social Welfare
   External Resource Division
   National Curriculum Development Centre

বিপরীতার্থক শব্দ

১. 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা।'

২. 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর?'

৩. 'ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।'

৪. 'অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সাবধানী পাঠক।'

৫. 'বাহিরে যাহার হাসির ছটা অন্তরে তার চোখের জল।'

৬. ভালো মন্দ বিচার করে কাজ করতে হবে।

উপরের কবিতাংশ ও বাক্যগুলোতে কালো, স্বর্গ, ঢিলটি, অগ্র, বাহিরে, ভালো শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ হল— ধলো, নরক, পাটকেলটি, পশ্চাৎ, অন্তরে, মন্দ। পূর্ববর্তী শব্দের বিপরীত অর্থবোধক এই শব্দগুলো বিপরীতার্থক শব্দ। বাংলা ভাষায় এরকম প্রচুর বিপরীত শব্দ রয়েছে। ইংরেজি ভাষায় বিপরীত শব্দকে Antonym বলে।
ভাষার শব্দসম্ভার বৃদ্ধি, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি ও ভাষার সৌন্দর্য সাধনের জন্য যে-কোনো ভাষায় বিপরীত শব্দ গুরুত্বপূর্ণ।

বিপরীত শব্দ গঠনের কতগুলো সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন—

ক. উপসর্গ যোগ করে

অনুকূল	—	প্রতিকূল
উত্তম	—	অধম
উত্তীর্ণ	—	অনুত্তীর্ণ
চেনা	—	অচেনা
লোভী	—	নির্লোভ

খ. পৃথক শব্দ ব্যবহার করে

খাঁটি	—	ভেজাল
জন্ম	—	মৃত্যু
সৃষ্টি	—	প্রলয়
সত্য	—	মিথ্যা
জ্ঞানী	—	মূর্খ

গ. বিদেশি শব্দের বিপরীত শব্দ গঠন। এ ধরনের শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। যেমন—

ইজ্জত	—	বেইজ্জত
দোস্ত	—	দুশমন
এগানা	—	বেগানা
জমা	—	খরচ
খুশি	—	অখুশি
জায়েজ	—	নাজায়েজ
দরদ	—	বেদরদ
কসুর	—	বেকসুর

ঘ. অন্য উপসর্গের জায়গায় নির্ (নিঃ) উপসর্গ যোগ করে। যেমন—

আসক্ত — নিরাসক্ত
আশ্রয় — নিরাশ্রয়
লোভী — নির্লোভ
অপরাধী — নিরপরাধ

ঙ. অন্য উপসর্গের জায়গায় স উপসর্গ ব্যবহার করে। যেমন—

অসীম — সসীম
নির্দয় — সদয়
দুর্বল — সবল

চ. বিপরীত অবস্থাবাচক উপসর্গ ব্যবহার করে। যেমন—

উত্তীর্ণ — অনুত্তীর্ণ
অনুকূল — প্রতিকূল
দুর্বল — প্রবল
দুর্জন — সুজন
কুরুচি — সুরুচি

ছ. আলাদা শব্দ ব্যবহার করে। যেমন—

আয় — ব্যয়
ইতর — ভদ্র
জমা — খরচ
দেনা — পাওনা
সত্য — মিথ্যা

নিচে বিপরীত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অ			
অকর্মক	সকর্মক	অনুকূল	প্রতিকূল
অকারণ	সকারণ	অধম	উত্তম
অক্রিয়	সক্রিয়	অনুক্ত	উক্ত
অম	সম	অঢেল	সামান্য
অগ্র	পশ্চাৎ	অনন্ত	আদি
অগ্রগতি	পশ্চাদ্‌গতি	অদৃশ্য	দৃশ্য
অগ্রজ	অনুজ	অভিজাত	অনভিজাত
অগ্রিম	বকেয়া	অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ
অচল	সচল	অভিপ্রেত	অনভিপ্রেত
অবোধ	সুবোধ	অভিমানী	নিরভিমান
অভ্যস্ত	অনভ্যস্ত	অন্ত	অনন্ত
অমৃত	গরল	অন্তর	বাহির
অলজ্জ	সলজ্জ	অবাক	সবাক
অল্প	অধিক/বহু	অপযশ	সুযশ
অনুরাগ	বিরাগ	অপুষ্পক	সপুষ্পক

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অপ্রতিভ	সপ্রতিভ	অন্ত্য	আদ্য
অফলা	সুফলা	অনুজ	অগ্রজ
অপরাধী	নিরপরাধ	অজ্ঞ	বিজ্ঞ
অবলা	সবলা	অণু	বৃহৎ
অর্পণ	গ্রহণ	অল্প	বিস্তর
অমর	মর	অলীক	সত্য

আ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
আকাশ	পাতাল	আত্মীয়	অনাত্মীয়
আরম্ভ	সমাপ্ত	আদব	বেয়াদব
আচার	অনাচার	আমদানি	রপ্তানি
আদান	প্রদান	আনন্দ	নিরানন্দ
আশা	নিরাশা	আনয়ন	প্রেরণ
আসল	নকল	আপন	পর
আয়	ব্যয়	আবরু	বে-আবরু
আবির্ভাব	তিরোভাব	আবশ্যক	অনাবশ্যক
আর্দ্র	শুষ্ক	আকার	নিরাকার
আদর	অনাদর	আস্তিক	নাস্তিক
আবাহন	বিসর্জন	আলো	অন্ধকার
আমিষ	নিরামিষ	আংশিক	সম্পূর্ণ
আরম্ভ	শেষ/সমাপ্তি	আগম	নির্গম
আস্থা	অনাস্থা	আসক্ত	অনাসক্ত
আবৃত	অনাবৃত	আদৃত	অনাদৃত
আরোহণ	অবরোহণ	আজ	কাল
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আহূত	অনাহূত
আকার	নিরাকার	আগত	অনাগত
আগমন	গমন, নির্গমন	আত্ম	পর
আগা	গোড়া	আয়ত্ত	অনায়ত্ত
আচার	অনাচার	আবাদি	অনাবাদি
আড়ি	ভাব		

ই

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ইতর	ভদ্র	ইতি	আরম্ভ
ইহলোক	পরলোক	ইহলোক	পরলোক
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ইতি	সূচনা
ইষ্ট	অনিষ্ট		

ঈ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ঈষৎ	প্রচুর	ঈদৃশ	তাদৃশ
ঈপ্সা	অনীহা		

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
উ			
উদ্ধত	বিনীত	উত্তম	অধম
উপকার	অপকার	উত্তমর্ণ	অধমর্ণ
উদয়	অস্ত	উক্তি	প্রত্যুক্তি
উন্নত	অবনত	উত্থান	পতন
উন্নতি	অবনতি	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উষ্ণ	শীতল	উজ্জ্বল	ম্লান
উচিত	অনুচিত	উত্তম	অধম
উঁচু	নিচু	উক্ত	অনুক্ত
উপস্থিত	অনুপস্থিত	উদার	সংকীর্ণ
উজান	ভাটি	উপকারী	অপকারী
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	উদ্দিষ্ট	নিরুদ্দিষ্ট
উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট	উর্বর	অনুর্বর
ঊ			
ঊষা	সন্ধ্যা	ঊহ্য	স্পষ্ট
ঊর্ধ্ব	অধঃ	ঊর্ধ্বতন	অধস্তন
ঊষর	উর্বর	ঊন	বেশি
ঋ			
ঋজু	বক্র	ঋণী	অঋণী
এ			
এঁড়ে	বকনা	এপার	ওপার
একাল	সেকাল	একপদী	বহুপদী
একান্ন	পৃথগন্ন	এস্‌পার	ওস্‌পার
ঐ			
ঐক্য	অনৈক্য	ঐহিক	পারত্রিক
ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য		
ও			
ওলট	পালট		
ঔ			
ঔদ্ধত্য	বিনয়		
ক			
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	কুশ্রী	সুশ্রী
কাঁচা	পাকা	কৃতকার্য	অকৃতকার্য
কঠিন	কোমল	কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ/কৃতঘ্ন
কুটিল	সরল	কৃত্রিম	অকৃত্রিম/স্বাভাবিক
কুৎসিত	সুন্দর	কৃশ	স্থূল
কুফল	সুফল	কৃষ্ণ	শুভ্র

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ক্রয়	বিক্রয়	কৃতি	অকৃতি
কোমল	কঠিন	ক্রেতা	বিক্রেতা
কুলীন	অন্ত্যজ	কঠিন	কোমল
কলুষ	নিষকলুষ	কৃতঘ্ন	কৃতজ্ঞ
কান্না	হাসি	কেনা	বেচা
কম	বেশি	কাছে	দূরে
খ			
খণ্ড	অখণ্ড	খোলা	ঢাকা
খাতক	মহাজন	খ্যাতি	অখ্যাতি
খুঁত	নিখুঁত	খাঁটি	ভেজাল
খুচরা	পাইকারি	খালি	ভর্তি
খরচ	জমা	খাদ্য	অখাদ্য
খোলা	বন্ধ		
গ			
গতি	স্থিতি	গোপন	প্রকাশ
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গরল	অমৃত
গুপ্ত	ব্যক্ত	গোচর	অগোচর
গুরু	লঘু	গূঢ়	ব্যক্ত
গেঁয়ো	শহুরে	গ্রাহ্য	অগ্রাহ্য
গ্রহণ	বর্জন	গৃহীত	বর্জিত
গুণ	দোষ	গত	অনাগত
গৃহী	সন্ন্যাসী		
ঘ			
ঘন	তরল	ঘরে	বাইরে
ঘাট	অঘাট	ঘটন	অঘটন
ঘাটতি	বাড়তি	ঘোলা	স্বচ্ছ
ঘাত	প্রতিঘাত	ঘর	বাহির
চ			
চড়াই	উতরাই	চলা	থামা
চঞ্চল	স্থির	চটুল	গম্ভীর
চতুর	বোকা	চলন্ত	নিশ্চল
চেতন	অচেতন	চির	অস্থায়ী
		চেনা	অচেনা
ছ			
ছোট	বড়	ছুটি	বন্ধ
		ছায়া	রৌদ্র
জ			
জড়	চেতন	জাতীয়	বিজাতীয়
জন্ম	মৃত্যু	জীবন	মরণ
জয়	পরাজয়	জোয়ার	ভাটা

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
জ্যেষ্ঠ	কনিষ্ঠ	জীব	জড়
জাগ্রত	নিদ্রিত	জীবন্ত	মৃত
জোড়	বিজোড়	জাত	অজাত
জ্ঞানী	মূর্খ	জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়
জঙ্গম	স্থাবর	জমা	খরচ
জটিল	সরল	জৈব	অজৈব
জ্বলন্ত	নিভন্ত	জ্ঞাত	অজ্ঞাত
জীবন	মরণ	জল	স্থল
ঝ			
ঝাল	মিষ্টি		
ট			
টাটকা	বাসি	টক	মিষ্টি
ঠ			
ঠুনকো	মজবুত	ঠান্ডা	গরম
ঠিক	বেঠিক		
ড			
ডান	বাম	ডোবা	ভাসা
ঢ			
ঢাকা	খোলা	ঢের	অল্প
ঢালু	সমতল		
ত			
তিক্ত	মধুর	ত্যাগ	গ্রহণ
তুষ্ট	রুষ্ট	তরুণ	বৃদ্ধ
ত্যাগ	ভোগ	তাপ	শৈত্য
তৃপ্তি	অতৃপ্তি	তিমির	আলোক
তরল	কঠিন	তিরস্কার	পুরস্কার
তাজা	বাসি		
দ			
দিন	রাত	দাতা	গ্রহীতা
দীর্ঘ	হ্রস্ব	দুরন্ত	শান্ত
দুর্জন	সুজন	দয়ালু	নির্দয়
দুর্গম	সুগম	দেনা	পাওনা
দুর্দিন	সুদিন	দুর্ভাগ্য	সৌভাগ্য
দুর্বল	সবল	দিবস	রজনী
দুর্লভ	সুলভ	দুষ্কর	সুকর
দ্যুলোক	ভূলোক	দেশি	বিদেশি
দূর	নিকট	দিবা	নিশি/রাত্রি
দুষ্কৃতি	সুকৃতি	দুঃখ	সুখ
দ্রুত	মন্থর	দুষ্ট	শিষ্ট
দৃশ্য	অদৃশ্য	দক্ষ	অদক্ষ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ধ			
ধরা	সরা	ধীর	অধীর
ধনী	গরিব	ধীর	চঞ্চল
ধারালো	ভোঁতা	ধৈর্য	অধৈর্য
ধনী	নির্ধন		
ন			
নকল	আসল	নম্র	উদ্ধত
নগদ	বাকি	নিদ্রা	জাগরণ
নরম	শক্ত	ন্যায়	অন্যায়
নবীন	প্রবীণ	নন্দিত	নিন্দিত
নিঃশব্দ	সশব্দ	নির্দয়	সদয়
নিন্দা	প্রশংসা	দেশি	বিদেশি
নিয়ম	অনিয়ম	দিবা	নিশি/রাত্রি
নির্জীব	সজীব	দুঃখ	সুখ
নির্বাপিত	প্রজ্বলিত	দুষ্ট	শিষ্ট
নিশ্চল	সচল	দক্ষ	অদক্ষ
নীরস	সরস	নির্ভয়	ভয়
নতুন	পুরাতন	ন্যায়	অন্যায়
নৈতিক	অনৈতিক	নিজ	অপর
নিরাকার	সাকার	নশ্বর	অবিনশ্বর
নিরক্ষর	সাক্ষর		
প			
পটু	অপটু	পূর্ণিমা	অমাবস্যা
পক্ব	অপক্ব	পূর্ণ	শূন্য
পরিমিত	অপরিমিত	পন্ডিত	মূর্খ
পরাজয়	বিজয়	পুষ্ট	ক্ষীণ
পাপ	পুণ্য	প্রভু	ভৃত্য
পতন	উত্থান	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
পূর্ব	পশ্চিম	প্রসন্ন	বিষণ্ন
পাকা	কাঁচা	পাশ	ফেল
প্রকাশ্য	গোপন	পানীয়	অপেয়
প্রাচ্য	প্রতীচ্য	পরাহ্ণ	পূর্বাহ্ণ
প্রিয়	অপ্রিয়	প্রকৃষ্ট	নিকৃষ্ট
প্রশ্ন	উত্তর	প্রথম	শেষ
প্রশংসা	নিন্দা		
ব			
বন্ধন	মুক্ত	বন্ধু	শত্রু
ব্যক্ত	অব্যক্ত	বৈধ	অবৈধ
বিশ্রী	সুশ্রী	ব্যর্থ	সফল
বিরত	অবিরত	বিফল	সফল

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
বিপক্ষ	সপক্ষ	বিষ	অমৃত
বিপথ	সুপথ	ব্যর্থ	সার্থক
বিরস	সরস	বিধি	নিষেধ
বিলম্ব	ত্বরা	বিজ্ঞ	অজ্ঞ
বৈতনিক	অবৈতনিক	বিরল	বহুল
ভ			
ভীরু	সাহসী	ভালো	মন্দ
ভুল	ঠিক/নির্ভুল	ভুক্ত	অভুক্ত
ম			
মহৎ	নীচ	মান	অপমান
মুখ্য	গৌণ	মিথ্যা	সত্য
মৃত	জীবিত	মিত্র	শত্রু
মৌন	মুখর	মন্দ	ভালো
মঙ্গল	অমঙ্গল	মূর্ত	বিমূর্ত
মিল	অমিল		
য			
যত্ন	অযত্ন	যৌথ	একক
যোগ	বিয়োগ	যশ	অপযশ
র			
রুগ্ণ	সুস্থ		
ল			
লাভ	লোকসান	লঘু	গুরু
লাভ	ক্ষতি		
শ			
শান্ত	অশান্ত	শালীন	অশালীন
শিষ্ট	অশিষ্ট	শুভ	অশুভ
শুরু	শেষ/ইতি	শ্রী	বিশ্রী
শত্রু	মিত্র	শুচি	অশুচি
স			
সজ্জন	দুর্জন	স্মৃতি	বিস্মৃতি
সৎ	অসৎ	সরস	নীরস
সদর	অন্দর	স্বর্গ	নরক
সফল	বিফল	সুখ	দুঃখ
সম	অসম/বিষম	সমাপ্ত	অসমাপ্ত
স্বদেশ	বিদেশ	সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
স্বাধীন	পরাধীন	সৃষ্টি	প্রলয়
সরকারি	বেসরকারি	স্থির	অস্থির/চঞ্চল
সুপ্ত	জাগ্রত	স্বপক্ষ	বিপক্ষ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
সূক্ষ্ম	স্থূল	সম্ভব	অসম্ভব
সত্য	মিথ্যা	সক্ষম	অক্ষম
সার	অসার	সরব	নীরব
সুধা	গরল	সুষম	অসম
সুলভ	দুর্লভ	স্বার্থ	পরার্থ
সমাপ্ত	আরম্ভ	সুশীল	দুঃশীল
স্তুতি	নিন্দা	সরু	মোটা
সুগম	দুর্গম	সশস্ত্র	নিরস্ত্র
সুস্থ	অসুস্থ		
হ			
হরদম	কদাচিৎ	হাসি	কান্না
হাজির	গরহাজির	হাল	সাবেক
হুঁশ	বেহুঁশ	হর্ষ	বিষাদ
হালকা	ভারী	হার	জিত
হ্রস্ব	দীর্ঘ	হাত	বেহাত
হ্রাস	বৃদ্ধি		
ক্ষ			
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	ক্ষুণ্ন	অক্ষুণ্ন
ক্ষয়	বৃদ্ধি	ক্ষিপ্ত	শান্ত
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু	ক্ষীণ	পুষ্ট
ক্ষতি	লাভ		

অনুশীলনমূলক কাজ

১. বিপরীতার্থক শব্দ বলতে কী বোঝ?

২. বাংলা ভাষায় বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা কেন?

৩. বিপরীতার্থক শব্দ গঠনের দুটি নিয়ম বল।

৪. নিচের বাক্যগুলোর খালি জায়গায় বিপরীত শব্দ বসাও।

(১) রোগীটি অচেতন কি— বোঝা যাচ্ছে না।
(২) ন্যায়— বুঝে কাজ করবে।
(৩) চেইনটি আসল সোনার মনে হলেও আসলে— ।
(৪) চেহারা দেখে কে বিদ্বান কে— নির্ণয় করা যায় না।
(৫) প্রতিযোগিতায় জয়— দুটিকে মেনে নিতে হবে।
(৬) সাক্ষর হলেই শিক্ষিত আর— হলেই অশিক্ষিত এ ধারণা ঠিক নয়।
(৭) অনেক চড়াই— পার হয়ে জীবনে চলতে হয়।

৫. নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লেখ।
অনুজ, অমৃত, আচার, আযান, উজান, উচিত, ঐক্য, এঁড়ে, ঈষৎ, কাজ, কৃত্রিম, খরচ, গুপ্ত, খাতক, খোলা, জোড়, চতুর, চেতন, তাপ, তরল, টাটকা, দেশি, পটু, সরস, প্রশ্ন, নবীন, নতুন, ওস্তাদ, হাল, শুরু, মিল, শুভ, শিক্ষা, সফল।

৬. নিচের কোন কোন বাক্যে বিপরীতার্থক শব্দের যথার্থ ব্যবহার হয়েছে (√) টিক চিহ্ন দিয়ে দেখাও।
(১) মন্দের ভালো আর ভালোমন্দ এক কথা নয়।
(২) ঢিলটি মারলে গুঁতো খেতে হয়।
(৩) অগ্র-পেছন বিবেচনা করে কাজ করা উচিত।
(৪) সরকারি ও অসরকারি সর্বত্র একই নিয়ম চালু আছে।
(৫) আসমান-পাতাল সবই স্রষ্টার সৃষ্টি।
(৬) মানুষের ব্যবহারে বোঝা যায় কে লোভী আর কে নির্লোভী।
(৭) অপরাধী আর নিরাপরাধী সব সময় চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

৭. নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য লেখ :
আত্মীয়, পাশ, জোয়ার, হুঁশ, স্থাবর, শুভ।

বাক্যে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ

(১) উঁচু নিচু রাস্তা দেখে পার হবে।
(২) 'তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন?'
(৩) ঐক্য মানুষের মধ্যে শক্তি যোগায়, অনৈক্য বিভেদ সৃষ্টি করে।
(৪) ধনী গরিব সবার জন্য তার দুয়ার খোলা।
(৫) এ নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়।
(৬) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দোষ-গুণ দু-ই রয়েছে।
(৭) আয় বুঝে ব্যয় করবে।
(৮) অর্থই অনর্থের মূল।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

৮. নিচের ঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন দাও :

(১) 'অন্তর' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. বহির্মুখ খ. বাহির
গ. বহির্গামী ঘ. বহিস্থ

(২) 'আদি' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. অনাদি খ. অন্ত
গ. আদিম ঘ. আদ্যন্ত

(৩) 'ঘাত' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. প্রত্যাঘাত খ. প্রতিঘাত
গ. আঘাত ঘ. ব্যাঘাত

(৪) 'সদর' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. অন্দর খ. বাহির
গ. ভিতর ঘ. অন্তর

(৫) 'ভাঙা' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. গড়া খ. শেষ
গ. ভঙ্গুর গ. গঠন

প্রবাদ ও প্রবচন

প্রবাদ : মানবসমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনসত্যের স্মারক কোনো জনপ্রিয় বিদ্রূপাত্মক সংক্ষিপ্ত উক্তিকে প্রবাদ বলে। প্রবাদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমাজের অভিজ্ঞতার ইতিহাস সংহতভাবে যুক্ত থাকে। বিভিন্ন দেশের লোকসমাজ সাধারণত প্রবাদ তৈরি করে থাকে। এবং তা পরবর্তী পর্যায়ে বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রবাদ লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান। এখানে সামাজিক জীবনের গৃহচিত্র পাওয়া যায় অনেক সময়।

প্রবচন : প্রবাদ ও প্রবচন প্রায় একই অর্থে এবং পাশাপাশি ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রবাদ লোকসমাজের সৃষ্টি বা কালের সৃষ্টি। এর কোনো লিখিত ভিত্তি নেই। লোকশ্রুতি বা জনশ্রুতির মাধ্যমে বংশপরম্পরায় তা বাহিত হতে থাকে। একক কোনো ব্যক্তি এর রচয়িতা হিসেবে দাবি করতে পারে না। অন্যদিকে প্রবচন হল প্রজ্ঞাবান, মননশীল বা সৃজনশীল ব্যক্তির অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সৃষ্টি। তাদের নামেই এগুলো পরিচিত হয়ে থাকে। কবি ও সাহিত্যিক, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ এর রচয়িতা বা উদ্ভাবক। এক কথায় প্রবাদ লোকসমাজের অভিজ্ঞতার নির্যাস। অন্যদিকে প্রবচন ব্যক্তিগত প্রতিভার দ্বারা সৃষ্ট বাক্যাংশ বা বাক্য। তবে, প্রবচন একসঙ্গে জনসমাজের অধিকারে চলে আসে।

প্রবচনের কয়েকটি উদাহরণ

পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে।	কবি কঙ্কণ চণ্ডী
নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?	ভারতচন্দ্র
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?	রামনিধি গুপ্ত
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।	কাশীরাম দাস
বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবাদ-প্রবচনের বৈশিষ্ট্য: প্রবাদ প্রবচন প্রতিটি ভাষার অমূল্য সম্পদ। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনাচরণে প্রবাদ-প্রবচন সমৃদ্ধ একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে বাঙালির জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার, বিশ্বাস ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ-প্রবচনের সংক্ষিপ্ত বাক্যে একটি জাতির নানান বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে। প্রবাদে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা হল :

ক. **অর্থব্যঞ্জনা :** প্রবাদের অর্থ গভীর ও তাৎপর্যময়। এর তীক্ষ্ণ অর্থভেদী মন্তব্য শ্রোতা বা পাঠককে সহজে সচকিত করে তোলে। এর শব্দার্থ নয়, রূপক অর্থই গুরুত্বপূর্ণ।

খ. **অভিজ্ঞতার নির্যাস :** প্রবাদের শক্তি হলো অভিজ্ঞতা। লোকসমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সারৎসার থাকে প্রবাদে। যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যোগ হয়।

গ. **সরল প্রকাশভঙ্গি :** প্রবাদ সহজ-সরল হওয়ার কারণে তা সহজে শ্রোতার মনে সাড়া জাগায়। প্রবাদের আলংকারিক গুণ রয়েছে বলে মানুষ তা সহজে ভুলে যায় না। সাধারণত ছন্দ ও অন্ত্যমিলের জন্য বা কখনও উপযুক্ত অনুষঙ্গের জন্য প্রবাদ দীর্ঘদিন মানুষের মনে থাকে। যেমন—

১. অর্থ অনর্থের মূল

২. কাজের সময় কাজি
কাজ ফুরালে পাজি।

প্রবাদের শ্রেণিবিভাগ : অর্থদ্যোতকতার দিক বিবেচনা করে প্রবাদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. সাধারণ অভিজ্ঞতাবাচক : কান টানলে মাথা আসে, অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।

খ. নীতিমূলক : চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

গ. সমালোচনামূলক : উচিত কথায় মামা বেজার।

ঘ. সামাজিক রীতিবিষয়ক : মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ইত্যাদি।

ঙ. ব্যঙ্গাত্মক : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, ঠেলার নাম বাবাজি।

কিছু প্রবাদের অর্থসহ উদাহরণ নিচে সন্নিবেশ করা হল

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর	নিজের অধিকারের বাইরে যাওয়া।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ	ভক্তির আতিশয্যে গোপন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস।
সবুরে মেওয়া ফলে	ধৈর্য ধরলে কাজে সাফল্য আসে।
যার নুন খাই তার গুণ গাই	উপকারীর উপকার করা।
নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা	অকর্মণ্যতার ফলে ব্যর্থতার জন্য অপরকে দোষারোপ করা।
দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ	সকলে মিলেমিশে কাজ করে ব্যর্থ হলেও তাতে লজ্জা নেই।
যার লাঠি তার মাটি	যার শক্তি আছে সে-ই দখল পায়।
সস্তার তিন অবস্থা	অল্পমূল্যের জিনিস খারাপ হয়।
রথ দেখা কলা বেচা	এক সাথে দুইটি কাজ করা।
যত গর্জে তত বর্ষে না	আড়ম্বর অনুসারে কার্য না হওয়া।
মশা মারতে কামান দাগা	সামান্য কাজে বড় আয়োজন করা।
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা	নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে তারপর অন্য কথা।
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদাপদ একবারই আসে না।
চক চক করলেই সোনা হয় না	আসল না খাঁটি, তা চেহারা দেখে বোঝা যায় না।
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়	যেখানে মন্দের ভাগ বেশি।
লোম বাছতে কম্বল উজাড়	ভলো কিছু নির্বাচন করা কঠিন।

প্রবাদ ও প্রবচন

দশের লাঠি একের বোঝা	কোনো কাজ একার পক্ষে করা কঠিন, কিন্তু দশজনের পক্ষে খুব সহজ।
উলুবনে মুক্তা ছড়ানো	অযোগ্য পাত্রে দান করা।
অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট	অকারণে অনেক লোকের অংশগ্রহণে কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
অভাবে স্বভাব নষ্ট	অভাব হলে ভালো মানুষও অসৎ হয়।
ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়	অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়।
অতি চালাকের গলায় দড়ি	বেশি চালাকি করে অপরকে ঠকালে নিজেকেও বিপদগ্রস্ত হতে হয়।
যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা	যাকে অপছন্দ তার প্রত্যেক কাজই ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়।
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে	শেষ অবধি সত্য উদ্ঘাটিত হয়।
বিনা মেঘে বজ্রপাত	হঠাৎ বিপদ উপস্থিত।
শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল	দুষ্টের সহায়ক দুষ্ট লোক।
নেড়া দুবার বেলতলায় যায় না	মানুষ একবারই ঠকে, বারবার ঠকে না।
চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী	অসৎ ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেও সে সৎ হয় না।
কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালে পাজি	কাজ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা কিন্তু কাজ শেষ হলে খোঁজখবর না নেওয়া।
খাল কেটে কুমির আনা	নিজের দোষে বিপদ ডেকে আনা।
অতিদর্পে হত লংকা	অহংকার করলে পতন অনিবার্য।
পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়	অসৎ পথে উপার্জিত ধন কুপথে নষ্ট হয়।
অল্পবিদ্যা ভয়ংকর	অল্প লেখাপড়া জানা ব্যক্তির অতিদর্প।
অর্থই অনর্থের মূল	অর্থ দ্বারাই যত রকমের হাঙ্গামার সৃষ্টি।
পেটে খেলে পিঠে সয়	লাভের আশায় দুঃখকষ্ট সহ্য করা।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো	ছোটখাটো ব্যাপারে নিয়মের কড়াকড়ি কিন্তু বড় বিষয়ে উদাসীন।
বামন হয়ে চাঁদে হাত	অতি ছোট ব্যক্তির বড় আকাড়া।
কপালগুণে গোপাল ঠাকুর	ভাগ্য ভালো থাকলে অযোগ্য ব্যক্তিও বড় হয়।
সাপের হাঁচি বেদে চেনে	প্রকৃত চরিত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝতে পারে।
কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে পানিতে বাস	যার যেখানে প্রভুত্ব সেখানে তার সাথে বিবাদ করে বাস করা যায় না।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হওয়া।
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না	নিজের দেশে গুণীর আদর নেই।
যে সয় সে রয়	কষ্ট করলে বিনাশ নেই।
দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না	সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা।
যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে	যার যে-কাজ সে-কাজ তাকেই মানায়, অন্যে করতে গেলে নানা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়।
বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর	উপযুক্ত তদারকির অভাবে নিযুক্ত কর্মীদের কাজে অবহেলা করা।
অসারের তর্জন-গর্জন সার	গুণহীন ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন করা।
নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো	একেবারে না পাওয়ার চেয়ে সামান্য কিছু পাওয়াও ভালো।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	বেশি লোভে আসলই হারাতে হয়।
পানিতে কুমির ডাঙায় বাঘ	দুদিকেই বিপদ, রক্ষার কোনো পথ নেই। (উভয়সংকট)
ঘটি ডোবে না, নামে তালপুকুর	ক্ষুদ্র ব্যক্তির বড় নাম গ্রহণ।
গাছে না উঠতেই এক কাঁদি	কাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে ফলের প্রত্যাশা করা।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন।
ধরাকে সরা জ্ঞান করা	কাকেও গ্রাহ্য না করা।
ঝোপ বুঝে কোপ মারা	অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ করা।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা	ব্যথার উপরে ব্যথা দেয়া।
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	উপরওয়ালাকে ডিঙিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করা।
যার বিয়ে তার খোঁজ নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই	অকারণে অতিউৎসাহ প্রদর্শন।
হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী	অকর্মণ্য ব্যক্তির ততোধিক অযোগ্য দোসর।
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহংকারে স্ফীত হয়ে ওঠা।
শক্তের ভক্ত নরমের যম	শক্তিমান লোকের কাছে বিনীত ও বাধ্য থাকে এবং দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে এমন।
মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত	সীমিত পরিধির মধ্যে বিচরণশীল মানুষ।
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো	পরোক্ষভাবে তিরস্কার করা।
তেলা মাথায় তেল দেওয়া	যার আছে তাকে আরও দেওয়া।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম	নিজের স্বার্থ দেখা।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল	মূর্খ ও অযোগ্য ব্যক্তির হাস্যকর নেতা সাজা।
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা	অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা।
বুদ্ধি যার বল তার	যার বুদ্ধি আছে তার শক্তিও আছে।
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো	অবহেলার পাত্র কিন্তু কাজের সময় ডাক পড়ে।
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা	নিজের অনিষ্ট সাধন করেও অপরকে জব্দ করার চেষ্টা করা।
বোঝার ওপর শাকের আঁটি	অনেক বোঝার উপর আরও কিছু চাপানো।
লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না	পদাঘাতের যোগ্য ব্যক্তি চড় খেয়েও কাজ করে না বা লঘু শাসন মানে না।
আলালের ঘরের দুলাল	ধনী ঘরের অতি আদুরে ও আবদারে ছেলে।
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	নির্দোষ ব্যক্তির উপর দোষী ব্যক্তির অপরাধ পতিত হওয়া।

হাত ঝাড়া দিলে পর্বত	ধনাঢ্য ব্যক্তির ধনাধিক্যের নিদর্শন।
হাত দিয়ে হাতি ঠেলা	অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করার চেষ্টা করা।
লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন	চাহিবামাত্র যার কাছে টাকা পাওয়া যায় তার সম্পর্কে বলা।
উঠন্ত বৃক্ষ পত্তনেই চেনা যায়	কাজের আরম্ভটা দেখে কাজের শেষটা বুঝতে পারা।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	বেশি লোভ করলে পাপ হয় এবং পাপ করলে ধ্বংস অনিবার্য।
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল	যেমন কঠিন রোগ, তেমনি তীব্র ঔষধ।
বিষ নাই কুলোপনা চক্কর	ক্ষমতাহীন ব্যক্তির মৌখিক আস্ফালন।
মরা হাতি লাখ টাকা	শক্তিমানদের পতন ঘটলেও তাদের ব্যক্তিত্ব মর্যাদা বহন করে।
রাখে আল্লাহ মারে কে	ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কেউ ধ্বংস করতে পারে না।
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কিছুমাত্র বেগ না পেতে হয় এমন কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা।
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে	সুযোগ হাতছাড়া হলে মাথায় নানা ফন্দি-ফিকির আসে।
যেমন কর্ম তেমন ফল	যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল ভোগ করে।
আঠারো মাসে বছর	অতিশয় দীর্ঘসূত্রতা।
গরু মেরে জুতো দান	জঘন্য অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সামান্য প্রতিদান দেওয়া।
দুধ-কলা দিয়া সাপ পোষা	সযত্নে দুশমনকে প্রতিপালন করা।
কারও সর্বনাশ কারও পৌষ মাস	কারও বিরাট লাভ কারও বিরাট ক্ষতি।
এক ক্ষুরে মাথা কামানো	একরকম অপরাধে অপরাধী হওয়া।
মাছের তেলে মাছ ভাজা	নিজে খরচপত্র না করে অন্যের উপর দিয়ে স্বার্থরক্ষা করা।
কড়িতে বাঘের দুধ মেলে	অর্থে দুষপ্রাপ্য বস্তুও সুলভ হয়।
আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ	অবৈধ পথে দ্রুত উন্নতি লাভ।
পাকা ধানে মই দেওয়া	সুসম্পাদিত কাজ পণ্ড করা।
ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া	বিনামূল্যে যা পাওয়া যায় তাতেই লাভ।
আটে পিঠে দড় তবে ঘোড়ার ওপর চড়	দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে যাওয়া উচিত।
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা	বিপদে প্রতিকারের চেষ্টা নেই অথচ কোলাহল করা হচ্ছে।
ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেয়া	প্রতিশোধপরায়ণ জনমণ্ডলীকে উত্তেজিত করা।
কয়লা ধুলে ময়লা যায় না	স্বভাবের পরিবর্তন হওয়া কঠিন।
এক ঢিলে দুই পাখি মারা	একবারের চেষ্টাতেই উভয় স্বার্থসিদ্ধি করা।
খুঁটোর জোরে ভেড়া নাচে	শক্তিশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় অযোগ্য ব্যক্তিরও উন্নতি সম্ভব।
লেবু বেশি কচলালে তিতো হয়	কোনো কার্যোদ্ধারের জন্য বারংবার অনুনয় করলে বিরক্তি সৃষ্টি করা হয়।
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ	ছোট-বড় যাবতীয় কাজ করা।
কত ধানে কত চাল (হয়)	কোনো বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বা খবর।
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অযাচিতভাবে (বিনা অধিকারে) হঠাৎ এসে সর্বেসর্বা হয়ে বসা।
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরুদ্ধ হয়ে অসম্ভব কাজ সম্পাদন করা।
গাছে তুলে মই কাড়া	কাজে নামিয়ে সরে যাওয়া।
যে করে চক্ষুদান, তারেই কর অপমান	উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকারের পরিবর্তে তাকে অপদস্থ করা।
একতাই বল	সমষ্টির শক্তিই আসল শক্তি।
বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ	বৃদ্ধ ব্যক্তির উন্মাদনা।
উল্টা বুঝলি রাম	ভালো কথার মন্দ ব্যাখ্যা করা।
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার	সাথে সাথে প্রমাণ।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন	কুৎসিতকে বেমানানভাবে সজ্জিত করা হাস্যকর ব্যাপার।
চোখে সরষে ফুল দেখা	বিপদে পড়ে দিশেহারা হওয়া।
ডুবে ডুবে পানি খাওয়া	লোকচক্ষুর অগোচরে কার্যসিদ্ধি করা।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা	এক দুষ্টের বিরুদ্ধে অন্য দুষ্টকে লেলিয়ে দিয়ে উভয়ের বিনাশ সাধন করা।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা	জঘন্য অপরাধ গোপনের হাস্যকর চেষ্টা করা।
হাটে হাঁড়ি ভাঙা	গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া।
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো	নিজের খরচায় অপরের স্বার্থ দেখা।
পরের মুখে ঝাল খাওয়া	নিজে না বুঝে অন্যের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা।
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়	সমস্যা থাকলে ঘুরেফিরে সে সমস্যার মধ্যেই জড়িয়ে পড়া।
বেল পাকলে কাকের কী	উপভোগ করতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি লোভ করা নিষ্ফল।
হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে	একূল ওকূল উভয় কূল হারানো।
মাছের মায়ের পুত্রশোক	মাছ তার বাচ্চা খেয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে তার পুত্রশোক অস্বাভাবিক।
হাতে নয় ভাতে মারা	প্রহার না করে কেবল উপবাসী রেখে দুর্বল করা।

অনুশীলনমূলক কাজ

১. **নিচের প্রবাদ ও প্রবচনগুলোর অর্থ লেখ :**
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
অতি চালাকের গলায় দড়ি।
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
একতাই বল।
বেল পাকলে কাকের কী।

২. **নিচের প্রবাদগুলোর সাহায্যে বাক্য রচনা কর :**
কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ।
সবুরে মেওয়া ফলে।
যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।
দশের লাঠি একের বোঝা।
গরু মেরে জুতো দান।
উনো ভাতে দুনো বল।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

৩. **প্রবাদ বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।**

৪. **প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে কি ব্যাপক পার্থক্য আছে ? বুঝিয়ে লেখ।**

৫. **নিচে প্রবাদগুলোর পাশে দেওয়া ঠিক অর্থের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :**
বিনা মেঘে বজ্রপাত (অপাত্রে দান করা)
উলুবনে মুক্তো ছড়ানো (উপকারীর উপকার স্বীকার করা)
নুন খাই যার গুণ গাই তার (হঠাৎ বিপদ আসা)
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে (সত্যের প্রকাশ এমনিতেই হয়)
এক ঢিলে দুই পাখি মারা (একসঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সাধন)

পত্রলিখন

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পত্ররচনা মানবসমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে পত্র লিখতে হয়। শুধু শিক্ষার্থী নয়, সব মানুষেরই যোগাযোগের ক্ষেত্রে পত্ররচনার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, দাপ্তরিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি প্রয়োজনে পত্র লিখতে গিয়ে কতকগুলো নিয়ম বা রীতির অনুসরণ করা দরকার। বর্তমান সময়ে কম্পিউটার-এর মাধ্যমে ই-মেইল, ফোন বা মোবাইলে SMS পদ্ধতি চালু হওয়ায় ব্যক্তিগত পত্র রচনার প্রয়োজন অনেকাংশে সীমিত হলেও দাপ্তরিক, সামাজিক এবং অন্যান্য কাজে পত্রের গুরুত্ব বেড়েছে। তাই পত্র লেখার প্রয়োজনও বেড়েছে। সুতরাং পত্র লেখার প্রয়োজন, পত্রের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে চিঠিপত্রকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন :

ক. ব্যক্তিগত পত্র

খ. দাপ্তরিক পত্র

গ. ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত পত্র

ঘ. স্মারকলিপি বা মানপত্র

ঙ. জনস্বার্থ বিষয়ে সংবাদপত্রে লিখিত পত্র।

এ ছাড়াও আরও অনেক প্রয়োজনে অনেক প্রকার পত্র রচিত হতে পারে। তবে চিঠিপত্রের সঠিক আঙ্গিক বা রীতি মেনে চলা উচিত। চিঠির ভাষা, বক্তব্য স্পষ্ট ও শুদ্ধ হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত চিঠির ভাষার নিজস্ব শৈলী থাকা প্রয়োজন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিঠি অনেক সময় সাহিত্যিক গুণ অর্জন করে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র'। সুতরাং সুন্দর চিঠি লিখতে প্রতিভা দরকার। বিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিকরা সুন্দর করে চিঠি লেখেন। আবার রাজনৈতিক ব্যক্তির চিঠিও অনেক সময় ইতিহাসের উপাদানরূপে গণ্য হয়। মানুষ পত্রে সবসময় সত্য কথা লেখেন। তাই পত্রের গুরুত্ব বহুমাত্রিক।

তবে সামগ্রিকভাবে পত্রের প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করলে পত্রকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

১. **ব্যক্তিগত পত্র** : আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা পারিবারিক কোনো সদস্যের কাছে যে চিঠি লেখা হয় সেগুলোই ব্যক্তিগত পত্র।

২. **ব্যবহারিক পত্র** : আবেদন-নিবেদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অভিনন্দন পত্র, শোকপ্রকাশ, নিমন্ত্রণপত্র ইত্যাদিকে বলে ব্যবহারিক পত্র।

ব্যক্তিগত পত্রে প্রিয়, প্রিয়বরেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, কল্যাণীয়াসু, সুহৃদবরেষু, বন্ধুবর, প্রীতিভাজনেষু, কিংবা জনাব, মহোদয় ইত্যাদি সম্বোধন করতে হয়। কিন্তু ব্যবহারিক পত্রে মাননীয়, মহাত্মন, মহোদয় ইত্যাদি সম্বোধন করা প্রয়োজন। নিচে কিছু পত্রের নমুনা দেওয়া হল—

১. স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র।

ধানমণ্ডি
২০.১২.০৮ ইং

প্রিয় 'ক'
তোমার পাঠানো পোস্টকার্ড পেয়েছি। আশা করি পরিবারের সবার সাথে তুমিও সুস্থ আছ। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও। আজই ছিল আমাদের স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। আর অনুষ্ঠান থেকে ফিরেই তোমার চিঠি হাতে পেয়ে কী যে খুশি হয়েছি তা বলাই বাহুল্য।

কেমন অনুষ্ঠান হল তা জানতে নিশ্চয়ই তোমার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। বলছি—শুরু থেকেই।

আমরা স্কুলটিকে এবার অন্যান্য বারের তুলনায় আরও সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলাম। স্কুলের গেট সাজানো হয়েছিল বিভিন্ন রঙিন কাপড় দিয়ে। স্কুলের মাঠে আলাদা মঞ্চ ও শামিয়ানার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার ওপর রঙিন কাগজের ব্যবহার তো ছিলই। বেলা দশটার দিকে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করেন। এগারোটার দিকে এলেন প্রধান অতিথি মেয়র সাহেব।

প্রথমে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। হেডস্যার বার্ষিক বিবরণ পাঠ করে শোনালেন। অন্যান্যদের ভাষণের পর প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখলেন। তারপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এরপর পুরস্কার বিতরণের পালা। আমি প্রত্যেক দিন স্কুলে উপস্থিত থাকার জন্য একটি পুরস্কার এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের মাঝে স্কুলে অনুপস্থিতির হার সবার চেয়ে কম বলে আরেকটি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছি। তা ছাড়া কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে প্রথম পুরস্কার পাই। প্রধান অতিথি আমাকে আদর করে বললেন যে, তিনিও ছাত্রজীবনে এমন নিয়মানুবর্তিতার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন; কিন্তু আমার মতো তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন না। একথা শুনে আমি আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম।

অনুষ্ঠান শেষ হলে হেডস্যারসহ শিক্ষকমণ্ডলী আমাকে অভিনন্দন জানালেন। এতে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। তুমিও তোমার স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের কথা জানাবে। পার তো স্কুল বন্ধ হলে ঢাকায় আমাদের বাড়ি এসো। আমরা খুশি হব।

তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিও, টুনটুনিকে দিও আমার অশেষ আদর।

ইতি
তোমার বন্ধু
'খ'

মনে রেখো : এ পত্রটি একটি নমুনা মাত্র। পরীক্ষায় খাতায় এভাবেই 'ক' ও 'খ' দিয়ে লিখবে। সে-সাথে 'শিরোনাম' নিচের মতো করে দিতে চেষ্টা করবে।

	ডাকটিকিট
প্রেরক 'খ'	প্রাপক 'ক' প্রযত্নে- চ গ-স্কুল, অষ্টম শ্রেণী ক্রমিক -'ব'

২. বন্ধুর পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে পত্র।

আহসানগঞ্জ, নাটোর
২০.১১.২০০৮

প্রিয় শাহীন,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। আশা করি পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় এক প্রকার ভালোই আছ। চিঠিতে তোমার আব্বার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা মর্মাহত।

দেখ শাহীন, এ নশ্বর পৃথিবীতে কেউই চিরজীবী নয়। তুমি আমি কেউ নয়। পিতা-মাতা সবার থাকে না, এই ধর এখন তোমার পিতা গেলেন, আরও পরে যাবেন মা। এই তো নিয়ম। আমি তো মাকে হারিয়েছি অনেক বছর। পিতা এখন শয্যাশায়ী, যে-কোনো দিনই কালের অমোঘ নিয়মে তাঁকে চলে যেতে হবে মৃত্যুর আহ্বানে। এটি জগতের অতি

সাধারণ নিয়মগুলোর একটি। তোমাকে কী বলে সান্ত্বনা দেব, সে-ভাষা আমার জানা নেই। আরও জানি, যে স্বজন হারাল তাকে সান্ত্বনা দেওয়া নিতান্তই বোকামি। তাই প্রার্থনা করি বিধাতা যেন তোমাকে দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা দেন। আর হ্যাঁ, তুমি তো সংসারের বড় ছেলে, এ-মুহূর্তে তুমি যদি ভেঙে পড়, কান্নাকাটি কর, তা হলে ছোট ভাইবোনগুলোকে প্রবোধ দেবার কে থাকবে? তাই এ-মুহূর্তে তোমাকে এবং বিশেষ করে তোমার আম্মাকে মন শক্ত করতে হবে, ভেঙে পড়লে চলবে না। কারণ, এতে সংসার এলোমেলো হয়ে যাবে। তিনি যেন খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম এবং বেশি কান্নাকাটি না করেন সেদিকে খেয়াল রাখবে। তুমি ঠিকমতো পড়াশুনা করবে, ছোট ভাইবোনদেরও বলবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তোমার আব্বার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করবে। এতে মনের শান্তি ও শক্তি দুটোই ফিরে আসবে। তোমার আম্মাকে আমার সালাম ও ছোটদের স্নেহাশিস দিও। খোদা হাফেজ।

ইতি
তোমার বন্ধু
আলম

প্রেরক এস. আলম আহসানগঞ্জ নাটোর।	ডাকটিকিট প্রাপক শাহীন প্রযত্নে : আব্দুর রহিম গ্রাম ও ডাক : মোহনপুর রাজশাহী।

৩. ছোট ভাইকে উপদেশ দিয়ে বড় ভাইয়ের পত্র।

সুলতানাবাদ, রাজশাহী
২০.১০.২০০৮

স্নেহের শুভ,

স্নেহ ও দোয়া রইল। আশা করি ভালোই আছ। দিন কতক আগে রায়হানের চিঠিতে জানতে পারলাম যে, আজকাল তুমি নাকি লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে উঠেছ। ঠিকমতো পড়াশুনা করছ না। এটা জেনে আমি কিছুটা হতাশ। তোমার ভালো করেই জানা উচিত যে, আমরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আমাদের এমন কোনো সম্পত্তি নেই যার ওপর নির্ভর করে পায়ের ওপর পা তুলে বিনা কাজে জীবন কাটাতে পারি। আর লেখাপড়া না করে নিজেদের গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই। লেখাপড়া না করলে কোনো কায়িক পরিশ্রম করেও নিজের অন্নসংস্থান করতে পারবে না। তোমার মতো এমন দুর্বল দেহের ছেলেরা লেখাপড়া করে কোনো কাজে না লাগতে পারলে, অন্যের কাঁধের বোঝা হয়ে জীবন কাটাতে হবে। আর মনে রেখো— পরনির্ভরশীল জীবনের মতো লজ্জাকর জীবন আর নেই। তোমার এই দুর্গতির কথা মা জানেন না নিশ্চয়ই! তিনি জানলে তোমার বিপদ হবে বেশি। এখনও সময় আছে, পড়ালেখার প্রতি নজর দাও। কারণ তুমি এখন বড় হয়েছ, তাই তোমার ভালোমন্দ তোমাকেই বুঝতে হবে।

এখন থেকে সবকিছুই রুটিনমাফিক করতে চেষ্টা করবে। নিয়মিত স্কুলে যাবে। আর যখন-তখন আড্ডা দেওয়া, দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো ত্যাগ করতে হবে। প্রতিদিন খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে চেষ্টা করবে। আর তখন সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত যতখুশি দৌড়াদৌড়ি খেলাধুলা করতে পার, ওতে তোমারই মঙ্গল হবে।

আশা করি এবার থেকে সুবোধ ছেলের মতো পড়াশুনা করবে। মার অবাধ্য হবে না। তোমার দুরন্তপনায় মা যে খুব

বিরক্ত তা তুমি হয়তো বুঝতে পার না। মার ইচ্ছাকে মূল্য দিতে শেখ, লেখাপড়ায় আরও ভালো হতে চেষ্টা কর। মাকে আমার সালাম দিও। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বড় ভাই
লিটন

প্রেরক	ডাকটিকিট প্রাপক ....

৪. বড় বোনের বিবাহউৎসবের আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে পত্র।

খুলনা
২.১১.২০০৮

প্রিয় সাদি,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি বিধাতার অশেষ কৃপায় ভালোই আছ। আমরাও মোটামুটি ভালো।

তোমাকে একটি খুশির খবর দিচ্ছি, আর তা হল আসছে পহেলা জানুয়ারি নাজনিন আপার বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু এমন একটি খুশির দিনে আমার সমবয়সী কেউ কাছে নেই বলে দুঃখ হচ্ছে। আমার চিঠি পৌঁছামাত্রই তুমি চলে আসবে। তোমার কথা মা-বাবাও বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। তুমি যাতে এখানে সহজেই আসতে পার, তাই তোমার আব্বা-আম্মার অনুমতির জন্য বাবা একটি চিঠি দেবেন বলেছেন। তুমি এলে দুজনে মিলে খুব আনন্দ করা যাবে। তোমার প্রতীক্ষায় থাকলাম। আজ আর নয়। তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিও। খোদা হাফেজ।

ইতি
মোস্তাফিজ

প্রেরক মোস্তাফিজ খুলনা।	ডাকটিকিট প্রাপক সাদি রহমতউল্লাহ গ্রাম+ডাক : নাচোল, নবাবগঞ্জ।

৫. একটি সড়ক দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র।

সুরানন্দী, কুমিল্লা
১৪.০১.২০০৮ ইং

প্রিয় এনায়েত,

শুভেচ্ছা রইল। আশা করি ভালো আছিস। গতকাল তোর চিঠি পেয়েছি। দোস্ত, আমার কিন্তু মনটা বেশি ভাল নেই, শরীরটাও তেমনি। কারণটা বলছি—

গত পরশুদিন আমার নানার বাড়ি দড়নিপাড়া ছিলাম। সেদিন সকালের দিকে বকুল মামার সাথে ইলিয়টগঞ্জ বাজারে যাচ্ছিলাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক আগের চেয়ে উঁচু ও চওড়া করা হয়েছে। গাড়িও চলে ভীষণ জোরে। তাই মহাসড়কে উঠে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছি। এক সময় একটি পাঁচ-ছয় বছর বয়সের ছেলে হঠাৎ দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল, আর তখনই তাকে অনুসরণ করে একই বয়সের আরেকটি মেয়ে দৌড় দিচ্ছিল। তাকে পেছন থেকে চুলের গোছা ধরে টেনে থামিয়ে দিলাম আর দুটি বাস সমান তালে পাল্লা দিয়ে পাশাপাশি এগিয়ে গেল। বাস দুটো যত জোরে আসছিল তাতে মেয়েটি রাস্তার মাঝামাঝি থাকতেই চলন্ত বাসের চাকায় পিষ্ট হত। মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলল। তাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম। কিন্তু যার মৃত্যু লেখা হয়ে গেছে তাকে বাঁচায় কার সাধ্য। বাস এতজোরে আসছিল যে, পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একটি রিকশাকে ধাক্কা দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল। রিকশার চালক উড়ে গিয়ে সড়কের পার্শ্ববর্তী খালে পড়ল দুমড়ানো রিকশাসমেত, কিন্তু দেখা গেল সেই রিকশাটির জায়গায় কালো রাস্তাকে লাল রঙের স্রোত বইয়ে, নিঃসাড় পড়ে আছে মেয়েটি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এগিয়ে গেলাম। মেয়েটির মাথা পিষে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, আর রক্তের একটা উষ্ণ গন্ধ আমার নাকে প্রবেশ করতেই হড়হড় করে বমি আসতে চাইল। আমি আর সেখানে থাকতে পারছিলাম না। পরে বকুল মামার কাছে শুনেছি সেই রিকশার চালক পানিতে পড়ার কারণে বেঁচে গিয়েছিল। অথচ যার মরবার কথা ছিল না সে-ই মরে গেল।

তাই বাড়িতে আসবার পরও ক্ষণে-ক্ষণে সে-দৃশ্যটি আমার মনে পড়ছে। কিন্তু কাউকে বলতে পারছিলাম না। তোকে জানাতে পেরে নিজেকে অনেকটা হালকা মনে হচ্ছে।

তোর মনটা হয়তো খারাপ করে দিলাম, কিন্তু এ ছাড়া আর কার কাছে এভাবে বলতে পারতাম বল? যাক, তোর অনুভূতি জানিয়ে চিঠি দিস, অপেক্ষায় থাকব। ক্লাস কবে থেকে শুরু হচ্ছে জানাবি। খোদা হাফেজ।

ইতি
খালেদ

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	
....	....	

৬. পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র।

মিরপুর, ঢাকা
১২.০১.২০০৮ ইং

বন্ধুবর শফিক,

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও। সেইসাথে রইল আরও উষ্ণ অভিনন্দন। তোমার পরীক্ষার ফল জেনে এত খুশি হয়েছি যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

তুমি পরীক্ষায় প্রথম হবে তা জানতাম, কিন্তু ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পর্যন্ত কেউ তোমার মতো এত বেশি নম্বর পায়নি, একথাটি নিশ্চয়ই তোমারও অজানা। সেদিন আমাদের প্রধান শিক্ষক তোমার কথা বলে আমাদের উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ছাত্র হলে এমন ছাত্রই হওয়া উচিত। দেখ রশিদ, তুমি যে তার বন্ধু একথা বলতেও তুমি আনন্দ পাচ্ছ।" বলতে লজ্জা নেই যে, আমি তোমার চেয়ে অনেক খারাপ ছাত্র। যদিও আমি এবারও পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি তবুও তোমার তুলনায় তা কিছুই না। আশা রাখি এভাবে তোমার কীর্তির আলোকে আমাদেরও আলোকিত করে রাখবে এবং সে-আলোয় যেন এগিয়ে নিতে পারি নিজেদের সফলতার তরণী। এ মুহূর্তে আমার একান্ত প্রত্যাশা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় যেন তুমি জেলার মধ্যে প্রথম হতে পার। পাশাপাশি আমিও চেষ্টা করব নিজের একটা স্থান করে নিতে।

তোমার এ কৃতিত্বের খবরে আব্বা-আম্মা দুজনেই খুব খুশি হয়েছেন। আব্বা যে তোমার মেধার সংবাদ রাখেন সেও তোমার অজানা নয়। আমাদের পরিবারের ধারণা এসএসসি পরীক্ষাতেও তোমার কৃতিত্বে আমরা আনন্দিত হব। আব্বার মতে পড়াশুনার প্রতি আরও যত্নবান হওয়া তোমার পক্ষে জরুরি। কারণ, তিনিও তো একদিন তোমার শিক্ষক ছিলেন। যদি সময় করতে পার তা হলে আমাদের এখানে এসে বেড়িয়ে যেও, আমরা খুব খুশি হব।

পরিশেষে তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে আজ এখানেই লেখার ইতি টানছি। খোদা হাফেজ।

তোমার বন্ধু
রশিদ

প্রেরক রশীদ মিরপুর, ঢাকা–১২১৬	ডাকটিকিট প্রাপক সৈয়দ শফিকুর রহমান যশোর। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল

৭. পঠিত গ্রন্থ সম্পর্কে মতামত জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি।

তালাইমারী
রাজশাহী
২০.৩.২০০৬

প্রিয় অরুণ,

আমার শুভেচ্ছা নিও। অনেকদিন পর তোমাকে লিখছি। নানা কারণে তোমার শেষ চিঠির জবাব দিতে পারিনি। সেজন্য সত্যি দুঃখিত। কদিন আগে একটি উপন্যাস পড়ে শেষ করলাম। এখনও মাথায় চরিত্রগুলো ঘুরছে। তোমাকে আমার অনুভূতিগুলো বলব। আশা করি তুমিও বইটি পড়বে।

বইটি হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'কবি'। ডোমের ছেলে নিতাই তাদের বংশের ডাকাতির পেশায় না গিয়ে কবি হয়ে উঠল। বাল্যকাল থেকেই সে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শেখে, আর গান তৈরি করে নিজেই তাতে সুর করে গেয়ে ওঠে। একদিন এক কবির লড়াইয়ে একজন কবি অনুপস্থিত থাকলে নিতাইয়ের ডাক পড়ে। নিতাই গান করে, সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। যেমন তার গানের বাণী, তেমনি তার গলার সুর। যাহোক, শেষ পর্যন্ত সে ঠাকুরঝির প্রেমে পড়ে। ঠাকুরঝি তাকে অসম্ভব ভালোবাসে। ঠাকুরঝির সাথে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয় জেনে নিতাই ঝুমুর দলে যোগ দেয়। সেখানে নর্তকী-গায়িকা বসন্ত তাকে পছন্দ করে। জোর করে তাকে ভালোবাসতে চায়। নিতাই সব ছেড়ে একদিন ঠাকুরঝির কাছে ফিরে আসে। এসে দেখে ঠাকুরঝি মারা গেছে। কালো নিতাই একসময় গান গেয়েছিল, 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে।' আমার মাথায় সবসময় নিতাই ঘুরপাক খাচ্ছে। ভালো বই মনে হয় এরকমই জাদু করে। আশা করি তুমিও বইটি পড়বে।

আজ আর অন্য কিছু লিখছি না। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ইতি।

তোমার বন্ধু
কাজল

প্রেরক	প্রাপক ডাকটিকিট
কাজল	অরুণচন্দ্র বর্মন
১০, জাকারিয়া সড়ক	মেইন রোড
রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী।

৮. পরীক্ষার পর অবসর কীভাবে কাটাবে তা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি।

ঢাকা
১০.৬.২০০৮

প্রিয় নীলা,

আমার শুভেচ্ছা নিও। আশা করি তুমি ভালো আছ। তোমার নিশ্চয় পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমারও শেষ হয়েছে। সামনে চার মাস আমার অখণ্ড অবসর। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নেব। তবু দীর্ঘদিনের ক্লান্তি একটু দূর করতে চাই।

নীলা, আগামী সপ্তাহে আমি বাবা-মার সাথে কক্সবাজার বেড়াতে যাচ্ছি। সাত দিনের সফর। টেকনাফ, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সেন্টমার্টিন যাব। আমার খুব ইচ্ছে তুমি আমাদের সাথে যাবে। তুমি তৈরি হয়ে থাকবে, চট্টগ্রাম থেকে তোমাকে আমরা সাথে করে নেব। গল্পে শুনেছি, টিভিতে দেখেছি সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে, সাদা সাদা ফেনারাশি কেমন করে আছড়ে পড়ে। উহ্, ভাবতেই শিউরে উঠছি। আরও মজার ব্যাপার হল, বহুদিন পর তোমার সাথে দেখা হবে। আশা করি সাত দিন আমাদের ভালোই কাটবে। বাকি সময় কীভাবে কাটাব সেটা তোমার সাথে আলাপ করে ঠিক করব।

তা হলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আব্বা ও আম্মাকে আমার সালাম দিও। তুতুলকে স্নেহ ও আদর। প্রস্তুত থেকো, আমি আসছি। আবারও শুভেচ্ছা। ইতি।

তোমার বন্ধু
কাজল

প্রেরক	প্রাপক ডাকটিকিট
অয়ন্তী আফসানা	নিলা মাহজীবন
খিলগাঁও তালতলা, ঢাকা	নতুন চৌধুরীপাড়া, কুমিল্লা।

৯. তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা জানিয়ে বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লেখ।
অথবা, তোমার জীবনের স্মরণীয় দুর্ঘটনা জানিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একখানা পত্র লেখ।

শিবোইল, রাজশাহী
১০ই জুন, ২০০৮

প্রিয় মং,

শুভেচ্ছা নিও। ভালো আছ আশা করছি। আমি আছি কোনোরকম। সেদিনের একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারছি না। তাই তোমাকে জানানোর তাগিদ অনুভব করলাম। ঘটনার দিন সকালের দিকে বাজারে যাব

বলে আমরা কয়েকজন বন্ধু রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছি। এমন সময় আমাদের পাশ দিয়ে সরকারি নবাব সিরাজদ্দৌলা কলেজের পিকনিক পার্টির বাস চলে গেল, কিছু দূর গিয়ে একটা বিকট শব্দে বাসটি ব্রিজের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে গেল। সে কী আর্তনাদ! ঘটনাস্থলে আমরা উদ্ধারকাজ চালিয়ে গেলাম। বাসটি থেকে অনেকে বেরিয়ে এসেছিল। তবে তিন জন ছাত্রকে বাঁচানো যায়নি। আর কী! পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধারকাজে সহায়তা করা হল। ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েছেই, যারা ছাত্রী ছিল তাদের অবস্থা আরও করুণ। তাদের আমরা হাসপাতালে পাঠালাম। তার মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। তবে নিজের চোখে না দেখলে এ কষ্ট বোঝানো যাবে না।

এর পর থেকে আর কিছুই ভালো লাগছে না। সম্ভব হলে তুমি এখানে বেড়িয়ে যেও। তোমার বাড়ির সবাইকে সালাম ও স্নেহ।

ইতি
তোমারই
বন্ধু জায়েদ

প্রেরক	প্রাপক
	ডাকটিকিট
....	....
....	....
....	....

১০. তোমার দেখা বিজ্ঞানমেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।
অথবা, তোমার দেখা যে-কোনো মেলার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।

রাঙ্গুনিয়া কলেজ,
চট্টগ্রাম।
১০ই জুলাই, ২০০৭

সুপ্রিয় স্মৃতি,

শুভেচ্ছা নিও। অনেক দিন পর তোমার চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে বসেছি। কিন্তু তোমার তো একরাশ অভিযোগ। সেটা অবশ্যই আমার পাওনা। তবে তুমি যাই বল না কেন আমি কিন্তু ব্যস্ত ছিলাম বলে চিঠির উত্তর দিতে পারিনি।

যাহোক, গত সপ্তাহ পুরোটাই আমি ব্যস্ত ছিলাম বিজ্ঞানমেলা নিয়ে। আমাদের কলেজে এ জাতীয় মেলার আয়োজন এই প্রথম। তাই তা ছিল প্রচন্ড আকর্ষণীয়। এদিকে অংশগ্রহণকারী বন্ধুদের যাতে অসুবিধা না হয় তার দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হয়। তদুপরি আমিও এতে অংশগ্রহণ করি। তাই একটা সুন্দর উপাত্ত তৈরি করার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলাম।

সত্যিই ভীষণ এক মজার ব্যাপার; একে তো অজ পাড়াগাঁ, ধরেই নিয়েছিলাম মেলা জমবে না। কিন্তু তা নয়। বিভিন্ন স্থান থেকে খুদে খুদে বিজ্ঞানীরা তো নানা প্রকার প্রদর্শনী নিয়ে হাজির। সৌরচুল্লির রন্ধনপ্রক্রিয়া, আরও কত কী! আরও ছিল স্নো পাউডার তৈরির কারখানা, সেটা তো মেয়েরাই দখল করে নিল। তবুও বলতে হয় এ বিজ্ঞানমেলা জমে উঠেছিল। সর্বোপরি দর্শকের উপস্থিতি ছিল মনে রাখার মতো।

যাক, আর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। তুমি তো পড়াশুনায় খুবই ব্যস্ত। অভিমান কোরো না। অবশ্যই উত্তর দেবে।

তোমার আব্বা–আম্মাকে সালাম ও ছোটদের স্নেহাশিস রইল।

ইতি
তোমারই
তিতির

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট

১১. একটি বনভোজনের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখ।
অথবা, তোমার দেখা ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিয়ে একটি পত্র রচনা কর।

ধানমণ্ডি, ঢাকা
১৩ই জুন, ২০০৮

প্রিয় অনীক,

অনেক দিন হল তোমার কোনো খবর জানি না। আশা করি ভালো আছ। আমি স্কুল থেকে সোনারগাঁ বনভোজন করতে গিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁ দেখা, বাংলার গৌরব ঈশা খাঁর অমর কীর্তি সোনারগাঁ। এর প্রাচীন স্থাপত্য, প্রাকৃতিক শোভা যা বাস্তবে না দেখলে কখনও বোঝানো যাবে না। এখানের লোকশিল্প জাদুঘর দেখার ইচ্ছে ছিল অনেক দিনের। সে ইচ্ছা পূরণ হল এখন। সকাল দশটায় আমরা সোনারগাঁ–এ পৌঁছলাম। ছায়াঢাকা, পাখিডাকা শান্তির নীড় যেন এক স্নিগ্ধ শহর। রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় দ্বিতল ভবন। সামনেই একটা পুকুর। পুকুরের পাশে রয়েছে লিচুগাছের সারি। ঘাটের পাশেই ঘোড়ার পিঠে রয়েছে বীরযোদ্ধা। ভয় পেয়েছ! না, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। এ তো পাথরে গড়া। সে পুকুরেই আছে স্বচ্ছ জল। একটু এগিয়ে যেতে রয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রচেষ্টায় স্থাপিত বাংলার লোকশিল্প ও কারুশিল্প জাদুঘর। এখান থেকে শুরু ঈশা খাঁর রাজধানী। রাস্তার দুপাশে রয়েছে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন দালানকোঠা।

সপ্তদশ শতকে সোনারগাঁ ছিল জলবেষ্টিত, আজও বর্তমান মূল শহরের পিছন দিয়ে ক্ষীণ স্রোতধারার নদী বর্তমান। তা ছাড়া রয়েছে ইতিহাসখ্যাত গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মাজার।

উত্থান-পতনের ধারায় হারিয়ে যাবে এ ঐতিহ্য। কিন্তু মানবহৃদয়ে চিরদিন থাকবে অমলিন। তাই তুমিও সময় পেলে দেখে যাবে এ বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিবর্ণ দালানকোঠা, ইতিহাসের নিদর্শন। এমন সময় খাওয়ার তাগিদ এল। খেয়ে দেয়ে আবার বাসে ফিরে এলাম। শেষ হল আমাদের ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ও বনভোজন।

ইতি
তোমার বন্ধু রইস

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট

১২. তোমার জীবনের লক্ষ্য জানিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখ।

জহিবাবাদ, মতলব
চাঁদপুর
জুন, ২০০৮

প্রিয় নেহা,

শুভেচ্ছা নিস। তুই জানতে চেয়েছিস আমার জীবনের লক্ষ্য কী? হ্যাঁ, তোর জানতে চাওয়া অন্যায় নয়। আমি পরীক্ষার পরপরই তোকে এসব জানাতাম। যাহোক ভাই, সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হতে চায়। তুই হয়তো অবাক হবি, আমি কিন্তু ভাই ঐ দলের কেউ নই। তবে কী হব? সত্যিই তো! তবে শোন, আমি একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চাই। শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে-পড়া এ হতভাগা জাতির জন্য একটু কাজ করতে চাই। বিকশিত করতে চাই প্রতিভাকে। গড়তে চাই দেশপ্রেমিক সাহসী যোদ্ধা, সময়ের সাহসী সন্তান তৈরি করতে চাই। নতুন প্রজন্মকে তৈরি করার জন্য আমি শিক্ষক হব। জানি তুই আমাকে পাগল বলবি। বলাই উচিত, তবু তো সগৌরবে উচ্চারণ করব আমি একজন শিক্ষক।

আমি ফাইনাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। ভালো করব আশা করি। উচ্চশিক্ষা নিয়ে ভালো শিক্ষক হতে বেশি কষ্ট হবে না।

আমার পরিকল্পনা তোকে জানালাম। আমাকে তোর উদ্দেশ্যটা জানাস। তোর জীবন আরও সুন্দর, আলোকিত হোক সেই আশা করি।

ইতি
তোমারই বন্ধু ভাষণ

প্রেরক	প্রাপক ডাকটিকিট
....	....
....	....
....	....

১৩. টাকা চেয়ে পিতার নিকট চিঠি লেখ।

সরকারি রাঙ্গামাটি কলেজ,
পার্বত্য চট্টগ্রাম।
৮.২.২০০৮

শ্রদ্ধেয় বাবা,

চিঠির প্রথমে আমার অজস্র সালাম গ্রহণ করবেন। আশা করি খোদার ফজলে আপনারা বাড়ির সবাই কুশলেই আছেন। আপনার কথামতো আমি গতকাল হোস্টেলে সিট নিয়েছি। এখানে হোস্টেলের সিটের জন্য এবং খাওয়াদাওয়া বাবদ অগ্রিম ২০০০ টাকা জমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তাই আমার চিঠি পাওয়ামাত্র হোস্টেলের জন্য ২,০০০/- টাকা এবং আমার অন্যান্য খরচের জন্য ১,৫০০/- টাকা, সাকল্যে মোট ৩,৫০০ টাকা মানিঅর্ডারযোগে পাঠিয়ে দেবেন।

এখানে ভর্তি হওয়ার পর কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। দুএকদিন পরেই আমাদের ক্লাস শুরু হবে। ইচ্ছে আছে, ক্লাস শুরু হওয়ার পর ইংরেজি ও অঙ্ক বিষয়ে আমি প্রাইভেট পড়ব। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ ও উপদেশ চাই।

মাকে আমার সালাম দেবেন এবং আমার জন্য দোয়া করতে বলবেন। ইভা ও নদী যাতে ঠিকমতো পড়াশুনা করে সেদিকে লক্ষ রাখবেন। আপনাকে আবারও সালাম।

ইতি
আপনার স্নেহের
নিবেল

প্রেরক	প্রাপক
	ডাকটিকিট
....	....
....	....
....	....

১৪. অসুস্থ শয্যাশায়ী বন্ধুকে সান্ত্বনা জানিয়ে পত্র।

চাঁদপুর
৭.৩.২০০৮

প্রিয় এহতেশাম,

আমার শুভেচ্ছা নিও। জামিলের কাছ থেকে জানতে পেলাম যে, তুমি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছ। হঠাৎ তোমার অসুস্থতার খবর আমাকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে। আমি এজন্য খুবই বেদনাহত।

যাহোক এতদূর থেকে শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে ছুটে গিয়ে তোমায় চোখের দেখা দেখে আসব সে উপায় নেই। তাই তোমাকে কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। অসুস্থতা মানুষের সাময়িক ব্যাপার। এ ব্যাপারে তাই কখনও ভেঙে পড়তে নেই। মনোবলই হচ্ছে আসল নিরাময় শক্তি। শরীর থাকলেই ব্যাধি আছে, আবার রোগ হলেই ওষুধ ও ডাক্তার অপরিহার্য। তুমি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চলবে। আমার আরেকটা কথা বিশেষভাবে মনে হচ্ছে— হুঁশিয়ার ও যত্নবান হবে। পড়াশুনার ব্যাপারে তোমার সাময়িক ক্ষতি হচ্ছে জানি। কিন্তু সেজন্য ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই। সুস্থ হওয়ার পরে অতিরিক্ত লেখাপড়া করে সেটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আস এ কামনা করে চিঠি শেষ করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
ওমর খৈয়াম

প্রেরক	প্রাপক
	ডাকটিকিট
....	....
....	....
....	....

১৫. ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে গ্রামের ছোট ভাইয়ের কাছে পত্র।

সিলেট
৭.৪.২০০৮

স্নেহের নুহাস,

আমার স্নেহাশিস নিও। তোমার দুটি চিঠি পেয়েছি কিন্তু জবাব দিতে দেরি হয়ে গেল। এর কারণ আমি নিজেই বাড়ি আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রধান শিক্ষক সাহেব ছুটি মঞ্জুর করলেন না। যাহোক, যে-কারণে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি সেটা লিখেই জানাচ্ছি। সেটা হচ্ছে রাজশাহী শহরে ডেঙ্গুজ্বরের বেশ প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু রোগী মারা পড়েছে। বর্তমানে শহরের অলিতেগলিতে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ছে অতি দ্রুত। কিন্তু মুশকিল হল প্রাথমিক পর্যায়ে এ জ্বর শনাক্ত করা খুবই মুশকিল। এ জ্বরকে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই মনে হয়। এ জ্বরও ভাইরাসঘটিত। ১—৭ দিন এর প্রকোপ থাকে। ছয়, সাত দিন পর প্রাকৃতিক নিয়মেই ভাইরাসগুলো মারা পড়ে।

এডিস নামক এক প্রকার মশার কামড় থেকে ডেঙ্গুজ্বরের উৎপত্তি। এডিস মশা কোনো ডেঙ্গুজ্বর-আক্রান্ত রোগীকে দংশন করে অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে পুনরায় দংশনের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে শুরু হয় এ জ্বর। জ্বরের মাত্রা ১০৪–১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে থাকে। রোগী খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। সময়মতো ডাক্তারের শরণাপন্ন না হলে মৃত্যু অবধারিত।

গ্রামে ভালো ডাক্তার নেই। সেখানকার অশিক্ষিত লোকেরা স্বাস্থ্যসচেতন না থাকায় নিজেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করার সময় এসেছে। কারও জ্বর দেখা দিলেই তাকে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে, বেশি অসুবিধা দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের মশানিধন করতে হবে। মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করতে হবে। বাড়িতে মশার ওষুধ স্প্রে করে বা কয়েল জ্বেলে মশা বিতাড়ন করতে হবে এবং রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে।

আশা করি আমার কথাগুলো তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে পৌঁছে দেবে। গ্রামের অসহায়-অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সবাই মিলে তাদের মধ্যে এসব কথা প্রচার করবে।

বাবা-মাসহ বাড়ির অন্য সবাইকে আমার সালাম দিও এবং আমার জন্য দোয়া করতে বোলো। তুমি ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধকল্পে গ্রামে কী কী ব্যবস্থা নিয়েছ তা আমাকে জানাবে। তোমার চিঠি পেলে আবার লিখব। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বড় ভাই
সোহেল

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	
....	....	

১৬. একটি লঞ্চ-দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বন্ধুকে লেখা পত্র।

ঢাকা
১৪.৫.২০০৮

সুপ্রিয় জহির,

শুভেচ্ছা। আমি এইমাত্র ঢাকা এলাম। আমার এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে চাই। আমি এখনও সত্যিকারভাবে বেঁচে আছি কি না, বেঁচে থাকলে কীভাবে বাঁচলাম এটাই শুধু ভাবছি। অন্যের বিপদের কথা কতই তো

শুনেছি, কিন্তু নিজে বিপদে না পড়লে তার প্রকৃত গুরুত্ব বুঝতে পারে না কেউ।

আমরা প্রায় ৫০০ জন যাত্রীসহ রাত ১০টায় ঢাকা সদরঘাট থেকে এমভি মহারাজযোগে মতলবের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। ৩০ মিনিট অতিক্রম করার পর পাগলা বালুরঘাট যাওয়ার পর হঠাৎ করে একটি ঝড়ো হাওয়া আসে। আমি তখন লঞ্চের ছাদে উঠেছিলাম। ঝড়ো হাওয়ার তাণ্ডব দেখে আমি আর নিচে নামিনি। আমার তখন মনে পড়ে যায়, শরৎচন্দ্রের 'সমুদ্রে সাইক্লোন' গল্পের সেই উক্তির কথা— খাঁচায় আবদ্ধ ইঁদুরের মত ধুকে ধুকে মরে লাভ কি? যতক্ষণ পারি হাত পা নাড়ি, এক সময় টুক করে ডুব দিয়ে পাতালের রাজবাড়িতে অতিথি হয়ে বসব।

মুহূর্তের মধ্যে যাত্রীরা না-বোঝার আগেই ৫০০ যাত্রীসহ লঞ্চটি উল্টে যায়। আমি কোনোরকমে লাফিয়ে নদীতে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে সাঁতরাতে থাকি। মৃতপ্রায় অবস্থায় বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পারে বসুন্ধরা রিভারভিউ বরাবর এসে আমার ঠাঁই মেলে। কে বা কারা আমাকে উপরে উঠিয়ে নেয় জানি না। জ্ঞান ফিরে জানতে পারি ঐ লঞ্চ থেকে ৫০ থেকে ৬০ জন যাত্রী প্রাণে বেঁচে গেছে।

যারা মারা গেছে তারা প্রায় সবাই আমাদের মতলব উপজেলার অধিবাসী। আমার সাথে শাহিন ভাই, আমার বন্ধু মোবারক, নন্দলালপুর সরকার বাড়ির দুইজন, শিবপুর, টরকী, ইসলামবাদ, সুজাতপুর, সিপাইকান্দি, দুর্গাপুর, নারায়ণপুর, লুদুয়া, কালিরবাজার, কালিপুর এবং মতলবের প্রায় সব গ্রামের লোকই মারা গিয়েছে। ওরা অনেকেই আমার স্বজন, প্রিয়জন।

পরদিন সকাল পাঁচটায় উদ্ধারকারী জাহাজ এমভি রুস্তম ও হামজা এসে লঞ্চটি উদ্ধার করার চেষ্টা চালায়। পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টার পর লঞ্চটিকে উদ্ধার করে। ডুবুরিরা লাশগুলো একে একে বের করে নদীর পারে জমা করতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনরা লাশের পাশে ভিড় করতে থাকে। জেলাপ্রশাসক, টিএনওসহ নৌপরিবহন মন্ত্রী আসেন, স্বজনহারানোর কান্না দেখে সাধারণ জনগণও কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ এক করুণ দৃশ্য। স্বচক্ষে না দেখলে বুঝবার কথা নয়। শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বিভিন্ন বয়সের লাশ আর লাশ।

আমি দুর্ঘটনাকবলিত একজন। মনের জোর কমে গেছে। বোবাকান্না বুকের ভেতরে ঝড় তুলছিল, তখন একটি দৃশ্য দেখে বরফের মতো জমাট বাঁধা কান্নাগুলো গোঙাতে থাকে। হঠাৎ দেখি একটা দশ-বারো মাসের শিশু মায়ের স্তনে মুখ রেখে মাকে জড়িয়ে মরে আছে। আরও অনেক দৃশ্য আছে যা সাক্ষাতে বলা যাবে।

আমি ক্লান্ত, আমার জন্য দোয়া কোরো। দোয়া কোরো ঐসব শবদেহের স্বজনদের জন্যে যারা শোক ভুলে আগামী সম্ভাবনার জন্য দাঁড়াতে পারে।

আল্লাহ হাফেজ। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি
তোমার বন্ধু লিটন

প্রেরক	প্রাপক
....	ডাকটিকিট
....	....
....	....
	....

১৭. বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বন্ধুর কাছে পত্র।

আগ্রাবাদ
চট্টগ্রাম
৮.১০.২০০৮

প্রিয় আশরাফ,

আমার শুভেচ্ছা নিস। আজ অনেকদিন হল তোর কোনো খবর নেই। তুই তো হয়েছিস বইয়ের পোকা। কিন্তু ভালো ছাত্র যারা, তাদের পড়াশুনার বাইরেও অনেক কিছু ভাবতে হয়, করতে হয়। আমাদের পরিবেশ যে এখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে তুই কি তার কোনো খবর রাখিস? এই তো গত পরশু আমাদের কলেজে 'বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার' ওপর একটা সেমিনার ছিল। উক্ত সেমিনারের বক্তা হিসেবে প্রস্তুতি নিতে গিয়েই বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পেলাম। বিষয়টি ঠিক এমন গভীরভাবে কোনোদিন ভেবে দেখিনি। পরিবেশ রক্ষার জন্য একটা দেশের মূল ভূখণ্ডের কমপক্ষে পঁচিশ ভাগ বনাঞ্চল থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তথাপিও বৃক্ষের নিধনযজ্ঞ চলছেই। দ্রুত শহরায়ন, শিল্পায়ন, কাগজ ও ম্যাচ শিল্পের কাঁচামাল, আসবাবপত্র তৈরি, জ্বালানিকাঠের সরবরাহ ইত্যাদি নানা অজুহাতে মানুষ বৃক্ষনিধন করে চলেছে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য বিনস্ট হচ্ছে।

সেদিন খবরের কাগজের এক জরিপের রিপোর্টে দেখলাম জ্বালানি থেকে শুধু ঢাকা শহরে প্রতিদিন সাত টন সিসা ছড়াচ্ছে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি ভয়ংকর ক্ষতিকর গ্যাসের সাহায্যে প্রতিনিয়ত যেভাবে বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে সে-দূষণ প্রতিরোধকল্পে আমাদের দ্রুত নতুন নতুন বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ বৃক্ষই পারে আমাদেরকে দূষণমুক্ত পরিবেশ উপহার দিতে। বৃক্ষ আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। বর্তমান বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় বেশ কিছু ছিদ্র দেখা গেছে। এর ফলে জীবজগৎ বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এসব ছিদ্রপথে সূর্য তার অতিবেগুনি ভয়ংকর রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ ছিদ্র মেরামত না করতে পারলে জীবজগতের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। এ ছিদ্র মেরামতের জন্য প্রয়োজন পরিমিত বনাঞ্চল তৈরি ও সংরক্ষণ। কারণ বৃক্ষ ক্ষতিকর গ্যাসগুলো প্রতিনিয়ত শোষণ করে থাকে। না জেনে বৃক্ষসম্পদ ধ্বংসের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে আমরা পরিবেশের যে ক্ষতি করেছি, দ্রুত বৃক্ষ রোপণ শুরু করে সে ক্ষতি আমাদের পুষিয়ে নিতে হবে। ঘরের আনাচে-কানাচে, পতিত জমিতে, রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণ করে ভরে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে বৃক্ষ বাঁচলে আমরা বাঁচব।

তোদের বাড়ির সবার জন্য সালাম ও শুভেচ্ছা রইল। আমাকে লিখিস।

ইতি
তোরই আহমদ

প্রেরক	প্রাপক
	ডাকটিকিট
....	....
....	....
....	....

১৮. সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ছোট ভাইকে পত্র।

ত্রিশাল
ময়মনসিংহ
১৮.৫.২০০৮

স্নেহের বারাকাত,

আমার স্নেহ নিস। আশা করি তুই ভালো আছিস। সেদিন তোর একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে তোর পড়াশুনার ব্যস্ততার কথাই ফুটে উঠেছে। তুই নাকি দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতেও চোখ বুলাতে পারছিস না। ব্যাপারটা কি সত্যি, না কথার কথা তা জানি না। তবে যদি সত্যি হয়, সেটা হবে খুবই দুঃখের। কারণ, তোর মনে আছে যে ছোট বয়স থেকেই তোকে সংবাদপত্র পাঠে আমি উৎসাহিত করে আসছি। সংবাদপত্র পাঠ করা শিক্ষার একটি অঙ্গ। প্রতিদিন পৃথিবীর খবরাখবর প্রকাশ করেই সংবাদপত্র শুধু এর দায়িত্ব শেষ করে না, বরং মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদপত্রসমূহ তাদের কলেবর বৃদ্ধি করে চলছে। এ-যুগের শিক্ষা ও সভ্যতা সংবাদপত্র পাঠ ছাড়া অপূর্ণ থেকে যায়। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের আলোচনা, স্বাধীন মত ব্যক্ত করার সুযোগ— কী নেই সংবাদপত্রে! পৃথিবীর দুস্থ মানুষ যেখানে প্রতিকারহীন শক্তির দাপটে অশ্রুবর্ষণ করে, সংবাদপত্র সেখানে তার নির্ভীক বাণী প্রকাশ করে। চলমান বিশ্বের নিত্যতার সাথে সম্পর্কিত না হলে ইতিহাস বলো, দর্শন বলো সবই যেন অচল হয়ে পড়ে। কারণ, পৃথিবী একস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। সে প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্তন করে এগিয়ে চলছে, অপরপক্ষে আমাদের পাঠ্যপুস্তকসমূহ কমপক্ষে একটি বা দুটি বছরের জন্য সামাজিক বিষয়ে স্থির হয়ে আছে। পাঠ্যপুস্তকের অধীন জ্ঞানকে বন্ধ পুকুর থেকে তুলে এনে সংবাদপত্রের চলমান জ্ঞানের ধারায় মিশিয়ে না দিতে পারলে সে-শিক্ষা গতি পাবে না।

তোর কাছে আমার অনুরোধ রইল সময় করে নিয়ে অবশ্যই তুই সংবাপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিবি। শিক্ষার অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংবাপত্রেরও একটা স্থান করে নিবি। এতে বরং তোর ক্ষতির চেয়ে উপকারই হবে বেশি।

আমরা বাড়ির সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। বাড়ির জন্য কোনো চিন্তা করিস না। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিস। আজকের মতো চিঠি শেষ করছি।

ইতি
তোর বড় ভাই
মেহেদী

প্রেরক	প্রাপক
....	ডাকটিকিট
....	....
	....

১৯. দেশের সাম্প্রতিক বন্যার কথা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে পত্র।

নবাব সিরাজদ্দৌলা কলেজ
নাটোর
৮.১২.২০০৮

প্রিয় জুয়েল,

আমার শুভেচ্ছা নিস। তোর সাথে দীর্ঘদিন পত্র-যোগাযোগ নেই। তার মানে এ নয় যে, আমি তোকে ভুলে গেছি। আমার আজকের লেখা পত্রটাও তোকে পাঠাতে পারব কি না তা জানি না। এভাবে প্রায় চার-পাঁচটি পত্র জমা হয়ে আছে আমার

কাছে। আমার ধারণা, তোরগুলোও হয়তো জমা হয়ে আছে ঢাকার হেড পোস্ট অফিসে। কেন, তা বোধহয় আন্তর্জাতিক ডাক-যোগাযোগের কারণে ঘটে থাকবে। বাংলাদেশ এবার শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যার কবলে পড়েছে। রাজধানী ঢাকার সাথে গোটা দেশের সড়ক-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রায় দুমাস হতে চলল আমরা পানিবন্দি হয়ে আছি। আমি তোকে লিখছি এখন— কোনো রিডিং বা বেডরুমের টেবিলে বসে নয়, স্রেফ একটা নৌকার পাটাতনে বসে। বাজারঘাট, দোকানপাট সবই এখন ভাসমান অবস্থায় চলছে। বলতে গেলে গোটা দেশটাই ভাসছে পানির উপর। খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধপত্র ইত্যাদির অভাবে এদেশের মানুষ এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে।

পল্লীঅঞ্চলে দুস্থদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তারা একতলা স্কুলঘরের ছাদে, অথবা উঁচু মাচাং পেতে তার উপর বাস করছে। তাদের সম্পদ বলতে কিছুই নেই। সরকারি রিলিফের ওপর নির্ভর করে তারা কোনো প্রকারে জীবনে বেঁচে আছে। এসময় কে কাকে সাহায্য করবে বল। যদি হঠাৎ কেউ মারা যাচ্ছে তার ভাগ্যেও মাটি হচ্ছে না। বন্যার পানি যদি আরও কিছুকাল অবস্থান করে তা হলে আমাদেরও দুস্থদের কাতারে গিয়ে শামিল হতে হবে। আমাদের সবার জন্য দোয়া করিস।

ইতি
আবির

২০. নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখ।

এম এম কলেজ
যশোর।
২১.০৭.২০০৮

প্রিয় তুহিন,

আমার শুভেচ্ছা নিও। তোমার লেখা চিঠি গত পরশু আমার হাতে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার চিঠি আমাকে খানিকটা বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। তুমি লিখেছিলে আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি যুক্তি দেখিয়েছিলে, গ্রামগঞ্জের নিরক্ষর লোকেরাই কিছু পরিমাণ এখনও সৎ আছে। লেখাপড়া শেখা অধিকাংশ লোকই অসৎ প্রকৃতির। জানি তোমার এটা ক্ষোভের কথা, দুঃখের কথা। কিন্তু মনের আসল কথা নয়।

আসল কথা হল, একজন শিক্ষিত মা হলে শিক্ষিত সন্তান সে জাতিকে উপহার দিতে পারবে। এভাবে সকল মা শিক্ষিত হলে আমরা একটি শিক্ষিত জাতিতে পরিণত হব। শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকের পার্থক্য বোধহয় তোমাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। গ্রামাঞ্চলের একজন নিরক্ষর ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়, নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অগ্রসরমাণ বিশ্বের অনেক কিছু সম্পর্কেই সে ধারণা করতে পারে না। চোখ থাকতেও সে শুধু নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে না, গোটা জাতিরও সর্বনাশ সাধন করে।

হয়তো যুক্তি দেখাবে, জীবনে চলার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে অক্ষরজ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি বলি একজন নিরক্ষর ব্যক্তি কখনও পুস্তকসমুদ্রের বিশাল জ্ঞানের সন্ধান পায়নি। নিজেরা নিরক্ষরতামুক্ত হলে তারা বিভিন্ন বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে জ্ঞানের নতুন নতুন পথের সন্ধান পেত। কোনো লোক তাকে আর ঠকাতে পারত না, উল্টাপাল্টা বোঝাতে পারত না। নিজেরা যেমন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলত তেমনি সংক্রামক রোগ তাদের মাধ্যমে আর ছড়িয়ে পড়ারও ভয় ছিল না। মূলকথা, একজন শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। নিজেকে সে যেমন রক্ষা করতে চায় তেমনি তার মাঝে জাতীয়তাবোধেরও উন্মেষ ঘটে। নিরক্ষরতা জাতির জন্য অভিশাপ। আর এ কারণেই যে-দেশের লোক যত বেশি শিক্ষিত তারা তত বেশি আত্মসচেতন, স্বাবলম্বী ও উন্নত।

অনেক কিছু লিখলাম। তোমার এখনও যদি দ্বিমত থাকে তবে লিখে জানাবে। আমি ভালো আছি। তোমার মঙ্গল কামনা করি।

ইতি
তোমার বন্ধু তানভির

প্রেরক	ডাকটিকিট প্রাপক ....

২১. একুশের বইমেলা সম্পর্কে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

ঢাকা
২১.২.২০০৮

প্রিয় উদয়,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কোরো। দেশ থেকে বছর চারেক আগে বাইরে গিয়েছ। ইতোমধ্যে দেশের অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সব খবর তোমার কাছে হয়তো যায়নি। আমি একুশের বইমেলার বর্তমান অবস্থাটা তোমার কাছে তুলে ধরতে চাই। মনের চোখ দিয়ে দেখতে তোমার ভালোই লাগবে।

এ বছর একুশের বইমেলা যথারীতি জাতীয় মননের প্রতীক বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়েছিল। তবে তার সীমানা আর অবয়ব আগের সকল বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়ে গেছে বলে তা ছিল অনন্য। সামনের কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ-পুরানো হাইকোর্ট থেকে শাহবাগের মোড় পর্যন্ত ছড়ানো এলাকায় প্রায় দুশর বেশি বইয়ের দোকানের সাথে টিএসসি-সংলগ্ন ও দোয়েল চত্বর এলাকায় বেসাতি সাজিয়েছিল ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যে লোকশিল্পের সমারোহই ছিল বেশি।

তবে দোকানের সংখ্যাটাই বড় কথা নয়—যেদিকটি বড় হয়ে উঠেছিল তা হল জনতার ঢল। প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অগণিত মানুষের পদচারণায় মুখরিত ছিল মেলার সুবিশাল অঙ্গন। সবাই যে বই কিনতে আসে এমন নয়, অনেকে আসে বই দেখতে, নতুন বইয়ের খোঁজ নিতে। কবি-সাহিত্যিকগণ আসেন পরস্পর দেখাসাক্ষাতের সুযোগ নিতে। কেউ আসেন ভক্তদের সাক্ষাৎ দিতে। কেউ-কেউ এমনিতেই ঘুরে বেড়ান। তবে বইয়ের ক্রেতার সংখ্যাও কম নয়। অনেকের হাতে বইয়ের প্যাকেট।

বইমেলার আকর্ষণ শুধু বই নয়। আছে অনেক কিছুই। বাংলা একাডেমী পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বক্তৃতামালা আর আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। বাংলা একাডেমীর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানও হয়েছিল। সংগীতানুষ্ঠান আর নাট্যানুষ্ঠান ছিল প্রত্যেক সন্ধ্যার নিয়মিত কর্মসূচি। গানের বৈচিত্র্য অগণিত দর্শক-শ্রোতার মনে দাগ কেটেছে। বইমেলার এসব অনুষ্ঠান ও আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্য আর সংস্কৃতির সাথে পরিচয়লাভে সমাগত জনতা আনন্দিত হয়েছে, অভিভূত হয়েছে। তবে বই কিনে বা বই দেখে নিজস্ব সাহিত্যের সাথে যে পরিচিতি ঘটেছে তা জীবনে তাৎপর্য সৃষ্টিকারী বলে বিবেচিত হতে পারে। নতুন বই প্রকাশের প্রেরণা দেয় একুশের বইমেলা।

একুশের বইমেলায় আনন্দ আছে। কিন্তু এতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আছে জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেমের চেতনা সৃষ্টিতে। দেশের প্রতি, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার যে-প্রকাশ বইমেলায় তা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য বিশেষ তাৎপর্যের দাবিদার। এ হাওয়া অক্ষুণ্ণ থাকুক।

আজকে এ পর্যন্ত। আবারো প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
আশিস

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	

২২. পরীক্ষার পর বন্ধুকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ গ্রামে অবস্থিত তোমার বাড়িতে বেড়াতে আসার অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র লেখ।

কুমিল্লা
২১.২.২০০৮

দোস্ত সুমন,

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার পরীক্ষার উত্তম প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে খুশি লাগছে। আগামী পরীক্ষার সুফল তোমার জীবনকে আনন্দে ভরে তুলুক।

পরীক্ষা নিয়ে তোমার অপরিসীম ব্যস্ততা তো আছেই। তবে পরীক্ষার পর তোমার তো বিস্তর অবসর। কী করবে তখন? এক কাজ কর না। পরীক্ষার খাটুনির জন্য পরিশ্রান্ত তোমার দেহমনকে চাঙ্গা করার জন্য তুমি চলে এসো আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে। হ্যাঁ, কিছুদিন বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। তোমার কাছে আমাদের গ্রামটি নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। পাখি-ডাকা, ছায়া-ঢাকা আমাদের গ্রাম। গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শীর্ণ রুপালি নদী। প্রকৃতির সবুজের মাঝে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। সময় কাটবে ভালো। আমাদের 'পল্লীমা যুব সংঘের' বন্ধুদের কাছে তোমার কথা বলা হয়ে গেছে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, আমাদের গ্রাম যা গাছপালায় ছেয়ে আছে, গাছের নিচ দিয়ে চলে গেছে পায়ে-চলার পথ, ঘাসের উপর দিয়ে ভোরবেলায় হাঁটলে শিশির তোমার পা ধুয়ে দেবে। পাখির গানে মুখরিত প্রহরে তোমার মনে জমে উঠবে প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা। নদীর পাড়ে বসে নৌকা চলাচল দেখে দেখে যখন তোমার চোখ শ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন চোখে কাজল বুলিয়ে দেবে সূর্যাস্তের মায়াময় দৃশ্য। এখানকার প্রকৃতির সবকিছুই উপভোগ্য হবে তোমার কাছে। তাই তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তুমি এসেই দেখো না কেমন শান্ত আর সুখকর আমাদের গাঁ! আন্তঃনগর ট্রেনে আখাউড়া স্টেশনে নেমে পূর্বদিকে রিকশায় দূরত্ব এক মাইল। পিচঢালা পথ তোমাকে টেনে নিয়ে আসবে আমাদের গাঁয়ের প্রকৃতির কোলে। এখানেই শেষ করছি— তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

ইতি
তোমার সুহৃদ

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	

আবেদনপত্র

ব্যবহারিক নানা কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে যে চিঠিপত্র লেখা হয়, তাকে আবেদনপত্র বলে। ছুটি, বৃত্তি, অনুমতি, অভিযোগ, সাহায্য, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে পত্র লেখা হয়। বিষয় অনুযায়ী বক্তব্য থাকবে পত্রে। তবে এ ধরনের পত্র লেখার নির্দিষ্ট রীতি আছে। আর সব সময় পত্রের ভাষা সহজ-সরল ও শুদ্ধ হতে হয়। বিষয় ও বক্তব্য স্পষ্ট করে লেখা উচিত। সম্ভাষণ, বিষয়বস্তু, নিবেদন ইত্যাদি বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্রের কয়েকটি নমুনা

১. অসুস্থতার কারণে স্কুলে উপস্থিত না থাকায় প্রধান শিক্ষকের বরাবরে ছুটির আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শৈলকুপা।

মাধ্যম : শ্রেণীশিক্ষক।

বিষয় : ছুটির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ১২ই মার্চ থেকে ১৬ই মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত এই ৫ (পাঁচ) দিন শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় আমি স্কুলে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, সবিনয় প্রার্থনা, আমাকে উল্লিখিত দিনগুলোর ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত

তারিখ : ১৭ই মার্চ ২০০৮

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
শেখ রবিউল ইসলাম
সপ্তম শ্রেণী, ক্রমিক নং-২

২. বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে পরবর্তী ঘণ্টাগুলোর জন্য ছুটির আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
সরকারি পি.এন.গার্লস স্কুল, রাজশাহী।

মাধ্যম : শ্রেণীশিক্ষক।

বিষয় : হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় ছুটির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আজ বিদ্যালয়ে এসে প্রথম ঘণ্টার ক্লাস করবার সময় থেকে হঠাৎ আমার পেটে ব্যথা শুরু হয়। কিন্তু এখন থেকে তা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে বলে আমি ক্লাসে বসে থাকতে অক্ষম।

অতএব, সবিনয় নিবেদন, আমাকে পরবর্তী ঘণ্টাগুলোর জন্য ছুটি মঞ্জুর করলে বাধিত হব।

বিনীত

তারিখ
১৪ই এপ্রিল, ২০০৮

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রী
দিল আফরোজ সুইটি
অষ্টম শ্রেণী, ক্রমিক নং-১

৩. জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
সেগুনবাগিচা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

মাধ্যম : শ্রেণীশিক্ষক।

বিষয় : জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, আমি আপনার স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখেই আমার মাসিক বেতন পরিশোধ করে আসছি। কিন্তু এবার বাড়ি থেকে দেরিতে টাকা পাওয়ার কারণে নির্ধারিত দিনে বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হই। তাই আমি আজ চলতি মাসের বেতন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক।

অতএব, সবিনয় প্রার্থনা এই যে, আমি যাতে জরিমানা ছাড়াই বেতন পরিশোধ করতে পারি সে অনুমতি দিলে বাধিত হব।

বিনীত

তারিখ : ১০ই জানুয়ারি ২০০৮ ইং

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
চঞ্চল মাহমুদ
সপ্তম শ্রেণী, ক্রমিক নং ৭

৪. বিনা বেতনে পড়ার অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
বাংলাবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

বিষয় : বিনা বেতনে পড়ার আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। আমার বিধবা মা একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। আমার আরও দুই বোন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। আমাদের পরিবারে উপার্জনক্ষম আর কেউ না থাকায় মায়ের অবসরকালীন ভাতার সাহায্যে সংসার খরচ ও লেখাপড়ার খরচ চালানো খুবই দুঃসাধ্য।

উল্লেখ্য, মেধা অনুসারে আমি প্রথম স্থান অধিকার করে যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হই এবং আন্তঃস্কুল দাবায় পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে আপনার স্কুলের পক্ষে সম্মান বয়ে আনি।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আমাকে আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দেওয়ার জন্য সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত

তারিখ : ১৮ই মার্চ, ২০০৮

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রী
ফেরদৌসী জামান
অষ্টম শ্রেণী, ক্রমিক নং–১

৫. ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদন পত্র লেখ।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
মতিঝিল গার্লস স্কুল, মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় : কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর একজন নিয়মিত ছাত্রী। তিন বছর যাবৎ আমি এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছি। গত বার্ষিক পরীক্ষায় আমি ৭ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি এবং প্রথম স্থান অধিকার করেছি। আমার বাবা একজন সামান্য বেতনভোগী চাকরিজীবী। সম্প্রতি তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিধায় পরিবারে অভাব অনটন বাড়ছে। এমতাবস্থায় আমার লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি আমার পরিবারের বড় সন্তান। আমার লেখাপড়া বন্ধ হলে পুরো পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। আমাকে কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য করে এবং বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

অতএব মহোদয়, আমার আবেদন মানবিকভাবে বিবেচনা করে আমাকে কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক

তারিখ :
০১.০২.২০০৮

আয়েশা আক্তার
৮ম শ্রেণী, রোল–১।

৬. বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখ।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
ঘোড়াশাল উচ্চ বিদ্যালয়, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

বিষয় : বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমি তিন বছর যাবৎ এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছি। আমার বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী। সম্প্রতি তাঁকে ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। তাই পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় যাবার কারণে আমার এই বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র নেয়া প্রয়োজন। ঢাকায় আমি ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক।

অতএব মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রী
মাশাফিক আনজুম অর্ণব
৮ম শ্রেণী, রোল নং–১

তারিখ :
২০/৭/২০০৮

৭. তোমার স্কুলে একটি বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখ।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
মোহনপুর হাইস্কুল, রাজশাহী।

বিষয় : বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের অনুমতির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমরা সম্মিলিতভাবে একটি বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের প্রয়োজন দীর্ঘদিন থেকেই অনুভব করছি। বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া বর্তমান সভ্যতায় শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। তাই বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে বিজ্ঞান ক্লাব দরকার। বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হলে নিয়মিত বিজ্ঞানবিষয়ক সভা, সেমিনার, পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

অতএব মহোদয়, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত
৮ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
মোহনপুর হাইস্কুল, রাজশাহী।

তারিখ :
২০/১২/২০০৮

৮. শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে অধ্যক্ষের কাছে আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
সরকারি কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী।

বিষয় : শিক্ষাসফরে গমনের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়

সবিনয় নিবেদন, আমরা অন্যান্য বারের মতো আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত ঐতিহাসিক স্থান পাহাড়পুরে শিক্ষাসফরে যেতে চাই। এই শিক্ষাসফরের মাধ্যমে আমরা বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য ও নিদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

আমাদের গ্রুপে ছাত্রছাত্রী থাকবে পঞ্চাশ জন। ছাত্রছাত্রীরাই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। আমাদের সাথে দুজন সিনিয়র শিক্ষক যেতে রাজি হয়েছেন। আপনার সম্মতি পেলে এবং শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাসফরে গেলে আমাদের অভিভাবকরাও অনুমতি দেবেন।

অতএব, আমরা আশা করি, আপনি আমাদের শিক্ষা সফরের সদয় অনুমতি দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে আমাদের বাধিত করবেন।

বিনয়াবনত

তারিখ : ২২–০৬–২০০৮

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
মাহমুদুল হাসান
সরকারি কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী।

৯. তোমাদের ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য তোমার জেলার ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকট একখানি আবেদনপত্র লেখ।

মাননীয়
জেলাপ্রশাসক
পঞ্চগড় জেলা।

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, পঞ্চগড় জেলার হরিপুর ইউনিয়নটি শিক্ষাদীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি করেছে, তেমনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে গ্রামে এসেছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। গ্রামের এ সমৃদ্ধি ধরে রাখা এবং তা আরও বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ ও সর্বাধুনিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন বলে মনে করি।

এ প্রয়োজন সাধনের জন্য আমাদের হরিপুর ইউনিয়নে একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজন। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষত জনজীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত বইপত্র এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সরকারি ইশতেহার ইত্যাদি সংগৃহীত থাকবে। এলাকায় নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই পাঠাগার ব্যবহার করতে পারবে।

এলাকার একজন শিল্পপতি ও দানশীল ব্যক্তি পাঠাগারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করতে সম্মত হয়েছেন। ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র, বই–পুস্তক, কর্মচারী ইত্যাদির জন্য আপাতত ৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে হরিপুর ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক

তাং ১২.০২.০৮

আপেল, আব্দুল্লাহ
হরিপুর।

১০. তোমাদের ক্লাবের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থসাহায্য চেয়ে জেলাপ্রশাসকের নিকট আবেদন কর।

বরাবর
জেলাপ্রশাসক, বগুড়া।

বিষয় : উন্নয়নকাজের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, বগুড়া নবীন সংঘ বিগত ১২ বছর ধরে শহরের উপকণ্ঠে রসুলপুর গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। গ্রামটিকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে রূপ দেওয়ার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। নবীন সংঘের তরুণ ও উৎসাহী কর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছে।

কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে আদর্শ গ্রামের সম্পূর্ণ রূপায়ণ এখনও সম্ভবপর হয়নি। রাস্তাঘাটের সংস্কার, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রভৃতি অসমাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা ছাড়াও সম্প্রতি গৃহীত মৎস্যচাষ প্রকল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খামার এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে নবীন সংঘকে দুই লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক
ইসমাইল ফারুক
সম্পাদক
নবীন সংঘ, বগুড়া।

বগুড়া
তারিখ– ০৯.০৬.২০০৮

১১. তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট একখানা আবেদনপত্র লেখ।

বরাবর,
প্রধান প্রকৌশলী
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ।

বিষয় : বিদ্যুৎ সরবরাহের আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, নওগাঁ শহরের উপকণ্ঠে হোসেনপুর গ্রামটি একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা। ইতোমধ্যে শহরের সাথে এ-গ্রামের যোগাযোগ সম্পন্ন হয়েছে এবং শহরের কিছু কিছু প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে। গ্রামের অধিবাসীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে ছোটখাটো শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। গ্রামের বিপুলসংখ্যক বেকার যুবক নিজেদের বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য পথের সন্ধান করছে।

গ্রামটির উন্নয়নের প্রধান বাধা বিদ্যুতের অভাব। এখন পর্যন্ত এ-গ্রামে বিদ্যুতের সংযোগ সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে। অথচ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এ-গ্রামে বিদ্যুৎব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গ্রামবাসী জড়িত হয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের পথ খুঁজে পেত এবং জাতীয় জীবনে অবদান রাখাও সম্ভব হত।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হোসেনপুর গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, গ্রামবাসী এজন্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদর্শনে সম্মত রয়েছে।

নিবেদক
হোসেনপুর গ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
অনুপম হাসান
হোসেনপুর।

তারিখ ০৪–০৬–২০০৮

১২. তোমার বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোজনের জন্য বিভাগীয় পরিচালকের নিকট একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

বরাবর,
বিভাগীয় পরিচালক,
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
পটুয়াখালি উপবিভাগ সমীপে।

বিষয় : নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, সম্প্রতি ১০৫ কলেজ রোডে আমাদের নিজস্ব জমিতে একটি একতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগদান প্রয়োজন।

বাড়িটিতে গৃহস্থালি কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার সীমিত থাকবে। কর্তৃপক্ষের নিয়মকানুন মেনে চলব এবং প্রয়োজনীয় জামানত ও আনুষঙ্গিক ব্যয় পরিশোধে সম্মত রয়েছি।

এ অবস্থায় অবিলম্বে উক্ত ভবনটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
নিয়ামত হাসান
১০৫ কলেজ রোড
পটুয়াখালি।

পটুয়াখালি
তারিখ : ১২.০৬.২০০৮

১৩. বনভোজন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তোমার শ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
সরকারি ল্যাবরেটারি হাইস্কুল, ঢাকা।

বিষয় : বনভোজনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ বিগত বছরের মতো এবারও বনভোজনে যেতে চাই। আগামী জানুয়ারি এ বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে কুমিল্লা শহরের

উপকণ্ঠে লালমাই পাহাড়ে। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ময়নামতির বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আর জাদুঘর অনন্য আকর্ষণীয় বলে আমাদের কাছে বিবেচিত। শুধু বনভোজনের আনন্দ উপভোগ নয়, আমাদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সাথে পরিচয়েরও দুর্লভ সুযোগ হবে এ বনভোজনের আয়োজনে।

বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মতিন সরকার ও প্রফেসর রেবেকা সুলতানা আমাদের পরিচালনায় থাকবেন বলে সদয় সম্মতি দিয়েছেন। আমাদের জন্য ছাত্রসংসদ থেকে বরাদ্দ অর্থ এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত চাঁদায় এ বনভোজনের ব্যয় নির্বাহ হবে। আমরা ভোর ছটায় কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা করব এবং রাত আটটায় ঢাকা ফিরে আসব।

অতএব, আমাদের বনভোজনে যাওয়ার অনুমতি-দানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত
৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ।

তারিখ : ১৮.১২.২০০৮

১৪. তোমার এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট একটি দরখাস্ত লেখ।

বরাবর
মহাপরিচালক,
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর, ঢাকা।

বিষয় : প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, শিবগঞ্জ শিমুলতলী জেলার গ্রামটি শিক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। চার বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যে এ-গ্রামে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় বিপুলসংখ্যক শিশুর পক্ষে খাল-বিল পার হয়ে পাশের গাঁয়ের শাপলা কুঁড়ি বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এলাকার শিশুরা নিরক্ষর থেকে দেশে অশিক্ষার পরিস্থিতিকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।

সরকার দুহাজার দশ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু এ এলাকায় কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় সরকারের এ মহতী উদ্যোগ ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি স্থানীয় জনগণ দান করতে সম্মত হয়েছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এলাকার বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হবে বলে গ্রামবাসী অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে শিমুলতলী গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত
মেহবুব, ইলিয়াস
শিমুলতলা, মুন্সীগঞ্জ।

তারিখ : ২৫.০৬.২০০৮

১৫. বন্যার্তদের আশু সাহায্যদানের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন।

বরাবর
জেলাপ্রশাসক, চাঁদপুর।

বিষয় : বন্যাপীড়িতদের জন্য আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ থানার দরিয়াপুর ইউনিয়নের সুরমা গ্রামের অধিবাসী। সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে নদীতীরবর্তী জনসাধারণের যে ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনাতীত। এদের অনেকেরই ঘর-বাড়ি, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু ইত্যাদি বন্যার পানিতে ভেসে গেছে এবং বন্যাউত্তর সংক্রামক রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। অন্যান্য গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীরা সরকারি সাহায্য পেয়ে থাকলেও আমাদের গ্রামের কেউ এখন পর্যন্ত পুনর্বাসিত হওয়ার মতো কোনো সাহায্য পায়নি। এ গ্রামে সরকারি সাহায্যের নামে ক্ষতিগ্রস্তদের মাথাপিছু মাত্র পাঁচ কেজি করে আটা সরবরাহ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীর পুনর্বাসনের জন্য আশু সরকারি সাহায্য বরাদ্দের প্রয়োজন।

অতএব, জনাব মেহেরবানিপূর্বক অত্র গ্রামবাসীর আহারের ব্যবস্থা করে এবং আগামী রবি মৌসুমের জন্য বীজ, সার, গরু, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য দান করে বাধিত করবেন।

বিনীত
নিবেদক
ইব্রাহিম মোল্লা
বন্যাকবলিত গ্রামবাসীদের পক্ষে
সুরমা, মতলব, চাঁদপুর।

মতলব, চাঁদপুর:
তারিখ– ২০–০৬–২০০৮

১৬. ডাকঘর স্থাপনের জন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন।

বরাবর
পোস্টমাস্টার জেনারেল,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা।

বিষয় : ডাকঘর স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার হরিণচড়া গ্রামের অধিবাসী। এ গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। এ গ্রামের অধিকাংশ লোক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে থাকে। এ ছাড়া প্রায় ৫০০ জন লোক বিদেশে চাকরি করে। এ-গ্রামে একটি বাজার, একটি উচ্চবিদ্যালয়, একটি মাদ্রাসা, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এ-গ্রাম থেকে আশপাশে ৫ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো পোস্ট অফিস নেই। তাই প্রতিদিন চিঠিপত্র দিতে এবং পেতে অনেক বেগ পেতে হয়।

অতএব, মহামান্য সমীপে আবেদন, হরিণচড়া গ্রামে একটি শাখা ডাকঘর খোলার ব্যবস্থা করে জনগণের দুঃখ লাঘব করার জন্য বিশেষ আবেদন করছি।

বিনীত
নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
মোঃ আবু বকর
গ্রাম : হরিণচড়া, উপজেলা : সিংড়া,
জেলা : নাটোর।

তারিখ : ১লা জানুয়ারি, ২০০৯

১৭. একটি নলকূপ স্থাপনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন।
অথবা, একটি নলকূপ স্থাপনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন কর।

বরাবর
চেয়ারম্যান
১০ নং আলিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
আলিপুর, সাতক্ষীরা।

বিষয় : নলকূপ স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

আমরা আপনার ইউনিয়নের সুন্দরপুর গ্রামের অধিবাসী। আপনি অবগত আছেন এ-গ্রামে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বাস। অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষক এবং দিনমজুর শ্রেণীর। দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা পানীয় জলের অভাবে পুকুর ও নদীর পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি এবং নানা প্রকার পানিবাহিত সংক্রামক রোগের শিকার হচ্ছি। এ-গ্রামের চৌধুরীবাড়িতে একটি মাত্র ব্যক্তিগত নলকূপ আছে যা সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার্য নয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটা নলকূপ স্থাপিত হয়ে থাকলেও গৃহবধূরা দিনের বেলা সেটা ব্যবহার করতে পারে না। তা ছাড়া নলকূপটি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অধিকাংশ সময়ই অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। অথচ নিজস্বভাবে আমরা নলকূপ ক্রয় করে বাড়িতে বসিয়ে নেব এ সঙ্গতিও কারও নেই।

অতএব, আপনার সমীপে আরজ এই যে, মেহেরবানিপূর্বক আপনার ইউনিয়নের এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সরকারিভাবে আপনার পছন্দমতো স্থানে একটি নলকূপ স্থাপন করে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

বিনীত নিবেদক
মাশফিক আনজুম অর্ণব
গ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
আলিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, আলিপুর, সাতক্ষীরা।

তারিখ–২০.০৫.২০০৮
সুন্দরপুর

১৮. মশার উপদ্রব নিরসনের জন্য পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন।

বরাবর
চেয়ারম্যান
ঈশ্বরদী পৌরসভা, ঈশ্বরদী।

বিষয় : মশার উপদ্রব নিরসনের জন্য আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা ঈশ্বরদী শহরের নিরালা এলাকার অধিবাসী। এলাকাটি পৌরসভার চিহ্নিত একটি অবহেলিত এলাকা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকাটি আপনার সুদৃষ্টিলাভে বঞ্চিত হচ্ছে। আপনার পৌরসভার অন্যান্য এলাকা যে-হারে সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে অত্র এলাকাটিও সে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা লাভের আশা করে। কারণ অত্র এলাকার অধিবাসীদেরও নিয়মিতভাবে পৌরকর পরিশোধ করতে হয়। এখানকার রাস্তায় সোডিয়াম বাতি জ্বলে না; আবর্জনা নিষ্কাশন বা অপসারণেরও নিয়মিত কোনো ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি এসব কারণ মশার উৎপাত বিস্তারে সাহায্য করছে। আপনার পৌরসভার অন্যান্য এলাকায় মশা তাড়ানোর জন্য ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের এলাকায় একাজে নিয়োজিত কোনো কর্মীর মুখই আমরা কেউ কোনোদিন দেখিনি।

এ অবস্থায়, আপনার সমীপে সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, অনতিবিলম্বে নিরালা এলাকার অধিবাসীদের মশার উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতিদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

তারিখ–০৬.০৭.২০০৮
ঈশ্বরদী।

নিরালা এলাকাবাসীর পক্ষে
সাহিদ হাসান।

মানপত্র

১. বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধার সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা কর।

তারিখ : ২৭/০৮/২০০৮

দেশবরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক জনাব ... এর চিরিঙ্গা আগমন উপলক্ষে চকরিয়া থানার অধিবাসীর প্রাণঢালা সংবর্ধনা।

হে মহান অতিথি,

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আজ আপনার আগমনে আমাদের এলাকার প্রতিটি মানুষ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। আপনার আগমনে আমাদের এলাকায় আনন্দের ঢেউ উঠেছে। আপনি আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে বরেণ্য,

আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীর সৈনিক। আজ আপনার আগমনে আমরা আত্মহারা। আপনার মতো একজন মহান ব্যক্তিকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে আমরা আনন্দে আপ্লুত। তাই আমরা আপনাকে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছি। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে বীরপ্রতীক,

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আপনার অসম সাহসিকতার বিনিময়ে দেশ আজ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আপনার এ অসাধারণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার আপনাকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করেছে। আপনার গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত। সেজন্য আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন।

হে মহান দেশপ্রেমিক,

আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন অকুতোভয় বীর সেনানী! সকলের মতো মৃত্যুভয় সে সময় আপনাকে গ্রাস করেনি। আপনার যুদ্ধকৌশল এবং শত্রুদের আঘাত হানার পারদর্শিতায় বর্বর বাহিনীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে

লাখো লাখো বাঙালি। দেশে ফুটেছে স্বাধীনতার হাসি। আপনি আমাদের হৃদয়-উৎসারিত সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে আপোসহীন সংগ্রামী,

আজ এ গৌরবের দিনে আপনাকে সম্মান জানাবার ভাষা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কোনো আর্থিক উপহার দিয়ে আপনাকে ছোট করার সাহস আমাদের নেই। তাই আপনাকে আমরা আমাদের অস্তিত্ব দিয়ে বরণ করে নিচ্ছি। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। মানুষের মনে চিরজাগরূক হয়ে থাকুন আজ এ প্রার্থনা করি।

বিনীত
আপনার গুণমুগ্ধ
রিপন তালুকদার।

২. তোমার পরিচিত কোনো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হওয়ায় তাঁকে উদ্দেশ্য করে একটি অভিনন্দন-পত্র রচনা কর।

জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হওয়ায় প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও কবি প্রফেসর ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রতি আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন।

হে মহান সাহিত্যব্রতী,

আজ প্রভাতে আমার ঘুম ভেঙেছিল ভোরের পাখির গানে। প্রতিদিন এমনটি হয় না। আজ হয়তো আমার জন্য একটি খুশির দিন অপেক্ষা করেছিল বলেই এমন হয়েছে। বিছানা ছেড়েই আমি প্রভাতের হাওয়া গায়ে লাগাতে একটু ঘুরে আসি। ঘুরে এসেই দেখি হকার পত্রিকা দিয়ে গেছে। পত্রিকায় চোখ রাখতেই দেখি আপনার ছবি। নিচে লেখা বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ জাতীয় সম্মান একুশের পদকে ভূষিত। আমি সংবাদটিতে দ্রুত চোখ বুলাই। লেখা প্রফেসর আলাউদ্দিন আল আজাদের সাহিত্যিক জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেছে। সংবাদটি পড়ার সাথে সাথে আমি সরাসরি আপনাকে কোন ভাষায় স্বাগত জানাব সে-ভাষা আমার জানা নেই। আপনি আমার হৃদয়াবেগপূর্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে বরেণ্য কবি,

চিরকালই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে যে মহান ব্যক্তিরা স্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন আপনি তাঁদের অন্যতম। বাংলা কবিতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আপনার দান অনেক। দেশের মানচিত্র পেরিয়ে আপনার পরিচিতি পৃথিবীর নানা জায়গার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকটও পৌঁছেছে। সমাজবাস্তবতার নিরিখে আপনি অত্যন্ত শিল্পসফল সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। দেশ ও জাতির সংগ্রামী জীবন আপনার সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

তাই আপনি সমগ্র বাঙালি জাতির গৌরবের পাত্র। আপনাকে হৃদয়ের স্বতোৎসারিত অভিনন্দন জানাচ্ছি। হয়তো বড় বড় সভা হবে, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাকে সংবর্ধনা দেয়া হবে। কিন্তু আমার এ অভিনন্দন হৃদয়ের সবখানি শ্রদ্ধামিশ্রিত।

হে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ,

আপনি শিক্ষকের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে দারিদ্র্যপীড়িত অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিতে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনার অবদান জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

হে দেশমাতৃকার গৌরবদীপ্ত সন্তান,

সাহিত্য রচনায় আপনার অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। অমর একুশের স্মরণীয় কবিতা *স্মৃতির মিনার*, *মৃগনাভি* ও *জেগে আছি* গল্পগ্রন্থ ও অমর উপন্যাস *ক্ষুধা ও আশা* রচনার মাধ্যমে আপনার এই অমরতা। আপনার সাহিত্যসৃষ্টি পৃথিবীর

কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আপনি আমাদের গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। আমরা আপনার নীরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করি।

বিনীত
আপনার গুণমুগ্ধ
কল্লোল

৩. শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে সংবর্ধনাপত্র।

সরকারি কলেজিয়েট হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষক... বিদায় উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে মহান শিক্ষক,

মহান উদ্দেশ্য ও আলোকময় উদ্দীপনা নিয়ে আপনি এ বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষাদানে ব্রতী হয়ে। আপনার শিক্ষায় আলোকিত হয়েছে এ বিদ্যালয়ের শত শত ছাত্র। তারা আপনার কাছে পেয়েছে মহৎ হবার অনুপ্রেরণা। এ বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের সাথে ছিল আপনার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। হৃদয় দিয়ে আপনি তাদের গ্রহণ করেছিলেন। আপনার আচার–আচরণ, ব্যবহার, সৌজন্য, মমত্ব, ভালবাসা প্রত্যেকের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। আপনার বিদায়ে তাই আমরা আবেগাপ্লুত ও মর্মাহত।

হে শিক্ষাগুরু,

আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার সাধনায় আপনি ছিলেন আমাদের প্রধান প্রাণপুরুষ। আপনি আমাদের উৎসাহিত করেছেন জীবনকে নানাভাবে বিকশিত করতে। পাঠ্যবিষয়ের বাইরে সমাজ–সংস্কৃতি–সাহিত্যের দিকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শিক্ষাসফরে আপনার দিকনির্দেশনা ছিল সবসময়। আপনার সহযোগিতা, সহমর্মিতা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে। আপনি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি গ্রহণ করুন।

হে প্রিয়জন,

আপনাকে বিদায় দিতে হবে সেটাই সত্য। তবু মন চাইছে না আপনাকে বিদায় দিই। আমরা কখনো আপনাকে ভুলব না, আপনিও আমাদের ভুলবেন না। আমরা না বুঝে আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। অনেক অপরাধ করেছি, আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনার আশীর্বাদ আমাদের সামনে চলার পথে দিকনির্দেশনা দেবে। কামনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী হোন, সুস্থ থাকুন, শান্তিতে থাকুন।

আপনার গুণমুগ্ধ
ছাত্রবৃন্দ
সরকারি কলেজিয়েট হাইস্কুল, ঢাকা।

ঢাকা
তারিখ : ১২.০৬.২০০৮

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য চিঠি

---

১. পানীয় জলের সংকট সমাধানের জন্য সংবাদপত্রে চিঠি।

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো,
সিএ ভবন
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কাওরান বাজার, ঢাকা

মহোদয়,
আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় আমাদের এলাকায় পানীয় জলের সমস্যাসংক্রান্ত চিঠিটি ছাপালে কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত
তারিখ : ১৩.০৬.০৮ ইসমাইল ফারাবী
নিউমার্কেট এলাকা
নোয়াখালি।

নিউমার্কেট এলাকায় পানীয় জলের সংকট সমাধানের আবেদন

আমরা নোয়াখালির নিউমার্কেট এলাকার বাসিন্দা। এ এলাকায় লোকসংখ্যা প্রচুর। এখানে পানি সরবরাহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। কোনো কোনো দিন পানি একেবারেই আসে না। জনগণ পানির অভাবে অসহ্য কষ্টকর জীবনযাপন করছে। মেয়েরা প্রতিদিন পানির জন্য দীর্ঘ লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে পানির ট্রাকের কাছে। এ এলাকায় পানির সমস্যা দীর্ঘদিনের। আমরা এ সমস্যার সমাধানকল্পে কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করি।

এলাকাবাসীর পক্ষে
ইসমাইল ফারাবী
নিউমার্কেট এলাকা
নোয়াখালি।

২. বিদ্যুৎসংযোগ প্রদানের জন্যে সংবাদপত্রে চিঠি।

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক বার্তা
রাজশাহী

মহোদয়,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক বার্তা' পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশের জন্যে 'দামকুড়ায় অবিলম্বে বিদ্যুৎসংযোগ চাই' শিরোনামে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি।

আশা করি, এলাকার সমস্যাভিত্তিক চিঠিটি প্রকাশে আমরা আপনার আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হব না। কৃতজ্ঞতাসহ—

বিনীত
তারিখ : ১২.৩.২০০৮ শামীম হাসান
রাজশাহী। দামকুড়া, কুড়িগ্রাম।

দামকুড়ায় অবিলম্বে বিদ্যুৎসংযোগ চাই

কুড়িগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত এবং অবহেলিত অঞ্চল দামকুড়া। বাংলাদেশের আর কোনো অঞ্চল এরকম অবহেলিত আছে বলে মনে হয় না। অনেক সরকার এসেছে, গেছে, তবু দামকুড়ার ভাগ্য বদলায়নি। তাই এখানে কখনও যে বিদ্যুৎ আসতে পারে সে-আশাও কেউ করেনি। তবু দুবছর আগে পল্লী বিদ্যুতের তার এসেছে, খুঁটি বসেছে বাজারে। বাজারে খুঁটি বসতে দেখে অচিরেই বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে— এ-আশা নিয়ে কেউ লেদ মেশিন কিনেছেন, কেউ স্টুডিও খুলে বসেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই শেষ। বাজারে বিদ্যুৎসংযোগ দেওয়া হয়নি। একই থানার অন্যান্য এলাকায় ইতোমধ্যেই সংযোগ দেওয়া হয়েছে। দামকুড়ায় সংযোগ দেওয়ার আগে ঐসব এলাকায় কীভাবে সংযোগ দেওয়া হল— এটাই এলাকাবাসীর মনে প্রশ্ন। এলাকাবাসী এ বৈষম্যের অবসান চায় এবং দ্রুত বিদ্যুৎসংযোগ চায়। এলাকাবাসীর জিজ্ঞাসা— কতদিন এভাবে

অপেক্ষা করতে হবে বিদ্যুতের জন্য, এই পথ চেয়ে থাকার অবসান হবে কি?

আমরা বিষয়টি সরেজমিনে দেখার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেসাথে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন— সঠিক উন্নয়নের স্বার্থে দামকুড়ায় অবিলম্বে বিদ্যুৎসংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করুন।

এলাকাবাসীর পক্ষে
শামীম হাসান
দামকুড়া, কুড়িগ্রাম।

৩. **তোমাদের এলাকায় একটি 'দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপনের প্রয়োজন। এ মর্মে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।**

বরাবর
সম্পাদক,
দৈনিক ভোরের কাগজ, মৌচাক, ঢাকা।

জনাব,
আপনার সম্পাদিত দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে নিচের আবেদনটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।

নিবেদক
খাজা সুমন
বিত্তি বাখরবা
খোকসা, কুষ্টিয়া।

বিত্তি বাখরবা
৩০শে জুন, ২০০৮

বিত্তি বাখরবায় দাতব্য চিকিৎসালয় চাই

কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানার অন্তর্গত বিত্তি বাখরবা একটি বৃহৎ গ্রাম। এ-গ্রামে প্রায় বিশ হাজার লোকের বসবাস। স্কুল, মাদ্রাসা ও মক্তব সব মিলিয়ে গ্রামটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ-গ্রামের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। তবে গ্রামের শতকরা আশি ভাগ মানুষ দরিদ্র কৃষক। দরিদ্র জনগণের চিকিৎসার জন্য কোনো দাতব্য চিকিৎসালয় এখানে আজ পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি। এখানে ভালো কোনো চিকিৎসালয় নেই। প্রায় তিন মাইল দূরে থানা সদরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। যোগাযোগের অসুবিধা থাকায় গ্রামের লোকেরা জরুরিভাবে কোনো রোগী নিয়ে যেতে পারে না। আধুনিক চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা নেই বলে এখানকার জনগণ এখনও ঝাড়-ফুঁক ও কবিরাজি চিকিৎসা নিতে বাধ্য হচ্ছে। তাই শত শত লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। প্রতি বছর এখানে টাইফয়েড, ডেঙ্গুজ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। এর ফলে অসংখ্য মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র ও চিকিৎসা। অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন সরকারি সাহায্য। তাই সরকারিভাবে এই প্রয়োজনীয় চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি সজাগ হওয়া একান্ত জরুরি।

অতএব, এ গ্রামের বিশ হাজার লোকের কল্যাণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

খাজা সুমন
বিত্তি বাখরবা
খোকসা, কুষ্টিয়া।

৪. তোমাদের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সম্পাদকের নিকট একটি চিঠি লেখ।

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় নিচের চিঠিটি ছাপিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
রশীদ খান
হেতম খাঁন
রাজশাহী।

তারিখ : রাজশাহী
১২.০৬.২০০৮

মাস্তানদের দৌরাত্ম্য রোধ করুন

হেতম খাঁন রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত একটি জনবহুল এলাকা। এখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বাস। সম্প্রতি এলাকাটি মাস্তানদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ-এলাকার শান্তিপ্রিয় সাধারণ জনগণ আজ অসহায়। সত্যিকার অর্থে মাস্তানদের কাছে তারা আজ জিম্মি। উঠতি বয়সী ছেলেরা এখানে বেপরোয়া জীবনযাপন করছে। তারা পাড়ার যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে জটলা পাকায়, অশোভন অঙ্গভঙ্গি করে এবং নানা প্রকার আপত্তিকর মন্তব্য ছোড়ে। তারা বয়স্ক নারী-পুরুষকে যখন তখন লাঞ্ছিত করে। তারা প্রায় প্রতিদিনই মারামারি আর ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকে। দোকান ভাঙচুর, হোটেল ভাঙচুর এ-এলাকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এলাকার বাসিন্দারা তাদের ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকে। সন্ধ্যার পর এখানকার রাস্তায় যাতায়াত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই এখানে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। এ মাস্তানরা সংঘবদ্ধভাবে পথচারীকে হয়রানি করে। অস্ত্র দেখিয়ে তারা ঘড়ি, অর্থ, ব্যাগ, ইত্যাদি ছিনতাই করে। মাঝে মাঝে দিনে-দুপুরেই তারা মহিলাদের কাছ থেকে গলার চেইন, হাতের বালা, কানের দুল ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়। তারা মাঝে মাঝে দোকানে দোকানে চাঁদা ওঠায়। এলাকার ব্যবসায়ী কিংবা ঠিকাদারদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে নেয়। যারা চাঁদা দিতে চায় না, তাদের তারা বেদম মারধর করে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। সম্প্রতি তারা টোবাকো কোম্পানির এক ঠিকাদারের বাসায় আক্রমণ চালায় এবং বাসার জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। জীবনের ভয়ে ঐ ঠিকাদার অভিযোগ করা তো দূরের কথা টুঁ শব্দটিও করেনি। রাতে তারা যেখানে-সেখানে আড্ডা জমায়। রাত দশটার পরে রাস্তা দিয়ে কোনো ভদ্রলোক হেঁটে যেতে পারে না। সন্ধ্যায় যখন লোডশেডিং হয় তখনই তারা উৎসব জমিয়ে ফেলে। এলাকাটি ক্রাইম জোন হিসেবে পরিচিত এবং এখানকার অনেক খবর ইতঃপূর্বে পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার হয়নি। বরং পত্রিকায় ছাপা হলে তাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। তাই এলাকার জনগণ মুখ বুজে সব সহ্য করে যাচ্ছে।

আমরা আশা করব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপরে দ্রুত প্রয়োজনীয় জরুরি পদক্ষেপ নেবেন।

হেতম খাঁন এলাকাবাসীর পক্ষে
রশীদ খান

৫. তোমার এলাকায় ক্রমবর্ধমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখ।

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক জনকণ্ঠ
৪৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

জনাব,

এতদ্‌সঙ্গে প্রেরিত 'ছিনতাইকারী থেকে মুক্তি চাই' শিরোনামযুক্ত সংবাদটি আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত
অনুপম চাকমা
চম্পকনগর
রাঙামাটি।

তারিখ : ১৬. ০৮. ২০০৮
রাঙামাটি

ছিনতাইকারী থেকে মুক্তি চাই

রাঙামাটি জেলার সদর থানায় চম্পকনগর এলাকার বাসিন্দারা এখন কতিপয় ছিনতাইকারীর হাতে জিম্মি। তাদের জীবন এখন অনেকাংশে দুর্বিষহ। একদিকে স্থানীয় গুটিকয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তির ছত্রচ্ছায়ায় লালিত মাস্তানদের নিত্যনতুন আবদার, অন্যদিকে ছিনতাইকারীদের নিত্য হুঙ্কার—এরই মধ্যে পিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন। প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো ব্যক্তি ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে। ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে সর্বস্বহারানো ব্যক্তিটি দৈহিকভাবেও নির্যাতিত হচ্ছে। কখনও কখনও নারীরা ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনকে এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে অবহিত করা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এটা তাদের অক্ষমতা কি না তাও বোঝা ভার। সে যা-ই হোক, আমরা সবাই নিরাপদে বাঁচতে চাই। কোনো প্রকার আতঙ্কে না থেকে চাই নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে। আর এ কারণেই উক্ত এলাকার নিরীহ জনতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করছে। আশা করি, অচিরেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এলাকাবাসীকে ছিনতাইকারীদের থাবা থেকে মুক্তি দেবেন।

এলাকাবাসীর পক্ষে
অনুপম চাকমা

অনুশীলনী

ব্যক্তিগত পত্র

১. তোমার স্কুলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখ।
২. পরীক্ষার পর অবসর কীভাবে কাটাবে তা জানিয়ে দূরের বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ।
৩. তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা জানিয়ে বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লেখ।
৪. তোমার দেখা বিজ্ঞানমেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।
৫. টাকা চেয়ে পিতার নিকট চিঠি লেখ।
৬. অসুস্থ শয্যাশায়ী বন্ধুকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি পত্র লেখ।
৭. বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখ।
৮. সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ছোট ভাইকে একটি পত্র লেখ।
৯. সাম্প্রতিক বন্যার কথা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।
১০. তোমার দেখা একটি ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখ।
১১. তুমি আগামী পরীক্ষার জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছ তা জানিয়ে তোমার পিতাকে একখানা চিঠি লেখ।
১২. দুর্ঘটনায় আহত বন্ধুকে সমবেদনা জ্ঞাপন করে একটি পত্র লেখ।
১৩. মহানগরীর পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

নিমন্ত্রণপত্র

১. স্কুলে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর।
২. তোমার বিদ্যালয়ে 'শিক্ষা সপ্তাহ' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের কর্মসূচিসহ নিমন্ত্রণপত্র রচনা কর।
৩. স্থানীয় একটি ফুটবল দলকে ফুটবল প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে একটি পত্র রচনা কর।
৪. তোমার বোনের বিয়ে উপলক্ষে একটি নিমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র

১. নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ।
২. শিক্ষাঙ্গান সন্ত্রাসমুক্ত করার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একখানি পত্র রচনা কর।
৩. শিক্ষাঙ্গান সন্ত্রাসমুক্ত রাখার উপায় সম্পর্কে তোমার পরামর্শ জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ।
৪. তোমার এলাকার যানবাহন-সমস্যার কথা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা কর।
৫. তোমাদের অঞ্চলের কোনো নদীর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একখানি পত্র লেখ।
৬. 'পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ' পালন করার অত্যাবশ্যকতা প্রমাণ করে দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশের উপযোগী একটি নাতিদীর্ঘ পত্র রচনা কর।
৭. তোমার এলাকায় বিদ্যুৎবিভ্রাটের সমাধান চেয়ে সংশ্লিষ্ট কৃর্তপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে একটি চিঠি লেখ।
৮. মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সতর্ক করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ।
৯. তোমাদের এলাকায় একটি 'দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপনের প্রয়োজন, এ মর্মে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।
১০. তোমাদের এলাকায় এডিস মশার উপদ্রব নিবারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা কর।
১১. তোমার এলাকায় কুটিরশিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখ।
১২. দেশের বর্তমান যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় সম্পর্কে তোমার মতামত সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লিখ।
১৩. ডাকঘর সংস্কারের আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রে চিঠি লেখ।
১৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা স্থাপনের আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রে একটি চিঠি লেখ।

১৫. বন্যাকবলিত দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে একটি চিঠি লেখ।
১৬. আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রে একটি চিঠি লেখ।
১৭. নদীর ভাঙনরোধে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সংবাদপত্রে একটি চিঠি লেখ।
১৮. ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ।

ব্যবসা/বাণিজ্যসংক্রান্ত পত্র

১. তোমার প্রয়োজনীয় বই এস এ পরিবহনে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে কোনো পুস্তক-ব্যবসায়ীর নিকট পত্র লেখ।
২. কোনো প্রকাশকের সাথে লেখকের একটি চুক্তিপত্র তৈরি কর।

ছুটি ও আবেদনপত্র

১. শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ।
২. বাড়ি যাওয়ার জন্য ছুটি চেয়ে ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়কের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ।
৩. পানীয় জলে আর্সেনিক আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ।
৪. তোমাদের ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য তোমার জেলার ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকট একখানি পত্র লেখ।
৫. তোমাদের ক্লাবের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থসাহায্য চেয়ে জেলাপ্রশাসকের নিকট আবেদনপত্র তৈরি কর।
৬. তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট একখানা আবেদনপত্র লেখ।
৭. তোমার বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোজনের জন্য বিভাগীয় পরিচালকের নিকট একটি পত্র রচনা কর।
৮. বনভোজন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তোমার শ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র রচনা কর।
৯. বেতার-নাটকে অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে একটি দরখাস্ত লেখ।
১০. তোমার এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট একটি দরখাস্ত লেখ।
১১. বন্যার্তদের আশু সাহায্যদানের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ।
১২. একটি দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।
১৩. বিজয়ী ক্রিকেট দলের সংবর্ধনা প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করে একটি আবেদনপত্র লেখ।
১৪. লোডশেডিং নিরসনকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে একটি পত্র লেখ।
১৫. তোমাদের এলাকায় খালের উপর একটি পুল তৈরির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত লেখ।
১৬. 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের জন্য ন্যায্যমূল্যে সার সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা কর।
১৭. ডাকঘর স্থাপনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র লেখ।
১৮. এক মাস অনুপস্থিতির কারণে জরিমানা মাফের জন্য অধ্যক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ।
১৯. বোনের বিয়েতে ছুটি প্রার্থনা করে একটি আবেদনপত্র লেখ।

মানপত্র, শ্রদ্ধাঞ্জলি/ অভিনন্দন ও স্মারকপত্র

১. তোমার পরিচিত কোনো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হওয়ায় তাঁকে উদ্দেশ করে অভিনন্দনপত্র রচনা কর।
২. শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে বিদায়-সংবর্ধনাপত্র রচনা কর।
৩. শিক্ষার্থীদের বিদায়-সংবর্ধনা উপলক্ষে মানপত্র।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য চিঠি

১. পানীয় জলের সংকট সমাধানের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি।
২. বিদ্যুৎ-সংযোগ প্রদানের জন্যে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি।
৩. ডাকঘর স্থাপনের আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি।
৪. রেললাইন স্থাপনের দাবি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি লেখ।
৫. আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি লেখ।

অনুবাদ

ভূমিকা : পৃথিবীতে অজস্র ভাষা রয়েছে। প্রত্যেকটি জাতির সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা প্রসঙ্গ রচিত হয় তাদের নিজস্ব ভাষায়। কিন্তু একক ব্যক্তির পক্ষে বেশি ভাষা জানা সম্ভব নয়। জ্ঞান-অন্বেষার লক্ষ্যে অন্য ভাষায় রচিত মূল্যবান লেখা নিজের ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদ ছাড়া আমরা ভিন্ন ভাষার রচিত গ্রন্থ বা লেখা সম্পর্কে কোনোভাবেই জানতে পারি না। শেক্সপিয়র পৃথিবীর সেরা নাট্যকার ও কবি। তাঁর রচনার স্বাদ পাবার জন্য আমাদের অনুবাদের দ্বারস্থ হতে হয়। ইংরেজি, জার্মান, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় রচিত হয়েছে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের মূল্যবান গ্রন্থ। অনুবাদ আমাদের এসব ভাষায় রচিত রচনার সঙ্গে পরিচিত করে।

সংজ্ঞা : অনুবাদকে ইংরেজিতে বলা হয় Translation। মূল রচনার বক্তব্য পরিবর্তন না করে অন্য ভাষায় রূপান্তর করার নামই অনুবাদ। তবে, শুধু রূপান্তর করলেই তা পাঠকের উপভোগ্য হবে এমন নয়। কারণ অনূদিত রচনাটিতে অবশ্যই মৌলিক রচনার গুণ বজায় থাকতে হবে। ইদানীং অবশ্য কম্পিউটারের সাহায্যে এক ধরনের অনুবাদ করা হচ্ছে। তাকে সত্যিকার অর্থে অনুবাদ বলা ঠিক নয়। কারণ, সেখানে মূলের স্বাদ বজায় থাকে না।

অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা : মূলত জ্ঞানতৃষ্ণাই মানুষকে অনুবাদের দিকে ধাবিত করে। অনুবাদ আমাদের ভেতরের জানার অবিরাম তৃষ্ণাকে প্রশমিত করে। বিশ্বে এসময়ে যেখানে যা লিখিত বা প্রকাশিত হচ্ছে তা জানার দুর্জয় ইচ্ছে থাকে অনেকের। কিন্তু, সেসব লেখকের ব্যবহৃত ভাষা জানা থাকে না বলেই আমরা তা পড়তে পারি না। শুধু সাহিত্য নয়, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের অসংখ্য মূল্যবান লেখা আমরা অনুবাদের মাধ্যমে পড়তে পারি। জ্ঞানের দিগন্ত বাড়াতে হলে তাই অনুবাদের বিকল্প নেই।

অনুবাদের শ্রেণীকরণ : অনুবাদ করা বেশ কঠিন কাজ। মূল বিষয় যদি সৃষ্টিশীল রচনা হয়, তা হলে তার অনুবাদ প্রায় অসাধ্য। কারণ, সৃজনশীল লেখকেরা তাদের Text-এ ভাষা যেভাবে বা যে-অর্থে ব্যবহার করেন তা অনুবাদে ধারণ করা কঠিন। প্রত্যেক ভাষার কিছু নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অন্যভাষী অনুবাদকের প্রায়শই জানা থাকে না। সেক্ষেত্রে অনুবাদে মূলের রস-ভাব বজায় থাকতে পারে না। সাধারণত গদ্যের অনুবাদ করা সহজ। তবে, কবিতা বা কথাসাহিত্যের অনুবাদ করা দুরূহ। অনুবাদ সার্থক হোক আর অসার্থক হোক, অনুবাদকে মূলত দুভাগে ভাগ করা হয়। আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ।

আক্ষরিক অনুবাদ : মূল ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে-অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা হয়। সাধারণত, প্রবন্ধ বা গদ্যজাতীয় রচনা অনুবাদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় অনুবাদ করা হয়। তবে শুধু শব্দের প্রতিশব্দ বসালেই অনেক ক্ষেত্রে মূল রচনার অর্থ স্পষ্ট হয় না। সেক্ষেত্রে বাক্যের গঠন, ব্যবহৃত বাগ্‌ধারা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। আক্ষরিক অনুবাদে বিশ্বস্ততা থাকে। তবে বিশ্বস্ততা রাখতে গিয়ে অনেক সময় মূল রচনার অর্থ পাল্টে যায়। এ জাতীয় অনুবাদে স্বাধীনতা খর্ব হয়।

ভাবানুবাদ : মূল রচনার অন্তর্নিহিত ভাব ঠিক রেখে ভাবানুবাদ করা হয়। এখানে প্রতিটি শব্দের অনুবাদ করা হয় না। এক্ষেত্রে অনুবাদক যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। সৃজনশীল রচনা অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখানে রচনার তাৎপর্যগত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ, শব্দগত অর্থ সবসময় গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনুবাদক চেষ্টা করবেন মূল রচনার স্টাইল বজায় রাখতে। ১৭৯০ সালে ইংল্যান্ডের লেখক আলেক্সান্ডার ফ্রেজার টাইটলার সৃজনশীল রচনা অনুবাদ প্রসঙ্গে কতকগুলো বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন—

ক. মূল কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ধরবে অনুবাদ— তার চিন্তাভাবনা, ধ্যানদর্শনকে খণ্ডিত না করে।

খ. অনুবাদে মূল কাজের শৈলী (Style) যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে হবে ।

গ. অনুবাদকের দক্ষতা থাকতে হবে দুটি ভাষায়— মূল ভাষা ও অনুবাদকের নিজের ভাষায়।

ঘ. অনূদিত লেখকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুবাদকের স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

ঙ. অনুবাদের ভাষায় জটিলতা থাকা উচিত নয়। অনূদিত ভাষায় প্রচলিত ও সাধারণ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলির সাহায্যেই অনুবাদ করা উচিত।

সচেতনতা : অনুবাদ কখনোই মৌলিক রচনা নয়। তবে, অনুবাদকে মৌলিক রচনার কাছাকাছি নিয়ে যাবার চেষ্টা করা দরকার। অনুবাদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

১. মূল Text টি বারবার সতর্কতার সাথে পড়তে হবে। যেন মূল রচনার কোনো অংশ অনুবাদক বুঝতে ভুল না করেন।

২. মূল ভাষার বাক্যকাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট ভাষার Idiom, phrase সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৪. মূল রচনার আলংকারিক গুণ অনুবাদে বজায় রাখতে হবে।

৫. মূল রচনার জটিল বাক্যাংশ প্রয়োজনমতো ভেঙে ছোট করে লিখতে হবে।

৬. ক্রিয়ার কাল, বচন, পুরুষ, প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

৭. ইংরেজি নামগুলো (Noun) অর্থাৎ বিশেষ্যগুলোকে ইংরেজি হিসেবেই অনুবাদ করতে হবে।

৮. অনুবাদের সময় ধীরেসুস্থে বিশেষ সতর্কতার সাথে বাক্যের সুষ্ঠু অনুবাদ করতে হবে।

১

Japan is in the East of our country. Among the countries of Asia, sunrise is first seen in Japan. So, Japan is called the country of the 'Rising Sun'. The children of Japan are very modest and gentle.

বাংলা অনুবাদ : জাপান আমাদের দেশের পূর্বদিকে অবস্থিত। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপানেই প্রথম সূর্যোদয় দেখা যায়। সুতরাং জাপানকে 'সূর্যোদয়ের দেশ' বলা হয়। জাপানের শিশুরা খুব নম্র ও ভদ্র।

২

Work is life. It is the true source of health and happiness. Man cannot be all together idle. They must have something to do or think about. An idle man is busy with evil thoughts and goes to ruin.

বাংলা অনুবাদ : কর্মই জীবন। এটা স্বাস্থ্য ও সুখের প্রকৃত উৎস। মানুষ পুরোপুরি অলস থাকতে পারে না। তাদের অবশ্যই কিছু-না-কিছু করা কিংবা চিন্তা করার মতো কিছু থাকতে হবে। অলস মানুষ কুচিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং সর্বস্বান্ত হয়।

৩

We live in Bangladesh. It is the land of our birth. I love my country. Everyone should love his country. We shall work for the progress of our country. If Bangladesh prospers we shall be happy

বাংলা অনুবাদ : আমরা বাংলাদেশে বাস করি। এটি আমাদের জন্মভূমি। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। সবারই তার দেশকে ভালোবাসা উচিত। আমরা দেশের উন্নতির জন্য কাজ করব। বাংলাদেশের উন্নতি হলে আমরা সুখী হব।

৪

Water is another important element of the environment. Water is essential for human, animal and plant life. Clean water is safty for us, but polluted water is harmful. Water also can be polluted in many ways. By drinking polluted water we may be sick.

বাংলা অনুবাদ : পানি পরিবেশের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পানি মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জীবনের জন্য প্রয়োজন। বিশুদ্ধ পানি আমাদের জন্য নিরাপদ, কিন্তু দূষিত পানি ক্ষতিকর। পানি বিভিন্নভাবে দূষিত হতে পারে। দূষিত পানি পান করে আমরা অসুস্থ হতে পারি।

৫

Babul and Kamal are two brothers. They go to school everyday. There was a big canal on their way to school. Over the canal there was a bridge made of wood. The bridge become old.

Since none repaired it, one day it broken down. Babul and Kamal become in difficulty. They could not go to school.

বাংলা অনুবাদ : বাবুল ও কামাল দুই ভাই। তারা প্রতিদিন স্কুলে যায়। স্কুলে যাওয়ার পথে ছিল একটি বড় খাল। খালের উপর কাঠের তৈরি একটি সাঁকো ছিল। সাঁকোটি পুরোনো হয়েছিল। কেউ মেরামত না করায় একদিন তা ভেঙে গেল। বাবুল ও কামাল অসুবিধায় পড়ল। তারা স্কুলে যেতে পারল না।

৬

The cat can see well at night. It has soft pads of flesh under its feet. It can move without making any sound. It has sharp paws. It catches rats and playes with them. Then it kill them. It lives on flesh and fish. It is very fond of milk.

বাংলা অনুবাদ : বিড়াল রাতে ভালো দেখতে পায়। এর পায়ের তলায় নরম মাংসের পিন্ড আছে। এটি কোনো শব্দ না করেই চলতে পারে। এর ধারালো থাবা অছে। এটি ইঁদুর ধরে খেলা করে, শেষে মেরে ফেলে। এরা মাছ-মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে। এরা দুধের খুব ভক্ত।

৭

Everything has its own colour. The paper of a book is white. Its letters are black. Gold is yellow, Blood is red and the sky is blue. Grass is green. Allah has given different colours of the sky, trees and flowers. All these colours are useful.

বাংলা অনুবাদ : সব জিনিসেরই নিজস্ব রং আছে। বইয়ের কাগজ সাদা, অক্ষরগুলো কালো। সোনা হলুদ, রক্ত লাল এবং আকাশ নীল, ঘাস সবুজ। আল্লাহ আকাশ, গাছ এবং ফুলের পৃথক রং দিয়েছেন। সব রঙেরই প্রয়োজন আছে।

৮

A good teacher is one of the most important person in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher presents lessons with interesting. He creates awakeness among the students. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable inside him.

বাংলা অনুবাদ : একজন ভালো শিক্ষক যে-কোনো দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষক প্রয়োজন। একজন ভালো শিক্ষক তাঁর পাঠ আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করেন। তিনি তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলেন এবং বুদ্ধিমান প্রমাণ করেন। সকলের মধ্যেই মূল্যবান কিছু রয়েছে।

৯

Early rising is benificial to health.The boy who rises early can enjoy the excellent air of the morning. He can take a walk by the riverside or in the open fleld. He can enjoy the sweet songs of the birds and see the beautiful sight of the sunrise. All these make him healthy and delightful.

বাংলা অনুবাদ : সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো। যে-বালক সকালে ওঠে, সে সকালের চমৎকার বাতাস উপভোগ করে। সে নদীর তীরে কিংবা উন্মুক্ত মাঠে বেড়াতে পারে। সে পাখির মধুর গান শুনতে পারে এবং সূর্যোদয়ের সুন্দর দৃশ্যাবলি দেখতে পারে। এসব তাকে স্বাস্থ্যবান ও উৎফুল্ল করে।

১০

A student is a learner. At first he will give attention to his studies. He should go through with his home work and attend school regularly. A good student reads a lot even outside his prescribed text books. He loves knowledge for the sake of knowledge. He loves his teachers as he loves his parents.

বাংলা অনুবাদ : ছাত্র একজন শিক্ষার্থী। প্রথমত সে তার পড়াশুনায় মনোযোগী হবে। সে নিয়মিত তার 'বাড়ির অধ্যয়নকারী কাজগুলো' করবে এবং বিদ্যালয়ে যাবে। ভালো ছাত্র তার নির্ধারিত পাঠ্যসূচির বাইরেও পড়াশুনা করে। সে জ্ঞানের স্বার্থেই জ্ঞানকে ভালোবাসে। পিতামাতার মতোই সে শিক্ষককে ভালোবাসে।

১১

Honesty is a noble virtue. It is the secret of success in every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect and fearlessness. An honest man passes his days with happiness. Honesty is the best policy.

বাংলা অনুবাদ : সততা একটি মহৎ গুণ। জীবনের সব ক্ষেত্রে সাফল্যের এটাই গোপন মন্ত্র। সততার মূল্য অনেক বেশি। এটি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও নির্ভয়কে জয় করে। সৎ ব্যক্তি সুখে দিন অতিবাহিত করে। সততাই উত্তম ধর্ম।

১২

Education is the backbone of a nation. No progress can be possible without education. So the light of education is necessity for society. Students both boys and girls, must be consious about their responsibility. Otherwise the nation will not be able to see the light of hope.

বাংলা অনুবাদ : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো প্রকার উন্নতি সম্ভব নয়। সমাজের জন্যে শিক্ষার আলো প্রয়োজন। বালক-বালিকা উভয় শিক্ষার্থীরই তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। তা না হলে জাতি আশার আলো দেখতে সক্ষম হবে না।

১৩

Man is the best of all the creations. Allah has given some noble virtues to the man. Kindness is one of them. Allah is kind to him who is kind to others. Everyone should practice for this noble virtue and be kind to others. Without kindness man can not attain perfection.

বাংলা অনুবাদ : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ মানুষকে কিছু মহৎ গুণ দান করেছেন। দয়া তার মধ্যে অন্যতম। যে অন্যের প্রতি সদয় হয় আল্লাহ তার প্রতি সদয় হন। সকলকে এই গুণের চর্চা করা এবং অন্যের প্রতি সদয় হওয়া উচিত। দয়া ছাড়া কোনো মানুষ চূড়ান্তভাবে সফল হতে পারে না।

১৪

A newspaper is a storehouse of knowledge. We can know the condition, manners,customs of other countries of the world from newspaper. It is in fact, the summary of all current history. In this scientific age the world without newspaper is unthinkable.

বাংলা অনুবাদ : খবরের কাগজ জ্ঞানের ভাণ্ডার। আমরা সংবাদপত্র হতে পৃথিবীর অপরাপর দেশের অবস্থা, আচার–আচরণ ও রীতিনীতি জানতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, এটি সমসাময়িক ইতিহাসের সারকথা। এই বিজ্ঞানের যুগে সংবাদপত্রহীন পৃথিবী অকল্পনীয়।

১৫

Books are men's best companion in life. You may have good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and may harm. But books will always stay with you.

বাংলা অনুবাদ : বই মানুষের জীবনের উত্তম সঙ্গী। তোমার অনেক ভালো বন্ধু থাকতে পারে। কিন্ত প্রয়োজনে তাদের নাও পেতে পারো। তারা তোমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা নাও বলতে পারে। দুই একজন মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে এবং অনেক ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বই তোমার পাশে থাকবে সবসময়।

16

Books introduce us to the best society. They bring us into the presence of the greatest mind, that have ever lived. We heard what they said and did. we see them, as if, they were really alive. We are participators in their thuoghts. We sympathize with them, and grieve with them.

বাংলা অনুবাদ : বই আমাদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এরা আমাদের কাছে অমর মহৎ মনের সান্নিধ্য আনয়ন করে। তাঁরা যা বলেছেন আর করেছেন তা আমরা শুনে থাকি এবং তাঁরা জীবনে যেমন ছিলেন তেমনি দেখি। আমরা তাঁদের চিন্তার অংশীদার, তাঁদের সাথে সহানুভূতিশীল এবং তাদের দুঃখের সাথি।

অনুশীলনমূলক কাজ

বঙ্গানুবাদ কর :

(1) Once upon a time, there lived a famous magician called Fraukel. He lived in a small town in Germany and worked there in a laboratory in his house. In it he made his magic spells. He was a good magician, because he only used his spells to make bad people good. And if they improved, he would take his magic spell off them.

(2) Once upon a time there lived a poor man called Suruj Ali. He was an honest, hard-working man and looked after a large mango orchard. The owner of the orchard, Hamidur Rahaman was a very rich man. One day, some of Hamidur Rahman's friends came to visit him. It was during the summer season when the mangoes were ripe.

(3) I lived in a village in Bangladesh. Its name is Shimadia. It is far away from Dhaka. The most of the people of my village are farmers. There are also some servicemen, doctors, school teachers, fishermen, blacksmiths and weavers.

(4) It was a nice warm evening in March. Anwar was reading a book in his bedroom at home. When his mother called him, Anwar went downstair. He found his mother with some visitors in the living room.

(5) The Tajmahal is a beautiful edifice. It is on the Jamuna at Agra. Is it a palace? No, it is not a palace. It is a tomb. Emperor Shahjahan built it.

(6) Do you love your country? If you do not love the country it will not prosper. It will not be enough to speak of patriotism in speech. The Country has to be loved in the truest sense of the term. All have to work selflessly for the country. You will have to sacrifice your lives for the cause of the country if and when needed. That is the only mean to make the country prosperous.

(7) Tea is a popular drink. We take tea to remove fatigue. But too much of taking tea is harmful for health. Tea grows in plenty in Bangladesh. Bangladesh earns a lot of foreign exchange by exporting tea.

(8) Joynul Abedin was born in Kishorgonj. His father Jamiruddin was a police officer. He did not like hard and fast rules of the school. He had a great thirst for drawing. For this at the age of 15 he went to Calcutta to see art.

ভাবসম্প্রসারণ

কোনো গদ্য ও পদ্যাংশের গভীর অন্তর্নিহিত ভাবকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করাকে ভাব-সম্প্রসারণ বলে। ভাব-সম্প্রসারণের জন্য উদ্ধৃত অংশ থেকে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত অংশ পরিসরে বড় হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে অহেতুক যেন বড় না হয়। মূল ভাবটি স্পষ্ট ও সুন্দর করে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাই ভাবসম্প্রসারণের প্রধান উদ্দেশ্য।

নিচের বিষয়গুলো ভাবসম্প্রসারণের সময় অনুসরণ করবে :

১. ভাব-সম্প্রসারণের জন্য উদ্ধৃত কবিতা বা গদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়বে। ঐ অংশটির মূলভাব কী, বুঝতে সচেষ্ট হবে।

২. ব্যাখ্যা সহজ ও সরল ভাষায় গুছিয়ে স্পষ্ট করে প্রকাশ করবে।

৩. মূলভাবের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো কথা লিখবে না।

৪. ভাবসম্প্রসারণের সময় কবিতার উৎস বা কবির নাম বলার প্রয়োজন নেই।

৫. ভাবসম্প্রসারণে ব্যাখ্যাত অংশে কোনো উদ্ধৃতি না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

নিচে ভাবসম্প্রসারণের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

১

মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন

ভাব-সম্প্রসারণ : সমাজের ও রাষ্ট্রের উচ্চ আসনে সমাসীন হওয়া সহজ কথা নয়। অনেক দিনের কর্মতৎপরতা, অবদান ও ত্যাগের ফলে মানুষ সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণ করতে পারেন। এজন্য তাঁকে অনেক চড়াই-উতরাই ও সিঁড়ি পার হয়ে আসতে হয়। এ দুর্লভ সম্মান ও উচ্চাসন লাভ করা খুব কঠিন। একজন শাসক ও রাজ্যাধিপতি যখন রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে গিয়ে বসেন তখন তাঁর দায়িত্বটি হয়ে পড়ে আরও সুকঠিন। তখন সুষ্ঠুভাবে দেশ বা সমাজ পরিচালনায় তাঁকে মুখোমুখি হতে হয় অনেক বিপরীত স্রোতের, অনেক বাধা-বিঘ্নের। তিনি ঐসব বাধা-বিঘ্নের ভয়ে বা ঐসব প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দূরে সরে যেতে পারেন না। তাঁকে আরও বেশি দায়িত্ববান হতে হয়, তাই সমাজের শীর্ষস্থানে পৌঁছানো যেমন কঠিন, তেমনি ন্যায় ও কল্যাণের স্বার্থে সেই সুকঠিন দায়িত্ব বা ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া আরও দুরূহ, আরও কঠিন।

২

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।

ভাবসম্প্রসারণ : স্বর্গ পরম সুখের স্থান আর নরক পরম যন্ত্রণার স্থান। মৃত্যুর পর—যাঁরা পৃথিবীতে সৎকর্ম করেন, সৎজীবন যাপন করেন, যথাযথ ধর্মকর্ম পালন করেন—তাঁরা স্বর্গে যাবেন, এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। অন্যদিকে যারা পাপী, যারা পৃথিবীতে নানা দুষ্কর্ম ও দুরাচারে লিপ্ত থাকে মৃত্যুর পর চরম যন্ত্রণা ও শাস্তির স্থান নরকে তাদের স্থান হবে এটাও প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসী মনে করেন। অর্থাৎ স্বর্গ চিরসুখকর ও এক অপার্থিব শান্তিময় স্থান, অন্যদিকে নরক হল চরম দুঃখ-যন্ত্রণাময় শাস্তির স্থান। এ-তো গেল মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের কথা। কিন্তু বাস্তব জগতেও আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই। পৃথিবীতে যে-ব্যক্তি সত্য, ন্যায় ও সদাচরণ করেন, পরের কল্যাণব্রতী হন, সর্বদা পুণ্যকাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন, স্বর্গীয় সুখের আস্বাদ তিনি পৃথিবীতেই পেতে পারেন। অর্থাৎ স্বর্গের অপার্থিব শান্তি মানুষ পৃথিবীতেও পেতে পারে। অন্যদিকে যেসব মানুষ সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, অধর্ম, অকল্যাণ ও অমঙ্গলের কাজ করে তারা পৃথিবীতে একটা নরকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে। সুতরাং মহৎ ও পুণ্য কাজের দ্বারা, পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে মানুষ পৃথিবীকে যেমন স্বর্গতুল্য সুখকর ও শান্তিময় করে তুলতে পারে তেমনি পাপাচার, দুষ্কর্ম, সংঘর্ষ ও পারস্পরিক কলহ-বিবাদের দ্বারা মানুষ নিজেদের জীবনকে নরকতুল্য করে তুলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গের সুখ ও নরকের যন্ত্রণার প্রতিরূপ মানুষ ইহজগতেও খুব কাছ থেকেই অনুভব করতে পারে।

৩

চরিত্র মানব-জীবনের মুকুটস্বরূপ

ভাবসম্প্রসারণ : চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষ ধনসম্পদ, অর্থবিত্ত পরিশ্রমের দ্বারা, বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের দ্বারা একটু কষ্ট হলেও অর্জন করতে পারে। কিন্তু মানবচরিত্রের মহৎ গুণাবলির অধিকারী হতে হলে মানুষকে করতে হয় কঠিন পরিশ্রম ও সাধনা। ধন-সম্পদের দ্বারা মানুষ ধনী হতে পারে। তবে ধনী বা সম্পদশালী ব্যক্তিমাত্রই মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না। চরিত্র মানুষকে যেমন শ্রদ্ধার আসনে নিয়ে যায়, তেমনি মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ আসনের গৌরবে দীপ্ত করে। মহৎ মানুষের চরিত্র এক কঠিন বর্মের মতো। কোনো মালিন্য, কলুষতা, অন্যায়, অকল্যাণ চরিত্রবান মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না। চরিত্র মানুষকে দেয় মানসিক বল, দেয় নীতির ঐশ্বর্য। এই বল ও ঐশ্বর্য রাজমুকুটের চেয়ে কম দামি ও কম মূল্যবান নয়। পৃথিবীতে আবির্ভূত মহাপুরুষদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই তাঁরা কেউ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না, বরং ঐশ্বর্যকে তাঁরা পদধূলিতে লুণ্ঠিত করেছেন। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় মহৎ চরিত্রের অধিকারী। সুতরাং ধন-সম্পদ, অর্থ-প্রতিপত্তি ও মেকি সম্মান নয়, আমাদের কাম্য হওয়া উচিত মহৎ চরিত্রগুণ অর্জন। কারণ চরিত্রই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ, জীবনের মুকুটস্বরূপ।

৪

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি;
দুটি জোটে যদি তবে একটিতে
ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।

ভাবসম্প্রসারণ : বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। এটা কঠিন বাস্তবতা। ক্ষুধা নিয়ে কাজ করা যায় না, জীবন-যাপন করা যায় না। এই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য মানুষ দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সৃষ্টির সূচনা থেকে চলছে মানুষের এই নিরন্তর সংগ্রাম। কিন্তু শারীরিকভাবে পেটের ক্ষুধা মিটে গেলেও মানুষের মানসিক ক্ষুধা মেটে না। মানুষের জৈবিক প্রয়োজন যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে তার মানসিক প্রয়োজন। নান্দনিকতা, সৌন্দর্যবোধ, সুখানুভূতি এসব একজন মানুষের অনেক খোরাক মেটায়। খাদ্য আমাদের প্রয়োজন, ক্ষুধানিবৃত্তি করা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু মানসিক চাহিদা, আনন্দ ও মনের খোরাকও কম প্রয়োজনীয় নয়। মানুষ যেহেতু জড় পদার্থ নয়, যেহেতু তার মধ্যে রয়েছে কল্পনা, সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা ও কল্যাণবোধ সেজন্য তার মধ্যে সুন্দরেরও অন্বেষা থাকতে হবে। এজন্যই খাদ্যের পর মানুষ একটু ফুলের সুবাসও খুঁজতে পারে এবং এটাই মানবিক।

৫

যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি,
আশুগৃহে তার দেখিবে না আর,
নিশীথে প্রদীপ ভাতি।

ভাব-সম্প্রসারণ : অন্ধকারকে দূর করার জন্য আমরা আলো জ্বালাই। আলো জ্বালাই প্রয়োজনে, বিনা প্রয়োজনে আমরা বাতি জ্বালাই না। কারণ বাতি জ্বালাতে গেলে আমাদের খরচ লাগে, অর্থ ব্যয় হয়। এজন্য অনাবশ্যকভাবে আমরা কেউ বাতি জ্বালাই না। কিন্তু যারা নিতান্ত বিলাসিতা বা খামখেয়ালিবশত দিনে-দুপুরে বা প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও অনাবশ্যকভাবে বাতি জ্বালায় সেটা যে মস্ত অপব্যয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে-কোনো অপব্যয় মানুষের জীবনে দুঃখ ও অভাব বয়ে আনে। যে অনাবশ্যকভাবে নিছক মনের আনন্দে অযথা অপব্যয় করে তার ভবিষ্যৎ কখনও সুখের হতে পারে না। তার পরিণাম কষ্টের ও দুঃখের। প্রত্যেক মানুষকেই এরূপ অনাবশ্যক অপব্যয় থেকে দূরে থাকতে হবে। তাকে পরিণামদর্শী ও মিতব্যয়ী হতে হবে।

৬

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

ভাবসম্প্রসারণ : প্রস্ফুটিত পদ্মফুল সরোবরে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। এই ফুল তার সৌন্দর্যের জন্য লোভনীয়ও বটে। ইচ্ছে হয় দিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে মুঠিভরে আঁজলা করে গুচ্ছ গুচ্ছ পদ্মফুল তুলে আনি। কিন্তু বিপত্তি আছে, পদ্মফুলের মৃণালে আছে অসংখ্য তীক্ষ্ণ কাঁটা। পদ্মবনে কাঁটাঘেরা মৃণালের ঘন বেষ্টনী ভেঙে এই সুন্দর ফুল চয়ন করা তাই বেশ কঠিন। এটা সত্য যে, যে-ব্যক্তি কাঁটার ভয়ে জলে নামতে চায় না তার পক্ষে দিঘির সুন্দর পদ্মফুল আহরণ কখনও সম্ভব নয়। এটাও সত্য যে, পৃথিবীতে যে কোনো কষ্ট সহ্য করতে চায় না তার পক্ষে মহৎ বা সুন্দর কিছু অর্জন করা কঠিন। জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হবে। যা দুর্লঙ্ঘ্য তা জয় করতে হবে—তবেই সুখ ও সাফল্য আসবে।

৭

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী' পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

ভাবসম্প্রসারণ : মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল বলে তাকে সমাজবন্ধভাবে বাস করতে হয়। এজন্য পরস্পর প্রীতি ও ভালোবাসা, নির্ভরতা ও সহযোগিতার পরিবেশ মানুষ নিজের প্রয়োজনেই সৃষ্টির গোড়া থেকে গড়ে তুলেছে। শুধু পরিবার বা সমাজ নয়, রাষ্ট্র নয়, সমগ্র পৃথিবী ও রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং জাতিগোষ্ঠী পরস্পর সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য, নির্ভরতা ও সহযোগিতার মধ্যে বাস করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে। কারণ একজন মানুষ যেমন সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে পারে না, তেমনি পৃথিবীর বৃহৎ মানবগোষ্ঠীও পরস্পর নির্ভরশীলতা ছাড়া বাস করতে পারছে না। এমন একটি বৈশ্বিক সমাজে আমরা নিজেদের নিয়ে আত্মকেন্দ্রিকভাবে, শুধু নিজের সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করে বাস করতে পারব না। আমাদের কাছের ও পাশের সব মানুষকে ভালোবেসে এ-পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে আমরা শুধু নিজের জন্যই জন্মগ্রহণ করিনি, নিজের সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে—পরের কল্যাণকামনা, অন্যের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই সুখ। এ-সুখই আমাদের প্রার্থিত হওয়া উচিত।

৮

অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, 'ফিরেদেখো।' দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

ভাবসম্প্রসারণ : মানুষ বিশ্বাস করে অন্ধ নিয়তি বা অদৃষ্টই তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ এও বিশ্বাস করে যে, দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্য সব অমোঘ নিয়তির ফলেই ঘটেছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে এ ধারণা সত্যি নয়। মানুষের জীবনের মূল নিয়ন্তা হচ্ছে তার কর্ম। অতীতের কর্মই তাকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আর বর্তমানের কর্মের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই সে ভবিষ্যৎপানে এগুচ্ছে। এটাই জগতের কর্মচক্র ও জীবনচক্রের গতি। মানুষ অদৃষ্টের ক্রীড়নক—এটা এক ধরনের দুর্বলচিত্তের সিদ্ধান্ত। আসলে মানুষ নিজেই তার অদৃষ্ট ও ভাগ্যকে তৈরি করে। এটা সম্ভব হয় তার কর্মস্পৃহার মাধ্যমে।

৯

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।

নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে— ,
কহে, যাহা-কিছু সুখ সকলি ওপারে।

ভাব-সম্প্রসারণ : নদীর উভয় তীরের সৌন্দর্য প্রায় একই রকম হলেও, নদীপাড়ে বসবাসকারীদের সুখ-সুবিধা জীবন-যাপন প্রায় একই রকমের হলেও এক পারের লোক মনে করে ঐ পারের লোক বেশি ভালো আছে। এরূপভাবে, পৃথিবীতে সবাই মনে করে সে ছাড়া অন্যজন বেশি সুখী। এটা মানুষের একটা সাধারণ প্রবণতা। এটা সৃষ্টির গোড়া থেকে চলে আসছে। আসলে মানুষ নিজের প্রাপ্তির মধ্যে সুখ খুঁজে পায় না, যা সে পায়নি সেটাই অধিকতর সুখকর মনে করে। মানুষ যেটা পায় না সেটাই বেশি মূল্যবান বা আকর্ষণীয় ও দুর্লভ মনে করে। এ ধরনের ভাবনা মূলত মানুষের দুঃখকে আরও বাড়ায়, তার হতাশাকে আরও গভীর করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ আপন আপন অবস্থানকেই সুন্দর ও সুখকর করে গড়ে তুলতে পারে। দূরের সুখ-কল্পনা, দূরের সুখের লোভ তার মধ্যে একটা অপ্রাপ্তির বঞ্চনা সৃষ্টি করে। তাই এ ধরনের অলীক ভাবনা আমাদের মন থেকে দূর করতে হবে।

১০

কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি—
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি
মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল, 'স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

ভাবসম্প্রসারণ : পৃথিবীতে প্রকৃতির দিকে যখন আমরা তাকাই তখন অনেক কঠিন সত্য উপলব্ধি করতে পারি। প্রকৃতির মধ্যে এরকম ছড়িয়ে আছে অনেক দৃষ্টান্ত। সূর্য যখন অস্ত যায়, পৃথিবী যখন অন্ধকারে আবৃত হয়ে পড়ে তখন এই ঘন তমসায় পৃথিবীর অন্ধকার দূর করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। এসেছে একটি ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপ। এই প্রদীপ সারা পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে না, দূর করতে পারে না বিশাল অন্ধকার। কিন্তু তার ক্ষুদ্র আলোকচ্ছটায় মানুষ দেখতে পায় আলোর রেখা। ক্ষুদ্র দীপশিখা তার সামান্য শক্তি দিয়ে যে দায়িত্বভার তুলে নিল তার মূল্য কম নয়। ক্ষুদ্র শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে সে মানুষের উপকারে এগিয়ে এসেছে— এটাই বড় কথা। পৃথিবীতে, আমাদের সমাজব্যবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখতে পাই। যখন ধনশালী, প্রতিপত্তিশালী, ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা মানুষের দুঃখ-কষ্টে এগিয়ে আসেন না তখন দেখা যায় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা কোনো-একজন সাধারণ মানুষ তাঁর সামান্য সামর্থ্য নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসেন। তাঁর এ-সাহায্য ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তাঁর এ কল্যাণকামী মনোভাব বড় ও অনেক মহৎ। পরের মঙ্গল বা হিতসাধনের জন্য প্রভূত ধনসম্পদের প্রয়োজন হয় না, সদিচ্ছা ও মহৎ হৃদয়ই এজন্য যথেষ্ট সহায়ক।

১১

আলো বলে, অন্ধকার তুই বড় কালো,
অন্ধকার বলে, তাই তুমি আলো।

ভাবসম্প্রসারণ : আলো ও আঁধার পৃথিবীর সৃষ্টি থেকেই বিদ্যমান। আলো ও আঁধার দুটিই বাস্তবতা। সূর্যের আলোকচ্ছটায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে। আবার সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হয় তখন আঁধার নেমে আসে। আলো-আঁধারের এই আগমন-নির্গমন আছে বলেই পৃথিবী বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। শুধু আলো বা শুধু অন্ধকার যদি পৃথিবীতে চিরস্থায়ী থাকত তবে এ পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ত। তেমনি পৃথিবীতে সুখ যেমন আছে, তেমনি দুঃখও আছে। আনন্দ যেমন আছে তেমনি বেদনাও আছে। তৃপ্তি যেমন আছে তেমনি অতৃপ্তিও আছে। অর্থাৎ এরূপ বৈপরীত্যের মধ্যেই সৃষ্টির সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। দুটিকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। জীবনের এই বাস্তবতার মধ্যেই আমাদের পথ চলতে হবে।

১২

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

ভাব-সম্প্রসারণ : অন্যায় করা ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া প্রায় সমার্থক। উদার মনোভাব প্রদর্শন করার জন্য অন্যায়কে ক্ষমা করা বা দয়া দেখিয়ে অন্যায়কারীকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব তো নেই-ই, বরং তাও অন্যায়কারীর মতো সমান অপরাধের কাজ। অন্যায়কে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা না করে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্যে মানবচরিত্রের দুর্বলতম দিকেরই প্রকাশ ঘটে। অন্যায়কে প্রশ্রয় দান করা হলে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তাই শুধু অন্যায় করলেই অপরাধ বা পাপ হবে—এ-ধারণা ঠিক নয়। বরং অন্যায়কারী ও অন্যায়কে প্রশ্রয়দানকারী উভয়ে সমভাবে দোষী ও অপরাধী। অন্যায় যে করে সে যেমন সমাজে নিন্দনীয় ও ঘৃণার পাত্র, তেমনি অন্যায়কে যিনি বিনা বাধায়, মৌন অবলম্বন করে প্রশ্রয় দেন তাঁকেও ঘৃণার পাত্র ও নিন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা উচিত।

১৩

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে
আমরা কুটম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার থলিতে।

ভাবসম্প্রসারণ : অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানবচরিত্রেও পরিবর্তন ঘটে। তবে এ ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে আছে এক ধরনের স্বার্থচিন্তা ও এককেন্দ্রিকতা। ভিক্ষার ঝুলি যখন টাকার ঝুলিকে মনে করিয়ে দেয় তার কুটুম্বিতার কথা-তখন সে একবারও ভাবে না তার থলেটি পূর্ণ হলে সেও আবার একই ভঙ্গিতে তাকে নিন্দা করবে। পৃথিবীতে মানুষের যখন সামাজিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় তখন সে তার পূর্বাবস্থার কথা ভুলে যায়। তখন আর সে নিজেকে চিনতে পারে না। দরিদ্র অবস্থা থেকে যখন কারও ভাগ্য পরিবর্তন হয়, তখন আমরা দেখতে পাই সে আর আমাদের চিনতে পারে না। এ ধরনের স্বার্থপর আত্মপরিচয়বিস্মৃত মানুষের সংখ্যা সমাজে কম নয়।

১৪

মহামূল্য পরিচ্ছেদ রতন ভূষণ
নরের মাহাত্ম্য নারে করিতে বর্ধন;
জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধর্ম-অলংকার
করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব বিস্তার।

ভাব-সম্প্রসারণ : মহামূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, ধনসম্পদ বা বংশগৌরব মানুষের মর্যাদা বাড়ায় না। এগুলো মানুষকে বড়ও করে না। ধনসম্পদ মানুষকে ধনী করে, দামি পোশাকের ঔজ্জ্বল্য মানুষের বাহ্যিক আভিজাত্য ও চমক বাড়ায়, বংশগৌরব মানুষকে আপন পরিচয়ে বড় করে না। মানুষকে বড় করে তার জ্ঞান, তার মূল্যবোধ, নীতি ও সদাচরণ। মানুষকে বড় করে তার ধর্মবোধ ও নৈতিকতা। বাহ্যিক পরিচয়বাহী ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব ও জ্ঞান চিরস্থায়ী সম্পদ। মানুষকে এই জ্ঞানসাধনা দ্বারা জ্ঞানী হতে হবে, চরিত্রবলে মহত্ত্ব অর্জন করতে হবে এবং সেটাই হবে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

১৫

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

ভাবসম্প্রসারণ : সমাজে যিনি চরিত্রগুণে বলীয়ান, যিনি মহৎ ও ব্যক্তিত্বশালী তার কোনোরূপ স্খলনের ভয় নেই। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তাই তাঁর শক্তি। তাঁর রয়েছে অপরিমেয় আত্মবিশ্বাস। তিনি কোনো খারাপ বা নিকৃষ্ট কাজ করতে পারেন না, বরং ঐসব খারাপ কাজ তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। তাই তিনি সমাজের সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে অনায়াসে, অসংকোচে মিশতে পারেন। অন্যদিকে যিনি চরিত্রবলে অত দৃঢ় নন, নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, স্বাধীন মতামত দিতে পারেন না—এ ধরনের লোক দুর্বলচিত্ত ও নানা সংশয়ে ভোগেন। যিনি

চরিত্রবান ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি হীন-অধম-নীচ সবার সঙ্গে মিশতে পারেন। কারণ তাঁর মনে কোনো দোলাচলবৃত্তি যেমন নেই, তেমনি নেই কোনো দুর্বলতা। সুতরাং আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে।

১৬

গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।

ভাবসম্প্রসারণ : যে-বিদ্যা মানুষের কাজে লাগে, যে-বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োজন রয়েছে সে-বিদ্যা সার্থক। যে-জ্ঞান বা বিদ্যা মানুষের কোনো কাজে আসে না এবং শুধু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকে সে-জ্ঞান বা বিদ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। গ্রন্থসর্বস্ব বা কেতাবি বিদ্যা মানুষের কোনো প্রয়োজনে আসে না। মিষ্টান্নের দোকানের কাচেঘেরা আলমারিতে পাত্রের মধ্যে সাজিয়ে রাখা মিষ্টান্নদ্রব্য যতই লোভনীয় হোক তা যদি ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে এবং তা চেখে দেখা না যায়, সে-মিষ্টান্ন যতই লোভাতুর ও রসে ভরা হোক তাতে কারও কোনো লাভ নেই। তেমনি যে-বিদ্যার কোনো প্রয়োগমুখিতা নেই, যে-বিদ্যা মানুষের প্রয়োজন ও কাজে লাগে না তাও তেমনি নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে যে-বিষয়টি আত্মস্থ করা যায় না, নিজের অধিকারে ও ব্যবহারে আনা যায় না তা যতই সমৃদ্ধ হোক তাতে মানুষের কোনো উপকার হয় না।

১৭

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে
সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

ভাবসম্প্রসারণ : অপরাধের দণ্ড প্রদান করা হবে—এটা সবার কাম্য, অপরাধীকে দণ্ডপ্রদানই স্বাভাবিক। দণ্ডপ্রদান বিচারকার্যের অঙ্গ। কিন্তু সমাজে আমরা দেখি অনেক সময় অপরাধের যথাযথ বিচার হয় না, আবার কোনো কোনো সময় বিচারপ্রক্রিয়ায় ত্রুটির কারণে বিনা অপরাধেও দণ্ডপ্রাপ্ত হয় কেউ-কেউ। তবে যিনি বিচারক তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সুকঠিন। অপরাধীর বিচার যথাযথভাবে নির্ণয় করার জন্য তাঁকে শুধু আইনের সুকঠোর প্রয়োগ ছাড়াও আবেগ-অনুভূতি ও মানবিক বিষয়গুলোও ভেবে দেখতে হয়। তাই বিচারক যখন কঠিন দণ্ড প্রদান করেন—তিনি যে আইনের অমোঘ বিধানেই সেই কঠিন দণ্ড বা শাস্তি দিচ্ছেন—সেই নিরপেক্ষতার মধ্যে যে কঠোরতা আছে তাও তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। অর্থাৎ বিচারক যখন অপরাধীর বিচার করেন তখন যদি দণ্ডিতের ব্যথার সঙ্গে একাত্মবোধ করেন তখন সেটা হয় সুবিচার।

১৮

দুঃখের মতো এত বড় পরশপাথর আর নাই।

ভাবসম্প্রসারণ : দুঃখ মানুষের কাম্য নয়। কিন্তু তাই বলে জীবন শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুখেরও নয়। দুঃখ ও সুখ জীবনের কঠিন বাস্তবতার এপিঠ-ওপিঠ। তবে দুঃখ ও সংগ্রামের মধ্যে মানুষ যখন সামনের দিকে এগিয়ে যায়, দুঃখকে জয় করে অগ্রসর হয় তার মধ্যে থাকে আনন্দ। দুঃখ যেন মানবজীবনের এক কঠিন পরীক্ষা। দুঃখের স্পর্শ মানুষকে দুঃখ জয়ী হওয়ার শিক্ষা দেয়, সাহসী হওয়ার ভরসা দেয়। দুঃখের স্পর্শে মানুষ আগুনে পোড়ানো সোনার মতো খাঁটি হয়ে ওঠে, জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার দীক্ষা পায়।

১৯

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

ভাবসম্প্রসারণ : ফুল তার সুবাস দিয়ে, সুগন্ধ দিয়ে, স্নিগ্ধতা দিয়ে অন্যের মনে আনন্দ বিলায়। ফুলের জীবন যেন অন্যের জন্য নিবেদিত। কারণ ফুল তো নিজের সুবাস নিজে গ্রহণ করে না। ফুল সুন্দর ও পবিত্রতার প্রতীক। আমরা

প্রিয়জনকে ফুল উপহার দিই, শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ফুলের স্তবক দিই, স্বাগত জানানোর জন্য ফুল দিই, ভক্তি জানানোর জন্য ফুল দিই। আমরা শহীদমিনারে ফুল দিই, জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিই। ফুল দিয়ে কাউকে যেমন বরণ করি আবার বিদায় ও চিরবিদায়েও দিই ফুল। তাই দেখা যায় আমাদের জীবনের নানারূপ আবেগ-অনুভূতিতে ফুল জড়িয়ে আছে। অথচ ফুল সারা জীবন ভ্রমরকে দেয় যেমন মধুপানের আনন্দ, তেমনি মানুষকে দেয় ভালোবাসার স্পর্শ। পুষ্পের যে এই আত্মোৎসর্গ, পরের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেওয়া— এখান থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। এ শিক্ষা বিনয়ী হওয়ার, এ-শিক্ষা নিজের জীবন দিয়ে অন্যকে সুন্দর ও সুখী করার শিক্ষা।

২০

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতিস্বরূপ।

ভাবসম্প্রসারণ : মানবজীবনে পরিশ্রম ছাড়া কোনো সাফল্য আসে না। পরিশ্রমই জীবনের সাফল্য ও উন্নতির সোপান। যারা কর্মবিমুখ, অলস তাদের জীবনে সাফল্য আসতে পারে না। তা ছাড়া যারা অলস ও পরিশ্রমবিমুখ তারা জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সুখের সন্ধান পায় না। পরিশ্রমের ফলে মানুষ যা অর্জন করে তার মধ্যে থাকে শান্তি ও প্রাপ্তির আনন্দ। এ-পৃথিবীতে বিদ্যালাভে যেমন সাধনা ও অধ্যয়ন দরকার, তেমনি অর্থলাভেও প্রচুর শ্রম, নিষ্ঠা, ধৈর্য দরকার। তেমন জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের যে-কোনো লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে প্রয়োজন প্রচুর শ্রমের। শ্রম ছাড়া সৌভাগ্য আসে না। সৌভাগ্যের সঙ্গে শ্রম অঙ্গাঙ্গি জড়িত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই— কঠোর শ্রমের দ্বারাই তাঁরা সাফল্যকে ছিনিয়ে এনেছেন।

২১

যে একা সে-ই সামান্য, যাহার ঐক্য নাই সে-ই তুচ্ছ।

ভাবসম্প্রসারণ : একজন মানুষ যখন একা তখন তার শক্তি থাকে সীমিত। কিন্তু যখন একতাবন্ধ হয়ে দশজন একসঙ্গে কোনো কাজে হাত দেয় তখন সে হয় অনেক সবল ও শক্তিশালী। এই একতাবন্ধ শক্তি তখন রূপ নেয় প্রচণ্ড শক্তিতে। তখন যে-কোনো কঠিন কাজ আর কঠিন মনে হয় না। এজন্য প্রয়োজন একতার। সমগ্র জাতির মধ্যে একতা ছিল বলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়েছি। পাকিস্তানি শক্তিধর সশস্ত্রবাহিনীর বিপুল সৈন্যকে পরাভূত করেছি। একক কোনো শক্তির বলে তা সম্ভব ছিল না। এজন্য আমরা আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি যখন আমাদের জাতীয় জীবনে ঐক্যের অভাব হয়েছে তখনই নানা বিপদ ও দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। শুধু জাতীয় জীবনে নয়, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও একতার প্রয়োজন। একতাবন্ধ হয়ে আমরা যে-কোনো কাজ যত সহজে ও নির্বিঘ্নে করতে পারি একাকী তা করা সম্ভব নয়।

২২

মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

ভাবসম্প্রসারণ : মানবজীবনে সবসময় অর্থের প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থের দরকার। মানুষ এজন্য নানা শ্রম ও ক্লেশ সহ্য করে অর্থ সঞ্চয় করে, কেউ-কেউ প্রচুর অর্থবিত্তেরও অধিকারী হয়। কিন্ত এ অর্জিত ধনসম্পদ চিরস্থায়ী হয় না কখনও। একদিন অর্থবিত্ত ফুরিয়ে যায়। কাজেই এ অর্জিত ধনসম্পদ যদি অর্থবহভাবে ব্যয় করে, কল্যাণকর্মে দান করে তবে সে-ধনের মধ্যে মানুষের মঙ্গল করার ছোঁয়া থাকে। সে-ধন মানুষের উপকারে আসে। আর মানুষ যদি বিলাসব্যসনে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সেই প্রভূত ধন ব্যয় করে তা হলে সে-ধনের কোনো সার্থকতা নেই। হাজী মুহম্মদ মহসীন নিজের বিপুল ধনরাশি এদেশের মানুষের শিক্ষা ও দরিদ্রদের সহায়তায় ব্যয় করেছেন। নিজে জীবন-যাপন করেছেন অত্যন্ত সাধারণভাবে— দীনদরিদ্র বেশে। তাঁর ধন তিনি মানুষের মঙ্গলার্থে ব্যয় করেছেন, নিজের বিলাসব্যসনের জন্য নয়। তাই তিনি এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন। কাজেই সে-ধনই প্রকৃত ধন যে-ধনের মধ্যে মানুষের মঙ্গল করবার ইচ্ছা সম্পৃক্ত থাকে।

২৩

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে;
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে।

ভাবসম্প্রসারণ : আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন থাকে তখন সূর্যের প্রখর আলোতে পৃথিবী উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে সূর্য যখন মেঘে ঢেকে যায় তখন সমস্ত পৃথিবীও অন্ধকারের ঢেকে যায়, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অমাবস্যার গভীর আঁধারেও চাঁদের আলো হারিয়ে যায়। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো তখন কালো অন্ধকারে তলিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লেও তা সাময়িক, কিছুক্ষণ পর আবার মেঘ কেটে যায়। অন্ধকারে চাঁদের আলো সাময়িকভাবে ঢাকা পড়লেও অন্ধকারের বুকে চাঁদের আলো আবার সারা পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে দেয়। মানুষের জীবনও তেমনি। দুঃখ, হতাশা ও বেদনা মানবজীবনে চিরস্থায়ী কিছু নয়। শুধু সুখ বা দুঃখ নিয়েই মানবজীবন নয়, দুঃখের পেছনে সুখ, কান্নার পেছনে হাসি, বেদনার পেছনে আনন্দ আছে পৃথিবীতে। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী দুঃখ ও বেদনায় আমাদের ভেঙে পড়া উচিত নয়। কারণ এ-দুঃখ, এ-বেদনা সাময়িক।

২৪

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

ভাবসম্প্রসারণ : এ-পৃথিবীতে কোনো জিনিসই তুচ্ছ নয়। কোনো বস্তুকেই তুচ্ছ ভাবা উচিত নয়। বাইরের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে সকল জিনিসের যথাযথ মূল্যায়ন করাও সম্ভব নয়। বাইরের দৃষ্টি দিয়ে আমরা অনেক জিনিস সম্পর্কে ভুল ধারণা গ্রহণ করি, প্রকৃত গুণের সন্ধান নিই না। আমরা বাইরের চাকচিক্য ও চমক দেখেই বেশি আকৃষ্ট হই। কোনো জিনিসের মর্মস্থলে কষ্ট করে প্রবেশ করতে চাই না। আবার শুধু বাইরের দিকটাই বড় করে দেখি। কালো পাঁকের মধ্যেই পদ্মফুল ফোটে, সমুদ্রের গভীর তলদেশেই মণিমাণিক্য থাকে। পৃথিবীতে যাঁরা জ্ঞানের সন্ধানী, কৌতূহলী এবং নিরহংকার ব্যক্তি তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানের খোঁজ পান। প্রতিভাধর ব্যক্তি ও মহৎ পুরুষের পরিচয় অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে বলে আমরা তাঁদের চিনতে পারি না। সুতরাং বাইরের রূপ বা আবরণ দেখে কোনোকিছুকে তুচ্ছ ভাবা সমীচীন নয়।

২৫

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি হারায়ে জীবন অচল, অসাড়
পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার।

ভাবসম্প্রসারণ : কর্মচঞ্চলতাই জীবনের সজীবতার লক্ষণ। যার জীবনে এর অভাব রয়েছে সে নিশ্চল, নির্জীব ও স্থবির। নদীতে যতদিন স্রোত থাকে ততদিন নদীর পানিতে কোনোরূপ শৈবাল জন্মাতে পারে না। কিন্তু নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে বা নদীতে পলিস্তর জমার কারণে যদি নদীর স্রোত স্তিমিত হয়ে যায়, তবে নদীতে শ্যাওলা ও কচুরিপানা জন্মে। স্রোতের গতিধারা নষ্ট করে ফেলে, কালক্রমে ঐ নদী মজে যায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তেমনি যদি কোনো জাতি উদ্যম ও সজীবতা হারিয়ে ফেলে, স্বাধীন চিন্তা তাদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি না করে; তবে সে জাতি পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে সমর্থ হয় না। ফলে তাদের নৈতিক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। এ-অবস্থায় তারা কতগুলো জীর্ণ দেশাচার ও লোকাচারকে অবলম্বন করে কোনো প্রকারে হীন ও দুর্বল জাতি হিসেবে বেঁচে থাকে। বিবেকবুদ্ধি বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তারা আপনার দীনতাকে উপলব্ধি করতে চায় না এবং সক্ষমও হয় না। তারা শাঁস ফেলে কেবল খোসা নিয়েই খুশি থাকে। এরূপ সমাজ বা জাতি জীবনের সুখ আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে এক ধরনের জীবন যাপন করে। বস্তুত কোনো জাতির জন্যে এর চাইতে হীনতার কথা আর কিছুই হতে পারে না।

অনুশীলনমূলক কাজ

নিচের উদ্ধৃতাংশগুলোর ভাবসম্প্রসারণ কর :

১. শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে।

২. উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

৩. হে সমুদ্র, চিরকাল কি তোমার ভাষা?
সমুদ্র কহিল, 'মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।'
কিসের স্তব্ধতা তব, ওগো গিরিবর?
হিমাদ্রি কহিল, 'মোর চির-নিরুত্তর।'

৪. নতজানু হয়ে বাঁচার চেয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করাও ভালো।

৫. ভোগে মুক্তি নাই, ত্যাগেই মুক্তি।

৬. সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।

৭. ধন-সম্পদের ক্ষয় আছে কিন্তু জ্ঞানসম্পদের ক্ষয় নেই।

৮. বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসঙ্গে গাঁথা।
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

৯. সন্তোষ সকল সুখের মূল।

১০. কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

১১. প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

১২. স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্র অপেক্ষা ভালো।

১৩. মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

১৪. নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে।

১৫. জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

১৬. দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

১৭. অনেক কিছু ভাবার চেয়ে অল্প কিছু করা ভালো।

১৮. ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

১৯. রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে আসে।

২০. ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।

সারমর্ম

বিশেষ কোনো পদ্য বা কবিতাংশের মূলভাব নির্ণয় করে তাকে সহজ ও সুন্দর ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাকে সারমর্ম বলে। অর্থাৎ মূল মর্মবস্তুটি উদ্‌ঘাটন করে প্রকাশ করাটাই হল সারমর্ম।
সারমর্ম লেখার সময় নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে—

১. সারমর্মে উদ্ধৃতাংশের মূল কথাটি কী তা প্রকাশ করতে হবে।

২. ভাব-সম্প্রসারণের মতো দীর্ঘ ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য সারমর্মে থাকবে না।

৩. মূল উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য দীর্ঘ করার প্রবণতা ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য সারমর্মে থাকবে না।

৪. সারমর্মের আয়তন যেন দীর্ঘ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। মূল উদ্ধৃতাংশের অর্ধেকের বেশি যেন লিখিত সারমর্মের আয়তন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৫. সারমর্ম লেখবার আগে উদ্ধৃত অংশটি কয়েকবার পড়বে এবং মূল বক্তব্য কী তা বুঝতে চেষ্টা করবে। অতঃপর মূল বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত আকারে নিজের ভাষায় লিখবে।

নিচে সারমর্ম লেখার উদাহরণ দেওয়া হল :

১

একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে
দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি সেথা একজন পদ নাহি তার
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ।

সারমর্ম : জীবনে দুঃখ আছে। সেসব দুঃখের মাত্রাভেদ ও রকমফেরও আছে। কোনো কোনো দুঃখ দুর্বিষহ, কোনো কোনো দুঃখ সয়ে নেওয়ার মতো। এই সয়ে নেওয়াটা সম্ভব হয় যখন আমরা পরের অধিকতর দুঃখ ও অভাবের কথা চিন্তা করি।

২

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জন্ম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
জানি নে তোর ধন-রতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন বনেতে জানি না ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন বনেতে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন মেলে মুদব নয়ন শেষে।

সারমর্ম : প্রত্যেক মানুষ তার নিজ মাতৃভূমিকে ভালোবাসে। মাতৃভূমির আলো-বাতাস, গাছপালা, ফলফুল, মানুষকে ব্যাকুল করে। আমাদের জন্মভূমিও আমাদের যে অপার আনন্দ দান করে তা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

৩

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।
সময় সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে

আমরাও হব যে অমর।
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোনো জন পরে,
যশোদ্বারে আসব সত্বর।
কোরো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার সমরাঙ্গান মাঝে
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
ব্রতী হয়ে নিজ নিজ কাজে।

সারমর্ম : পৃথিবীতে যাঁরা কর্ম, জ্ঞানসাধনা দ্বারা মহৎ আদর্শ স্থাপন করেছেন তাঁরা যুগে যুগে সব মানুষের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের অনুসৃত জীবনকে অনুসরণ করে আমাদের চলতে হবে। মহৎ কর্মসাধনের জন্য আমাদের সংকল্পবন্ধ হতে হবে।

৪

রচি গৃহ হাসি মুখে ফিরে সন্ধ্যা বেলা
জননীর অঙ্গোপরে প্রাতে ফিরি আসি
হেরে তার গৃহখানি কোথা গেছে ভাসি
আবার গড়িতে বসে সেই তার খেলা
ভাঙা আর গড়া নিয়ে কাটে তার বেলা।
এই যে খেলা হায় এর আছে কিছু মানে?
যে জন খেলায় খেলা সেই বুঝি জানে।

সারমর্ম : ভাঙাগড়াই পৃথিবীর নিয়ম। সৃষ্টির সূচনা থেকেই এই ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। বিশ্বস্রষ্টার এই খেলার মধ্যেই নিহিত আছে জীবনের চলমানতা ও গতি।

৫

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে
কবে সে হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে, সেও অতি নির্বোধ অধম।
খেয়াতরী চলে গেল, বসে থাক তীরে—
কিসে পার হবে তরী না আসিলে ফিরে?

সারমর্ম : আমাদের সময়ানুবর্তী হতে হবে। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে। নইলে হারানো সময়ের যে-ক্ষতি তা আর কোনোদিন পুষিয়ে নেওয়া যাবে না। তখন অনুশোচনা করেও কোনো লাভ হবে না।

৬

নদী কভু নাহি পান করে নিজ জল
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরের অন্নদান।
স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

সারমর্ম : পরের মঙ্গালসাধনই মানুষের ব্রত হওয়া উচিত। প্রকৃতি থেকেও আমরা এ শিক্ষাই পাই। নদী ও বৃক্ষের দিকে তাকালে আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখি। গাভী আপন সুপেয় দুধ দান করে, স্বর্ণ তার ঔজ্জ্বল্য দিয়ে অন্যকে তুষ্ট করে, মুগ্ধ

করে। পরের কল্যাণসাধন ও পরহিতই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

৭

স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালোবাসে
সুখের আলো জ্বলে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে
স্বাধীনতা সোনার কাঠি খোদার সুধা দান
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ।

সারমর্ম : স্বাধীনতা মানবজীবনের অতুলনীয় সম্পদ। স্বাধীনতাহীন জীবনের কোনো মূল্য নেই। স্বাধীনতাহীন জীবন দাসত্বের সমতুল্য। একটি মুক্ত পাখির জীবনে খড়কুটোর বাসায় যে আনন্দ, সোনার খাঁচার শৃঙ্খলিত জীবনে তা নেই। একজন দরিদ্র ব্যক্তির স্বাধীন জীবন, পরাধীন বিলাসবহুল ধনাঢ্য জীবনের চেয়ে হাজারগুণ শ্রেষ্ঠ।

৮

নদী আর কালগতি একই সমান
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।
ধীরে ধীরে নীরব গগনে গত হয়,
কি ধনে, কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়।
উভয়েই গত হলে আর নাহি ফিরে,
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে।
বিফলে বহে না নদী যথা নদী ভরা,
নানা শস্য শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল, সদাত্মা, ক্ষেত্রের শোভাকর
উভয় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

সারমর্ম : নদীর স্রোত আর সময় একই ধারায় চলে। নদীর স্রোত যেমন নিরন্তর বয়ে চলে তেমনি কালের গতিকেও রোধ করা যায় না। সময়ের যথাযথ ব্যবহারে জীবন সুন্দর হয়, সময়ের অপচয় করলে জীবন অর্থহীন ও শূন্য হয়ে পড়ে।

৯

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে— ,
কহে, যাহা-কিছু সুখ সকলি ওপারে।

সারমর্ম : প্রত্যেক মানুষ মনে করে তার চেয়ে অন্যজন বেশি সুখী। নদীর এপারের লোক যেমন মনে করে ওপারের লোক বেশি সুখে আছে, ওপারের মানুষও সেরকমই ভাবে। ভাবে অন্যরা বেশি ভালো আছে। এটা আসলে ভ্রান্ত ধারণা। সুখ–দুঃখ সব মানুষেরই আছে। পৃথিবীতে কেউ এককভাবে সুখী নয়।

১০

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
গড়ে যুগ-যুগান্তর— অনন্ত মহান,
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান স্নেহপূর্ণ বাণী,
— এ ধরায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম : পৃথিবীতে কোনো জিনিসই তুচ্ছ নয়, অবহেলা বা ঘৃণা করে ফেলে দেওয়ার নয়। সৃষ্টির প্রত্যেক জিনিসই মূল্যবান— তা যত ক্ষুদ্রই হোক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা দিয়ে যেমন সাগর মহাসাগর হয়, তেমনি ক্ষুদ্র অপরাধ থেকে গুরুতর

অপরাধের সৃষ্টি হয়। সুতরাং কোনো ক্ষুদ্র জিনিসই উপেক্ষা করার মতো নয়।

১১

অধমে রতন পেলে কী হইবে ফল?
উপদেশে কখনও কি সাধু হয় খল?
ভালো-মন্দ, দোষ-গুণ আধারেতে ধরে,
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগরে।
লবণ জলধি জল করিয়া ভক্ষণ
জলধর করে দেখ সুধা বরিষণ।
সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।

সারমর্ম : মানুষের ত্রুটি ও দোষগুলো ছোট করে দেখলেই তার মহৎগুণগুলোর পরিচয় পাওয়া যায়। যারা ক্ষুদ্র মনের তারা অন্যের ত্রুটিগুলোই শুধু অন্বেষণ করে। যিনি উদারচিত্ত ও মহৎপ্রাণ তিনি মানুষের ভালো দিকগুলোই দেখেন, প্রশংসা করেন। এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

১২

'বসুমতি! কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস;
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি, কন বসুমতী—
'আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে
তোমার গৌরব তাতে একেবারে ছাড়ে।'

সারমর্ম : বিনাশ্রমে কোনোকিছু পাওয়ার মধ্যে যেমন আনন্দ নেই, তেমনি গৌরবও নেই। এই শস্যশ্যামল পৃথিবীতে মানুষ যদি পরিশ্রম করে শস্য না ফলাত তা একদিন বনজঙ্গালে পরিণত হত, মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত হত। শ্রম দিয়ে, ক্লেশ দিয়ে এ পৃথিবীকে মানুষ সুন্দর করে তুলেছে।

১৩

কহিল কঞ্চির বেড়া "ওগো পিতামহ'
বাঁশবন হয়ে কেন রহ অহরহ?
আমরা তোমার বংশে ছোট ছোট ডাল
তবু মাথা উঁচু করে থাকি চিরকাল।"
বাঁশ কহে, "ভেদ তাই ছোটতে বড়তে
নত হই, ছোট নাহি হই কোনো মতে।"

সারমর্ম : অবনত ও বিনীত হওয়ার মধ্যে অগৌরব নেই। বিনয় ও নিরহংকার ভাব মানুষকে বড় করে। কঞ্চির অগ্রভাগ মাটি থেকে দূরে, উপরে থাকে। এজন্য তার অহংকারের কিছু নেই। মানুষকে তার শেকড় ও মূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ওপরে ওঠার জন্য ঔদ্ধত্য কাউকে বড় করে না, বরং নীচ করে।

১৪

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
হাট ভরে দিই আমি কত শস্যফল।
পর্বত দাঁড়ায়ে ক'ন, কী জানি কী কাজ,
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ।
বিধাতার অবিচার, কেন উঁচু নিচু,
সে কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু।'

গিরি কহে, 'সব হলে সমভূমি পারা
নামিত কি ঝরনার সুমজ্ঞাল ধারা।'

সারমর্ম : সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে আমরা এর প্রচুর উদাহরণ দেখতে পাই। এরূপ বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত আছে মানুষের জন্য নানারূপ কল্যাণ। এসত্য আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

১৫

যে দেশে রয়েছে মম প্রিয় পরিবার—
স্নেহের পিতা আর জননী আমার
স্নেহের পুতুল সম ভাই-ভগ্নী যত
এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত কুসুমের মতো।
যে দেশে খেলার সাথী আর বন্ধুগণ
সুশোভিত আছে যেন নন্দন কানন।
ধরাতলে কোথা আছে তার মতো স্থান
সেই মম জন্মভূমি স্বর্গের সমান।

সারমর্ম : পৃথিবীতে জন্মভূমির সঙ্গে কোনোকিছুর, কোনো স্থানের তুলনা হয় না। প্রীতিডোরে, স্নেহসুধা আর আত্মীয়-পরিজনে ঘেরা যে জন্মভূমি তাতে আছে পরম শান্তি ও স্বর্গসুখ।

১৬

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মতো কেন বলিস?
পরের ভঙ্গী নকল করে নটের মতো কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কিছু বাড়ল তাতে?
আপনাকে যে ভেঙে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অলীক ফাঁকি মেকি সেজন নামটা তার কদিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন কাজে ডুবে যা রে,
খাঁটি ধন সেথাই পাবি আর কোথাও পাবি না রে।

সারমর্ম : অন্ধ পরানুকরণ ও অন্যের নকলের মধ্যে যেমন স্বকীয়তা নেই, তেমনি নেই কোনো গৌরব। বরং পরের হুবহু অনুকরণের মধ্যে আছে এক ধরনের গ্লানি ও নীচতা। এজন্য পরের অনুকরণ যতই চাকচিক্যময় হোক তা বাদ দিয়ে আপন চেষ্টা ও সৃষ্টিশীলতায় নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

১৭

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র।
নানানভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবা রাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতূহলে
নেই দ্বিধা লেশ মাত্র।

সারমর্ম : এ-পৃথিবী মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষালয়। পাঠ্যবইয়ের প্রতি পাতায় যেমন শিক্ষণীয় বিষয় থাকে, এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস-বৃক্ষ-সাগর-পাহাড়ের দিকে তাকালেই আমরা নানা জ্ঞান লাভ করতে পারি, নিজেকে গড়ে তুলতে পারি।

১৮

ধনে কি মানুষ বড় হয়? ধনের মানুষ কখনই বড় মানুষ নহে। আমি ধন দেখিয়া তোমাকে সমাদর করিব না, জন দেখিয়া তোমায় আদর করিব না, সিংহাসন দেখিয়া তোমায় সম্মান করিব না, বাহুবলের জন্য তোমায় সম্ভ্রম করিব না, কেবল তোমার

মন দেখিয়াই তোমাকে পূজা করিব। তুমি যদি স্বয়ং অমানুষও হও, অথচ দণ্ডধর হইয়া আমাকে দণ্ডদানে উদ্যত হও, তথাপিও আমি দণ্ড ভয়ে কদাচ তোমাকে মান্য করিব না। কিন্তু তুমি যদি পবিত্রচিত্ত সাধু স্বভাবে ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়াও আগমন কর, তবে তোমার দর্শনমাত্রেই আমি শ্রদ্ধায় মাথা নত করিব। সুতরাং যদি মানুষ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে মনকে বিমল কর ও তুমি সরল হও, নিজে ছোট হইলেই বড় হইবে, আপনাকে বড় জানিলে কখনও বড় হইতে পারিবে না।

সারমর্ম : মানুষের পরিচয় তার গুণে, ধন ও শক্তিতে নয়। মানুষের চরিত্রই তার আসল অলংকার। এই মহৎ চরিত্রের জন্যই মানুষ অন্যের শ্রদ্ধালাভে সফল হয়। মনের বিমলতা ও সরলতা মানুষকে বড় করে। নিজেকে বড় ভাবলেই বড় হওয়া যায় না।

১৯

কিসে মর্যাদা হয়? দামি কাপড়, গাড়ি-ঘোড়ায়, না ঠাকুর-দাদার কালের উপাধিতে? না, মর্যাদা এইসব জিনিসে নেই। আমি দেখতে চাই, তোমার ভেতর, তোমার বাহির, তোমার অন্তর। আমি জানতে চাই তুমি চরিত্রবান কিনা; তুমি সত্যের উপাসক কিনা। তোমার মাথা দিয়া কুসুমের গন্ধ বেরোয়, তোমায় দেখলে দাসদাসী দৌড়ে আসে, প্রজারা তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ কর। বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি তোমায় আদর করেন। আমি তোমায় অবজ্ঞায় বলব— যাও।

সারমর্ম : ধনসম্পদ, উপাধি-তকমা সামাজিক মর্যাদা মানুষকে প্রকৃত অর্থে বড় করে না। বংশগৌরব ও প্রতিপত্তিও মানুষকে বড় করে না। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা তার চরিত্রের মধ্যে। তাই আমাদের চরিত্রবান হওয়ার সাধনা করতে হবে।

২০

মুখে অনেকেই টাকা তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলে থাকেন; কিন্তু জগৎ এমনই ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকলে তার স্থান কোথাও নেই, সমাজের নিকট নেই, স্বজাতির নিকট নেই, ভ্রাতা-ভগিনীর নিকটও কোনো প্রত্যাশা নেই। স্ত্রীর ন্যায় ভালোবাসে বল তো জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকলে অমন অকৃত্রিম ভালোবাসারও আশা নেই। কারও নিকট সম্মান নেই। টাকা না থাকলে রাজায় চেনে না, সাধারণ্যে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তে টাকা, জগতে টাকারই খেলা।

সারমর্ম : বাস্তব জীবনে টাকার প্রয়োজন উপেক্ষা করা যায় না। আদর্শগত দিক দিয়ে জীবনে টাকাকে অনেক অশান্তির উৎস মনে করে। কিন্তু জীবনে চলার জন্য টাকার প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই।

২১

সময় ও স্রোত কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না, চিরকাল চলিতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় কর, ইহাকে ভয় দেখাও ভ্রূক্ষেপও করিবে না; সময় চলিয়া যাইবে, আর ফিরিবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না, গত সময় আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না।

সারমর্ম : নদীর স্রোত নিয়ত প্রবহমান। সময়ও বহমান। দুটিই কারও জন্য অপেক্ষা করে না। তাই যে-সময় চলে গেল অমনোযোগ ও অবহেলায় তার জন্য অনুশোচনা করা নিরর্থক। তাই সময়ের কাজ সময়ে করাটাই সর্বোত্তম।

২২

মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতিনীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মনুষ্যের হৃদয়ে জ্বালা ও বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মনুষ্য তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই মানুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। যার স্বভাব মন্দ, সে নিজেও দুষ্ক্রিয়াশীল, মিথ্যাবাদী, দুর্মতিকে ঘৃণা করে। স্বভাব গঠনে কঠিন পরিশ্রম ও সাধনা চাই। যে স্বভাব গঠনের চেষ্টা করে, চিন্তা করে, সে এবাদত করে।

সারমর্ম : মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার স্বভাব ও চরিত্রমাধুর্যের মধ্যে। বাইরের সুন্দর মুখাবয়ব একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় বহন করে না। সুন্দর স্বভাবের মধ্যে মানুষের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আমাদের এরূপ সৌন্দর্যেরই সাধনা করতে হবে।

২৩

খুব ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়েও কোনো ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন ছোট ছোট কাজেই মানবচরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কীরূপ তাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। বড়, ছোট ও সমবয়স্কদের

প্রতি শোভন ব্যবহার করার মাধ্যমে আনন্দেরও প্রকাশ ঘটে।

সারমর্ম : মানুষের প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে তার ছোটখাটো কাজের মাধ্যমে। সুশৃঙ্খল জীবন, সব মানুষের প্রতি সুন্দর ব্যবহারের মধ্যে একজন মানুষের চরিত্রমাধুর্য ফুটে ওঠে।

২৪

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ— মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়াই আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে; পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

সারমর্ম : মানুষ সৃষ্টির সব প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ, মানুষের মধ্যে রয়েছে বিবেক ও বুদ্ধি। এই বিবেক ও বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ যেরূপ আপন চিৎ-প্রকর্ষের বিকাশ ঘটাতে পারে অন্যান্য প্রাণী তা পারে না। মানুষের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি আছে বলেই জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। জাতীয় জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

২৫

মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরান আকুল করে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসী থাকে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষায় কল্পনা সুন্দরী তাহার মন–মজানো ছবি আঁকে? কাহার হৃদয় এত পাষাণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহাতে জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনো জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে?

সারমর্ম : মাতৃভাষা সব মানুষের প্রিয়। আমরা যখন দেশ থেকে দূরে যাই তখন এই ভাষার জন্য মন যেন আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রকৃত পক্ষে মাতৃভাষার উন্নতি ছাড়া কোনো জাতি বড় হতে পারে না।

২৬

সত্য ওজন দরে বা গজের মাপে বিক্রয় হয় না, তাহা ছোট হইলেও বড়। পর্যাপ্ত পরিমাণ খড় বিচালি স্ফুলিঙ্গ পরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে, সেইখানেই সমস্ত সেজটার সার্থকতা। সেজের নিম্নভাগে অনেকখানি তৈল আছে, তাহার পরিমাণ যতই হউক, সেইটিকেই আসল জিনিস বলিবার কোনো হেতু নাই। সকল সমাজের প্রদীপের আলোটুকু যাহারা জ্বালাইয়া আছেন তাঁহাদের সংখ্যা হিসাবে নহে, সত্য হিসাবে সে সমাজে অগ্রগণ্য। তাঁহারা দগ্ধ হইতেছেন, আপনাকে তাঁহারা নিমেষে নিমেষে ত্যাগই করিতেছেন, তবু তাঁহাদের শিক্ষা সমাজে সকলের চেয়ে উচ্চে, সমাজে তাঁহারাই সজীব, তাঁহারাই দীপ্যমান।

সারমর্ম : সমাজে মহৎ ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। যারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁদের সংখ্যা খুবই স্বল্প। কিন্তু এসব সত্যব্রতী মহৎ ব্যক্তিদের আলোর ছটায় সমাজ আলোকিত হয়, সমাজ বেঁচে থাকে, পথ দেখে।

২৭

অনেকের ধারণা এই যে, মহৎ ব্যক্তি শুধু উচ্চ বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, নীচুবংশে মহতের জন্ম হয় না। কিন্তু প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, মানুষের এই ধারণা অতিশয় ভ্রমাত্মক। পদ্মফুল ফুলের রাজা। রূপে গন্ধে সে অতুলনীয়। কিন্তু ইহার জন্ম হয় পানের অযোগ্য পানিভরা এঁদো পুকুরে। পক্ষান্তরে বটবৃক্ষ বৃক্ষকুলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বটে। অথচ বহু বৃক্ষের ফল আমরা আস্বাদন করি, এত খ্যাতনামা যে বটবৃক্ষ, তাহার ফল আমাদের অখাদ্য।

সারমর্ম : বংশ বা জন্মমর্যাদা মানুষের বড় পরিচয় নয়। নিজের গুণ ও সৌন্দর্যে, নিজের মহত্ত্ব ও উদারতায় মানুষ বড় হতে পারে।

২৮

অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাই নে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু করুণ চাহনি নিক্ষেপ কর, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান, মানবতাসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন, পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

সারমর্ম : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের দ্বারা, সহায়তার দ্বারা আমরা মানুষের উপকার করতে পারি। আমরা একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে অন্যের মনে আশা জাগাতে পারি। এতেই মানুষের মহত্ত্বের পরিচয় ঘটে।

২৯

অভাব আছে বলিয়াই জগৎ বৈচিত্র্যময়। অভাব না থাকিলে জীবসৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। আমাদের সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়াই কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই স্থাণু, স্থবির হইতে হইত, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই তো আমরা সেবার সুযোগ পাইয়াছি। সেবা মানবজীবনের ধর্ম। দুঃখ আছে বলিয়াই সে সেবার পাত্র যত্রতত্র সদাকাল ছড়াইয়া রহিয়াছে। যিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন, তিনি যেমন জগতের বন্ধু, তেমনি যিনি দুঃখে আমাদের সেবার পাত্রে অজস্র দান করিতেছেন, তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শত্রু মনে করিও না, দুঃখ আমাদের বন্ধু।

সারমর্ম : দুঃখ মানুষের শত্রু নয়। দুঃখ আছে বলেই দুঃখজয়ের সাধনা মানুষের চিরন্তন। দুঃখ আছে বলেই জীবন সুখদুঃখে বৈচিত্র্যপূর্ণ। দুঃখ আছে বলেই মানুষ সেবার সুযোগ পায়, পরের কল্যাণে ব্রতী হয়, সৌহার্দ্যের শিক্ষা লাভ করে।

৩০

অভ্যাস এক ভয়ানক জিনিস—একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন মিথ্যা বলবে না। ছ মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভ দিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সপ্তাহে তুমি দুদিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা কোরো না—তাহলে সব পণ্ড হবে।

সারমর্ম : জীবনে কোনোকিছুই হঠাৎ অর্জন করা যায় না, মন্দ অভ্যাসেরও হঠাৎ পরিবর্তন করা যায় না। ধীর ও কঠোর অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে তা আয়ত্ত করতে হয়। এজন্য দরকার সাধনা।

৩১

একটা বরফের পিণ্ড ও ঝরনার মধ্যে তফাত কোনখানে? না, বরফের পিণ্ডের মধ্যে নিজস্ব গতি নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবে সে চলে। কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার নিজের গতি, সেজন্য এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, তার মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এ জন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায়, ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মনেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-ভাবনাই তাকে ঠেলে কাজ করায়। তখন প্রতি কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরে নিশ্চলতা থেকে বাইরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্র-শাসন। তখন মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও আষ্টেপৃষ্ঠে সে বন্ধ।

সারমর্ম : মানুষের মন যখন স্থবির, নিশ্চল ও গতিহীন হয়ে পড়ে তখন নানা কুসংস্কার তার মনে বাসা বাঁধে। তখন মনটাই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মনকে গতিশীল ও সচল করতে পারলে ওইসব বাধা ভেসে যায়।

৩২

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলো পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, তুমি দেবভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে না, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও; দেখিবে, সেই স্বর্গের সুষমা আর নাই—নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কী এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোনো রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

সারমর্ম : মানুষের যতগুলো কদর্য ও অসুন্দর দিক আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হল ক্রোধ। ক্রোধ মানুষকে পশুতে রূপান্তরিত করে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

৩৩

তুমি যদি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হও, সিংহাসনে বসিয়া অনেকের ওপর প্রভুত্ব কর, লোকে তোমাকে মহারাজ চক্রবর্তী বড় মানুষ বলিয়া মহাসম্ভ্রমে সম্বোধন করিবে। কিন্তু তুমি যদি আসল মানুষ না হও, তবে মানুষ তোমায় কখনই মানুষ

বলিবে না। ধনে কি মানুষ বড় হয়? ধনের মানুষ কখনই মনের মানুষ নহে, ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ। আমি ধন দেখিয়া তোমাকে সমাদর করিব না, জন দেখিয়া তোমাকে আদর করিব না, সিংহাসন দেখিয়া তোমায় সম্মান করিব না, বাহুল্যের জন্য তোমায় সম্মান করিব না— কেবল মন দেখিয়া তোমার পূজা করিব।

সারমর্ম : মানুষের মনের উদারতা ও মহত্ত্বই মানুষকে বড় করে। বিপুল ঐশ্বর্য বা সম্পদ দিয়ে মানুষ কারও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না।

অনুশীলনমূলক কাজ

নিচের কবিতা ও গদ্যাংশগুলোর সারমর্ম লেখ।

১

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।
একই পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবিশশি মোদের সাথী।
শীততাপক্ষুধা–তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি।
কচিকাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো
জলে ডুবে বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।

২

স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালোবাসে,
সুখের আলো জ্বালে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি খোদার সুধা দান,
স্পর্শে তাহার নেচে ওঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায় পশুর হৃদয় তলে,
বুক ফুলায়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।
দর্পভরে পদাহত উচ্চ করে শির,
শক্তিহীনেও স্বাধীনতা আখ্যা দানে বীর।

৩

চাই আমি মহতের মহৎ পরাণ
মুকুতা মাণিক্য নিধি আমারে দিও না বিধি
চাইনে এ জগতের রাজত্ব সম্মান।
বাকি পরাণ পেলে প্রাণটুকু দিও ঢেলে
মেগে নেব মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদান।
প্রাণের সাধন আমি সাধনীয় প্রাণ।

৪

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা
আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই,
যে মোরে করেছে পর।

যে মোরে করিল পথের বিবাগী,
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি।
আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা
আমি তার কূল বাঁধি
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া
তার লাগি আমি কাঁদি।

৫

দেখ এই চরাচরে যে যেমন কর্ম করে,
তেমন সে ফল তার পায়।
যে চাষা আলস্য ভরে বীজ না বপন করে,
পক্ব শস্য পাবে সে কোথায়?
যদ্যপি শকতি থাকে পড়িতে দেখহে যাকে
হাত ধরে তুলে ধর তারে।
নতুবা তুমি যে কালে পতিত হবে সে হালে
কে তখন তুলিবে তোমারে?
তাই যদি হয় ধীর দুঃখিতের অশ্রুনীর
নিজ করে না কর মোচন;
তব অশ্রু নিরখিয়া দুঃখী হবে কার হিয়া
কে তাহা করিবে নিবারণ?

৬

সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
জানি না তোর ধন রতন, আছে কিনা রানীর মতন;
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়াই তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল গন্ধ এমন করে আকুল,
কোন্ বনেতে ওঠেরে চাঁদ— এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

৭

সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুলো সেথা নাহি জন্মে কোনো মতে।
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ ধরে,
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।

৮

এ জগতে যিনি উঠেন, তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া, সাধারণের মধ্যে বাড়িয়া, সাধারণের ওপর মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান। তিনি অভ্যন্তরীণ মাল-মসলার সাহায্যেই বড় হইয়া থাকেন। কৃশকায় লতা যেমন যষ্টির সাহায্যে মাচার ওপর ওঠে, তেমনি কোনো কাপুরুষ, কোনো অলস, শ্রমকাতর মানুষ কেবল অপরের সাহায্যে এ জগতে কবে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন? এ জগতে উঠিয়া-পড়িয়া, রহিয়া-সহিয়া, ভাঙিয়া-গড়িয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া মানুষ হইতে হয়। ইহা ছাড়া মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভের অন্য পথ নাই।

৯

খুব ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়েও কোনো ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন ছোট ছোট কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কীরূপ তাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। বড়, ছোট ও সমতুল্যের প্রতি সুশোভন ব্যবহার আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন উৎস।

১০

পৃথিবীতে যাহার দিকে তাকাও দেখিবে সে নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট। দরিদ্র কিসে ধনী হইবে সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন, ধনী চোর-ডাকাতের ভয়ে ত্রস্ত। রাজা শত্রুর ভয়ে ভীত। এক কথায়, পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে পূর্ণ সুখে সুখী। অথচ কৌতূহলের বিষয় এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেও কেহ প্রস্তুত নহে। মৃত্যুর নাম শুনিলেই দেখি মানুষের মুখ শুকাইয়া যায়। মানুষ যতই দরিদ্র হউক, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহাকে অনাহারে কাল কাটাইতে হউক, পৃথিবীর কোনো আরাম যদি তাহার ভাগ্যে না থাকে তথাপি সে মৃত্যুকে চাহে না। সে যদি কঠিন পীড়িত হয়, শয্যা হইতে উঠিবার শক্তিও না থাকে, তথাপি সে মৃত্যুর প্রার্থী হইবে না। কে না জানে যে, শত বৎসরের পরমায়ু থাকিলেও তাহাকে একদিন না একদিন মরিতে হইবে।

১১

শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। কালি-ধুলার মাঝে, রৌদ্র-বৃষ্টিতে কাজের ডাকে নেমে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার দরকার নাই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের ভিতর কুবুদ্ধি কুমতলব মানবচিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরে সামর্থ্য জন্মে, স্বাস্থ্য, শক্তি, 'আনন্দ, ফুর্তি' সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয় তা পরম আনন্দের অবকাশ। তখন কৃত্রিম আয়োজন করে আনন্দ করবার কোনো প্রয়োজন হয় না। শুধু চিন্তা দ্বারা জগতের হিতসাধন হয় না। মানবসমাজে বিভিন্ন ধরনের কাজে-কর্মে, রাস্তায়, কারখানায় মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে।

সারাংশ/ভাব-সংকোচন

গদ্য অথবা পদ্য—যে-কোনো রচনা বা রচনাংশের মূলভাবকে সহজ-সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে লিখবার নামই সারাংশ লিখন। কারণ সেসব রচনা বা রচনাংশ কোনো একটি বিষয়কে নানারকম যুক্তি, দৃষ্টান্ত, উপমা ও রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। সেই যুক্তি, দৃষ্টান্ত, উপমা, রূপকাদি বাদ দিয়ে অল্প কথায় মূল বক্তব্যটি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হলে, তাকে সারাংশ বলে।

সারাংশ লিখবার সময় কয়েকটি দিকে ভালোমতো লক্ষ করতে হবে—

১. সারাংশ লিখবার পূর্বে প্রদত্ত অংশটি খুব মনোযোগ দিয়ে বারবার পড়ে মূল বক্তব্যটি খুঁজে নিতে হবে।
২. প্রদত্ত অংশের দৃষ্টান্ত, উপমা, অলংকার ইত্যাদি বাদ দিয়ে সার অংশটি প্রকাশ করতে হবে।
৩. কোনো কথা দুবার যেন লেখা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
৪. প্রদত্ত অংশে উল্লেখ নেই এমন কথা লেখা উচিত নয়।
৫. মূল অংশটিকে সহজ, সরলভাবে প্রকাশ করতে হবে।
৬. সারাংশ আকারে ছোট হবে এবং ভাষা প্রাঞ্জল, মার্জিত ও শ্রুতিমধুর হতে হবে।

সারাংশ ও সারমর্মের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আর তা হল— সারাংশ হচ্ছে মূল বক্তব্য আর সারমর্ম হচ্ছে মূল বক্তব্যের মর্মকথা। কোনো রচনাংশের সারমর্ম লিখতে হলে লেখক-কবি কী বলতে চেয়েছেন সে-ভাবকে খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে সারমর্ম সারাংশ থেকেও আকারে ছোট। সারমর্মকে মর্মার্থ বা ভাবার্থও বলা হয়। নিচে প্রথমে কিছু সারাংশ পরে সারমর্মের উদাহরণ দেওয়া হল :

গদ্যাংশ

১

আমরা যে ভাষায় কথা বলি তাহার নাম বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা বাঙালির মাতৃভাষা। তুমি যখন তোমার মায়ের স্তন পান করিয়াছ, সেই কাল হতেই বাংলা ভাষায় তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছ। অতএব, তুমি তোমার পরমারাধ্য মাতাকে যেরুপ ভালোবাস, বাংলা ভাষাকেও সেইরূপ প্রাণের সহিত ভালোবাসিও এবং বিশুদ্ধ বাংলা শিক্ষা করিয়া স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিও। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি রাজ্যে ভদ্রলোকেরা মাতৃভাষাকে মাতৃতুল্য জ্ঞানে যারপরনাই সম্মান করেন। তাঁহাদের লেখায় অতি ক্ষুদ্র একটি ভুল ধরা পড়িলে তাঁহারা চিত্তের গ্লানিতে ম্রিয়মাণ হন। বাংলা ভাষা বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাঙালি কবি হিসাবে আজ সমস্ত বিশ্বের সমাদর লাভ করিয়াছেন।

সারাংশ : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মায়ের কোল থেকেই এ ভাষায় প্রাণের ভাষা প্রকাশ করতে শিখেছি। তাই বাংলা ভাষাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা এবং শুদ্ধভাবে বাংলা শিখে স্বজাতির গৌরব বাড়ানো উচিত। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশের লোকেরা তাদের মাতৃভাষাকে মায়ের মতো মনে করেন এবং লেখায় সামান্য ভুল ধরা পড়লেও খুব লজ্জিত হন। আমাদের মাতৃভাষার প্রতিও সেভাবে শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত।

২

বিদ্যা মঙ্গলের নিদান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু অল্প বিদ্যা মারাত্মক। সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপনার যথার্থ মূল্য বুঝিয়া চলা উচিত। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বিশেষরূপে দক্ষ নহে, তাহার পক্ষে সেই কার্যে হস্তক্ষেপ অবিধেয়। যে ব্যক্তি অশিক্ষিত, সুশিক্ষিতের ভান করা তাহার অনুচিত। কেননা, ইহাতে সে যে কেবল আপনার ক্ষতি করে তাহা নহে; তাহার এই রূপে আচরণের দ্বারা সমাজেরও বিষম অনিষ্ট সাধিত হয়। হাতুড়িয়া বৈদ্যগণ প্রকৃত চিকিৎসক নহে, চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহাদের অতি অল্প জ্ঞানই থাকে। কিন্তু তাহা তাহারা নিজেরাও বুঝে না বা বুঝিলেও অপরের নিকট স্বীকার করে না। সুতরাং তাহারা সুচিকিৎসার ভান করিয়া যদি সংকটাপন্ন রোগীর চিকৎসার ভার গ্রহণ করে, তবে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাহারা সমাজের অজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারিত করিয়া উহাদের ভীষণ ক্ষতি সাধন করে। তাহাদের এই কার্যের জন্য চিকিৎসাবিদ্যা দায়ী নহে। দায়ী তাহাদের চিকিৎসাবিদ্যায় অল্পজ্ঞান।

সারাংশ : বিদ্যা মানুষের অমূল্য সম্পদ এবং মঙ্গলময়, কিন্তু অল্প বিদ্যা মারাত্মক। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব মূল্য বুঝে চলা উচিত। যার যে-বিষয়ে জ্ঞান নেই তার সে-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আর তেমনটি হলে নিজের ক্ষতি হয়। হাতুড়ে ডাক্তারদের হাতে রোগী প্রাণ হারায় এজন্য তাদের অল্পজ্ঞানই দায়ী।

৩

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব জ্ঞান ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বলেই মানুষের জীবনে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য; অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই।

জগতে যেসকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূল এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের মতো স্বাধীনতাপ্রিয়। চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশ : চরিত্রেই মানুষের মূল্যায়ন হয়। আর এই চরিত্রবলেই মানুষ ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করে। সকল মহাপুরুষ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। চরিত্র বলতে শুধু নৈতিক চরিত্রকে বোঝায় না— নম্রতা, ভদ্রতা, জ্ঞান, সত্যবাদিতা, মানবতা ও স্বাধীনতা বোঝায়।

৪

ছাত্রজীবন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এসময় যে যেমন বীজ বপন করবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে সেইরূপ ফল ভোগ করবে। এসময় যদি আমরা নিষ্ঠার সাথে জ্ঞানের অনুশীলন করে যাই, তবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হবে। আর যদি হেলায় সময় কাটিয়ে দিই, তাহলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে শিক্ষা জীবন ও জীবিকার পথে কল্যাণকর; যে শিক্ষা মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে, তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। ছাত্রদের জীবন গঠনে শিক্ষক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের জীবন গঠিত হয় এবং উন্মুক্ত হয় মহত্তর সম্ভাবনার পথ।

সারাংশ : ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এসময়ে পরম নিষ্ঠার সাথে যে-বিদ্যা অর্জন করবে, সে বিদ্যাই ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পাথেয় হবে। ছাত্রদের চরিত্রগঠনে, উচ্চশিক্ষা ও মহত্তর জীবনলাভে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিহার্য।

৫

উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ নিরঙ্কুশভাবে বিহার। যাহাদের নেতা বা শাসক নাই, তাহারাই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। তাই কোনো ভক্তিভাজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদেশ অনুসারে চলা উচ্ছৃঙ্খলতানাশের একটি প্রধান উপায়। সৈনিক যেমন সেনাধ্যক্ষের আদেশের সম্পূর্ণ অধীন থাকেন, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করেন না, তেমনি কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আজ্ঞাধীন হইয়া চলিলে বা সর্বদা তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কাজ করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা কমিয়া যায়। স্বেচ্ছাচার দমন করা নিতান্ত আবশ্যক।

সারাংশ : অভিভাবকহীন ও শাসকহীন অবাধ জীবন-যাপনই মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করে। সৈনিক যেমন তার সেনাধ্যক্ষের অধীনে আদেশ পালন করে, তেমনি কোনো ভক্তিভাজন ব্যক্তির অধীনে থাকলে উচ্ছৃঙ্খলতা কমে যায়। জীবনে স্বেচ্ছাচারিতা দমন করা অপরিহার্য।

৬

সব সুন্দর আপনাকে গোপন রাখে, অসুন্দর সে নিজেই এগিয়ে আসে। ফুল কতখানি সুন্দর হয়ে ফোটে তা সে নিজেই জানে না, প্রজাপতি জানে না যে, কতখানি সুন্দর তার গতাগতি, শামুক জানে না যে তাজমহলের চেয়ে আশ্চর্য সুন্দর সমাধি গড়ে যাচ্ছে সে। যে কাজ রচয়িতা 'কেমনটা বানিয়েছি' এটুকুই প্রকাশ করে গেল কাজ। অসুন্দর হল? সুন্দরের নিদর্শন ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল। সেখানে প্রত্যেক পাথর কী কৌশলে একের পর এক স্তূপাকার করে তোলা হয়েছে এইটিই দেখা যায়। কারিগর তার তোড়জোড় নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে বুক ফুলিয়ে। কিন্তু তাজমহল? সেখানে কারিগর কেমন করে পাথরগুলো কোন কোন খানে জুড়েছে তার হিসেবটিও যতটা সম্ভব মুছে দিয়ে তার সৃষ্টিকে এগিয়ে আসতে দিয়েছে সামনে।

সারাংশ : প্রাকৃতিকভাবেই সুন্দর ধরা দেয়। ফুলের বিকাশ, প্রজাপতির চঞ্চল গতি সুন্দর, কিন্তু উভয়ের কেউই নিজের সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন নয়। স্বাভাবিকভাবেই এ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্রষ্টা যেখানে নিজকে প্রকাশ করতে যান সেখানে সৌন্দর্যের হানি হয়। এর প্রমাণ ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল। অথচ অন্যদিকে তাজমহল আপন সৌন্দর্য দিয়ে দর্শকদের করেছে বিমোহিত।

৭

অমঙ্গলকে জগৎ হইতে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও না, তাহা হইলে মঙ্গলসমেত উড়িয়া যাইবে। মঙ্গলকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অমঙ্গলকেও সেইভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্গলের উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হইতে পার, কিন্তু বিস্মিত হইবার হেতু নাই। অমঙ্গলের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে যাইয়া অকূলে হাবুডুবু খাইবার দরকার নাই। যেদিন জগতে মঙ্গালের আবির্ভাব হইয়াছে, সেদিনই অমঙ্গালের যুগপৎ উদ্ভব হইয়াছে। একই দিনে, একই ক্ষণে—একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয়ের উৎপত্তি। এক-কে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। এক-কে ছাড়িয়া অন্যের অর্থ নাই। যেখান হইতে মঙ্গাল ঠিক সেইখান হইতে অমঙ্গাল। সুখ ছাড়িয়া দুঃখ নাই। একই প্রস্রবণে, একই নির্ঝর ধারাতে উভয় স্রোতস্বতী জন্মলাভ করিয়াছে, একই সাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে।

সারাংশ : এ পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, আলো-আঁধার একে অপরের পরিপূরক। একটি ছেড়ে অপরটি কিছুতেই পাওয়া যায় না। দুঃখকে বরণ করে নিলেই সুখের আশা থাকে; আঁধার আছে বলেই তো আলোর অস্তিত্ব আছে; মন্দটি বুঝি বলেই আমরা ভালোর গুরুত্ব উপলব্ধি করি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অমঙ্গালকে উপেক্ষা করে মঙ্গাল লাভ করা সম্ভব নয়।

৮

মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ তার রীতিনীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মানুষের হৃদয়ে জ্বালা ও বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মনুষ্য তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই মানুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। যার স্বভাব মন্দ সে নিজেও দুষ্ক্রিয়াশীল, মিথ্যাবাদী, দুর্মতিকে ঘৃণা করে। মানুষ নিজে স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। স্বভাব গঠনে কঠিন পরিশ্রম ও সাধনা চাই, নইলে শয়তানকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। যে স্বভাব গঠনের চেষ্টা করে, চিন্তা করে, সে এবাদত বা উপাসনা করে।

সারাংশ : মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য আসল নয়, অন্তরের সৌন্দর্যই মানুষকে মুগ্ধ করে। কুস্বভাবের লোককে সকলেই ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে সুস্বভাবের লোক সর্বত্রই সমাদৃত হয়। সুন্দর স্বভাব গঠন করার চেষ্টা করা সৃষ্টিকর্তার উপাসনার শামিল।

৯

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সে নীরব শব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে। মানবাত্মার আমূল অগ্নি ফসল অক্ষরের শৃঙ্খলে কালো চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে, তখন এক বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়। হিমালয়ের মাথার উপর কঠিন তুষারের মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। ভাবিতে গেলে বলিতে হয় গ্রন্থাগার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। ইহার সহিত তাহার অন্য কোনো সৃষ্টির তুলনা হয় না।

সারাংশ : পুস্তকাগারের পুস্তকের মধ্যে বহু জ্ঞানী-গুণীদের ভাব, চিন্তা ও পান্ডিত্য নিহিত রয়েছে। সমুদ্রের কল্লোলের মতোই ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হয় পুস্তকের মধ্যে। তাই সমুদ্রের গর্জনের মতো যদি চিন্তার এই তরঙ্গ শোনা যেত, তা হলে তার বিশালতা বা ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যেত। কিন্তু সামান্য অক্ষরের শৃঙ্খলায় মানবহৃদয়ের অনুভূতিকে আটকে রাখা হয়েছে, হিমালয়ের মাথায় তুষারের মধ্যে বাঁধা শত শত বন্যার স্রোতের মতো। মানুষের এ-সৃষ্টি সত্যিই বিস্ময়কর।

১০

বিদ্যা মানুষের অমূল্য সম্পদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলেই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ করেও থাকে তথাপি তার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সাপের মাথায় মণি থাকে। মণি মহামূল্যবান পদার্থ বটে কিন্তু তাই বলে যেমন মণি লাভের নিমিত্তে বিষধর সাপের সাহচর্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেরূপ বিদ্যা আদরণীয় হলেও বিদ্যালাভের নিমিত্তে বিদ্বান দুর্জনের কাছে গমন বিধেয় নয়।

সারাংশ : বিদ্যা অমূল্য সম্পদ। কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান হচ্ছে চরিত্র। যে বিদ্বান অথচ চরিত্রহীন, সে সম্মানের অযোগ্য। সাপের মাথায় মণি থাকলেও যেমন সাপের সাহচর্য কাম্য নয়, তেমনি বিদ্বান চরিত্রহীন হলেও তার সঙ্গ পরিত্যাজ্য।

১১

কিসে হয় মর্যাদা? দামি কাপড়, গাড়ি ঘোড়া, না ঠাকুরদাদার কালের উপাধিতে? না মর্যাদা এই সব জিনিসে নেই। আমি দেখতে চাই তোমার ভেতর, তোমার বাহির, তোমার অন্তর। আমি জানতে চাই তুমি চরিত্রবান কিনা, তুমি সত্যের উপাসক কিনা। তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরোয়, তোমায় দেখলে দাসদাসী দৌড়ে আসে, প্রজারা তোমায় দেখলে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ কর। বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি তোমায় আদর করেন। আমি তোমায় অবজ্ঞায় বলব— "যাও"।

সারাংশ : মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার অন্তর দিয়ে, ধন-সম্পদ-বংশমর্যাদায় নয়। যিনি চরিত্রবান, সত্যের উপাসক তিনি সবখানেই সম্মানিত। ধনার্জন, বংশমর্যাদা ক্ষণিকের মাত্র— এগুলো মানুষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ধনের মানুষ বড় নয়, মনের মানুষই বড়।

১২

মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলে থাকেন । কিন্তু জগৎ এমনি ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকলে তার স্থান কোথাও নেই। সমাজে নেই, স্বজাতির কাছে নেই, ভাইবোনের কাছে কথাটির প্রত্যাশা নেই। স্ত্রীর মতো ভালোবাসা বল ত আর কী আছে? টাকা না থাকলে অমন অকৃত্রিম ভালোবাসারও আশা নেই। কারো কাছে সম্মান নেই। টাকা না থাকলে রাজায় চেনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না, জন্ম মাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা, জগতে টাকারই খেলা।

সারাংশ : টাকাকে আমরা যতই তুচ্ছ মনে করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে টাকা ছাড়া জীবন অর্থহীন। টাকা না থাকলে কারও কাছ থেকে সম্মান মর্যাদা পাওয়া যায় না। এমনকি আপনজনের কাছ থেকেও ভালোবাসা পাওয়া যায় না। সর্বত্রই টাকার খেলা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু টাকারই প্রয়োজন।

১৩

সময় ও স্রোত কারো জন্যে অপেক্ষা করে না, চিরকাল চলতে থাকে। শত অনুনয় বিনয় করলে বা ভয় দেখালেও সময় আপন পথে চলতে থাকবে, ভ্রূক্ষেপও করবে না। সময় একবার চলে গেলে আর ফিরবে না। স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় পাওয়া যায়, অর্থ হারিয়ে গেলেও আবার পাওয়া যায় কিন্তু সময় গত হলে আর আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা বৃথা।

সারংশ : সময় ও নদীর স্রোত ক্রমাগত বয়ে চলে, কারও জন্য অপেক্ষা করে না। নষ্ট স্বাস্থ্য বা হারানো অর্থ ফিরে পাওয়া যায় কিন্তু যে-সময় চলে যায় সে কখনও ফিরে আসে না। তাই গত সময়ের জন্য অনুশোচনা না করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

পদ্যাংশ

১

নদী কভু নাহি পান করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরের অন্নদান;
স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

সারাংশ : পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই মহত্ত্বের লক্ষণ। নদীর পানি, গাছের ফল, গাভীর দুধ সবই পরের জন্য। নদী, গাছ, গাভী—এরা নিজে ভোগ না করে অন্যকে দান করে। কাঠ নিজে পুড়ে, সোনা নিজের রূপে, বাঁশি নিজের সুরে অন্যের মঙ্গল সাধন করে। তেমনি মহৎ ও সাধু লোকও পরের হিতার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

২

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ-যুগান্তর—অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
—এ ধরায় স্বর্গ শোভা নিত্য দেয় আনি।

সারাংশ : পৃথিবীতে কোনো কিছুই ক্ষুদ্র বা সামান্য নয়। ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহৎ-এর অবস্থান। ছোট ছোট বালুকণা মহাদেশ সৃষ্টি করে, বিন্দু বিন্দু পানিকণা মহাসমুদ্র সৃষ্টি করে এবং ক্ষুদ্র মুহূর্ত যুগ-যুগান্তের জন্ম দেয়। ছোট ছোট অন্যায় অপরাধ থেকেই ভয়ানক অপরাধের জন্ম হয়। তেমনি স্নেহপূর্ণ ছোট ছোট সান্ত্বনার বাণী ও আন্তরিকতাপূর্ণ দান পৃথিবীতে এনে দিতে পারে স্বর্গীয় সুখ। সুতরাং ছোট হলেই তা তুচ্ছ বা সামান্য নয়।

৩

উড়ির ধানের ধূলি নাসায় বসন তুলি
নব্য সভ্য যুবক যখন
একি অসভ্যের দেশ যন্ত্রণার একশেষ
বলি দূর করে পলায়ন;
দুই হাতে ধূলিরাশি মাখিয়া কৃষকহাসি
হর্ষ গদ্ গদ্ ভাষে কয়—
চিরদিন এই ধূলি মাখি যেন সব ভুলি
এ ধূলি সোনার বাড়া জীবনে হয়ো না হারা
চিরদিন মোর দেশে রয়ো
রোগের ওষুধ তুমি সম্পদ জন্মভূমি
মরণের শেষে শয্যা হয়ো।

সারাংশ : আধুনিক সভ্যতার মোহে আমরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছি বলে জননী জন্মভূমিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারছি না। আমরা কেউ-কেউ বিদেশি ও নাগরিক সভ্যতার গর্বে গর্বিত হয়ে পল্লীর যে কৃষকের অন্নে বাঁচি তাদেরকেই অসভ্য বলে নির্লজ্জের মতো গালি দিই। এখানেও কবি বলেছেন, কৃষকের ভালোবাসার ধূলি উড়ছে দেখে 'নব্য সভ্য যুবক' 'অসভ্যের দেশ' বলে গালি দিচ্ছে, আর কৃষক সেই ধূলিকেই আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে আসছে।

৪

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার।
সর্বক্ষণ সর্বজন চলে সেই পথে,
তৃণ গুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনো মতে,
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।

সারাংশ : স্রোতহারা নদীতে যেমন অসংখ্য শ্যাওলাদাম জন্মে, তেমনি কোনো জাতি নিরুৎসাহ, অচল, অসাড় হয়ে পড়লে নানা ধরনের জীর্ণ লোকাচারে বাধাগ্রস্ত হয়। তখন ধর্মীয় কুসংস্কার জাতির জীবনকে পঙ্গু করে ফেলে।

৫

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সারাংশ : পৃথিবীতে পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করতে পারার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত। নিজের স্বার্থ, সুখ বিসর্জন দিয়ে অন্যের মঙ্গলসাধন করতে পারলেই তৃপ্তি পাওয়া যায়। স্বার্থপর মানুষ কখনও সুখী হতে পারে না। জগতে নিজকে নিয়ে ব্যস্ত না থেকে সবার মাঝে নিজকে বিলিয়ে দিতে হবে। আর এ আত্মত্যাগের মাঝেই রয়েছে মানবজীবনের চরম সার্থকতা।

৬

ক্ষীণ বন্যলতা এক অতি ক্ষুদ্রকায়
বিশাল বটের তলে ভূমিতে লুটায়।
বট বলে, "ছায়াময় বাহি প্রসারিয়া
আশ্রয় দিয়েছি তোমা করুণা করিয়া,
নতুবা তাপানলে শুষ্ক হতো দেহ"।
লতা বলে "ফিরে লহ অযাচিত স্নেহ।
তোমার করুণা মম হইয়াছে কাল,
রৌদ্র বিনা হয়ে আছি বিশীর্ণ কঙ্কাল"।

সারাংশ : যারা পরের অনুগ্রহে বেঁচে থাকে, তারা জীবনের পূর্ণ স্বাদ কখনোই পায় না। কারণ, অনুগ্রহকারীর স্নেহ তাদের জীবনীশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যার ফলে পরিপূর্ণ বিকাশপ্রাপ্তি ঘটে না। বটের ছায়ায় আশ্রিত বন্যলতার নির্জীব প্রাণশক্তি এটিই প্রমাণ করছে।

৭

হে দারিদ্র্য! তুমি মোরে করেছ মহান,
তুমি মোরে দানিয়াছ, খ্রিস্টের সম্মান।
কণ্টক মুকুট শোভা দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস-প্রাণ।
শীর্ণ করপুট ভরি, সুন্দরের দান
যতবার নিতে চাই— হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি কর পান। শূন্য ভূমি
হেরি মম কল্পলোক!

সারাংশ : দারিদ্র্যই কবিকে মহান করেছে। কারণ এ-দারিদ্র্যের জন্যই তিনি সমস্ত লজ্জা, সংকোচ ও ভয় ত্যাগ করে মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর সেই যন্ত্রণা প্রকাশিত কবিতাসমূহই তাঁকে অমরতা দিয়েছে। দারিদ্র্যই কবির কল্পনার জগৎকে শুকিয়ে শূন্য মরুভূমিতে পরিণত করেছে।

৮

সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্বাচল কোণে
না হয় উদয়,
তারকার পুঞ্জ যদি নিভে যায় প্রলয় জলদে,
না করিব ভয়।
হিংসা ঊর্মি ফণা তুলি, বিভীষিকা মূর্তি ধরি যদি
গ্রাসিবারে আসে,
সে মৃত্যু লঙ্ঘিয়ে যাব সিন্ধুপারে নবজীবনের
নবীন আশ্বাসে।

সারাংশ : জীবনে যদি চারদিক থেকে বিপদ-আপদ, ভয়-ভীতি ও হতাশা ঘিরে ধরে তবুও ভেঙে পড়া উচিত নয়। যত বাধাবিপত্তি আছে, সবকিছুকে তুচ্ছ করে নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে নবজীবনের পথে যাত্রা করতে হবে। কবি একথাই এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

৯

সিন্ধু তীরে খেলে শিশু বালি নিয়ে খেলা,
রচি গৃহ হাসিমুখে ফেরে সন্ধ্যা বেলা।
জননীর অঙ্কে পরে। প্রাতে ফিরে আসি
হেরে তার গৃহখানি কোথা গেছে ভাসি।
আবার গড়িতে বসে— সেই তার খেলা।
ভাঙা আর গড়া নিয়ে কাটে তার বেলা।
এই যে খেলা— হায় এর কাছে কিছু মানে?
যে-জন খেলায় খেলা সেই বুঝি জানে।

সারাংশ : ভাঙা-গড়া নিয়েই জগৎ। এটাই চিরন্তন। নদীতীরে শিশু যেমন খেলাঘর তৈরি করে সন্ধ্যার সময় হাসিমুখে ঘরে ফিরে যায়, তেমনি মানুষও এ-পৃথিবীতে ক্ষণিকের সংসার পাতে এবং জীবনসায়াহ্নে ফিরে যায় স্রষ্টার কাছে। এ-খেলাঘর বাঁধার আসল রহস্য একমাত্র বিধাতাই জানেন।

১০

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।

রিপুর তাড়নে যখন মোদের বিবেক পায়গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

সারাংশ : স্বর্গ কিংবা নরক দূরে কোথাও নয়। বাইরে গিয়ে এর সন্ধান নিষপ্রয়োজন। কারণ, এই স্বর্গ নরক মানুষের মাঝেই বিরাজ করছে। মানুষ যখন বিবেকহীনের মতো কাজ করে আর সেই কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মনের জ্বালা-যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়—তখনই সে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। আবার মানুষ যখন সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখনই তাদের মাঝে বিরাজ করে স্বর্গীয় আনন্দ।

১১

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে,
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

সারাংশ : আমরা বহু অর্থ ও সময় অপচয় করে সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে গিয়ে থাকি। কিন্তু আঙিনার পাশে ধানের শিষের ওপর শিশিরবিন্দুর অপূর্ব সৌন্দর্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বহুদূরে গিয়ে পর্বতশ্রেণী ও সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করা অর্থহীন।

১২

দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ড বেদন
পুত্ররে পার না দিতে সে কভু দিও না।
যে তোমার পুত্র নহে, তারো পিতা আছে
মহা-অপরাধী হবে তুমি তার কাছে,
বিচারক। শুনিয়াছি বিশ্ব বিধাতার
সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
দয়াময়; ব্যথা দেন,ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার।

সারাংশ : অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে বিচারক যদি ব্যথা পেয়ে থাকেন তা হলে উপযুক্ত বিচার করেছেন বলে ধারণা করা হয়। নতুবা সে-বিচার হবে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। নিজ পুত্রকে যে-শাস্তি দেওয়া যায় না, তা অন্যের পুত্রকে দেওয়া সমীচীন নয়। এর জন্য স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

১৩

বসুমতি; কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করে পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?

বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী—
"আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাতে একেবারে ছাড়ে।"

সারাংশ : কষ্টার্জিত সম্পদের মধ্যে স্বীয় গৌরব নিহিত থাকে। তাতেই আত্মতৃপ্তি নিহিত। সহজলভ্য জিনিসের মূল্য যা-ই হোক না কেন, তাতে কৃতিত্ব বা গৌরব নেই।

১৪

বনের পাখি বলে, "আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাই তার। "
খাঁচার পাখি বলে, "খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।"
বনের পাখি বলে, "আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।"
খাঁচার পাখি বলে, "নিরালা সুখ কোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।"
বনের পাখি বলে "না—
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।"

সারাংশ : স্বাধীনতায় আত্মনির্ভরতার আনন্দ আছে, তৃপ্তি ও সুখ আছে, কিন্তু পরাধীনতায় রয়েছে পরনির্ভরতার কৃত্রিম সুখ। যারা স্বাধীন মুক্ত জীবনযাপন করতে চায় তারা কখনও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে চায় না। উল্লিখিত বনের পাখি স্বাধীনতার প্রতীক এবং খাঁচার পাখি পরাধীনতার প্রতীক।

অনুশীলনমূলক কাজ

নিচের গদ্য ও কবিতাংশগুলোর সারাংশ লেখ :

১

তুমি জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিতে চাও। ভালো কথা, কিন্তু সে জন্য তোমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। মহৎ কিছু লাভ করিতে হইলে কঠোর সাধনার দরকার। তোমাকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। এইসব তুচ্ছ করিয়া যদি তুমি লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে পার, তবে তোমার জীবন সুন্দর হইবে। আরও আছে। তোমার ভেতরে এক 'আমি' আছে, সে বড় দুরন্ত। তাহার স্বভাব পশুর মতো বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল। সে কেবল ভোগবিলাস চায়। সে বড় লোভী। এই 'আমি'কে জয় করিতে হইবে। তবেই তোমার জীবন সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিবে।

২

বার্ধক্য তাহাই—যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নব-মানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন, শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই, যাহারা নব-অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোকপিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দে যাহারা আজ কঙ্কালসার— বৃদ্ধ তাহারাই।

৩

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে, কোনো বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মহামূল্যবান পদার্থ বটে। কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণিলাভের নিমিত্তে বিষধর সর্পের সাহচর্য লাভ করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় হইলেও বিদ্যালাভের নিমিত্তে বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে।

৪

ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই হল জ্ঞানীর কাজ। পিঁপড়ে-মৌমাছি পর্যন্ত যখন ভবিষ্যতের জন্য ব্যতিব্যস্ত তখন মানুষের কথা বলাই বাহুল্য। ফকির-সন্ন্যাসী যে ঘরবাড়ি ছেড়ে আহারনিদ্রা ভুলে পাহাড়-জঙ্গালে চোখ বুজে বসে থাকে, সেটা যদি নিতান্তই গঞ্জিকার কৃপায় না হয়, তবে বলতে হবে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে কোনো লাভ নেই। সমস্ত জীবজন্তুর দুটো চোখ সামনে থাকবার মানে হল ভবিষ্যতের দিকে যেন নজর থাকে। অতীতের ভাবনা ভেবে লাভ নেই। পণ্ডিতেরা তো বলে গেছেন, 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। আর বর্তমান সে তো নেই বললেই চলে। এই যেটা বর্তমান সেই—এ কথা বলতে বলতে অতীত হয়ে গেল। কাজেই তরঙ্গ গোনা আর বর্তমানের চিন্তা করা, সমানই অনর্থক। ভবিষ্যৎটা হল আসল জিনিস। সেটা কখনও শেষ হয় না। তাই ভবিষ্যতের মানব কেমন হবে, সেটা একবার ভেবে দেখা উচিত।

৫

সময় ও স্রোত কাহারও জন্য অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না, চিরকাল চলিতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় কর, ইহাকে ভয় দেখাও, ভ্রূক্ষেপও করিবে না, সময় চলিয়া যাইবে আর ফিরিবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু সময় একবার গত হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গত সময় কখনও ফিরিয়া আসিবে না।

৬

বন্ধু অর্থ—সংসারে দুই মোর ছিল,
দিনু ঋণ সেই অর্থ—বন্ধু তা চাহিল।
বন্ধুর কাছে সেই অর্থ চাহিবার ফলে,
হারালাম বন্ধু অর্থ দুই এক কালে।

৭

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে,
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

৮

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী' পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

৯

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা
দেশ-মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।
মুক্তিকামী মহাসাধক, মুক্ত করে দেশ,
সবারই সে অন্ন জোগায় নেই কো গর্ব লেশ।
ব্রত তাহার পরের হিত— সুখ নাহি চায় নিজে,
রৌদ্র দাহে তপ্ত তনু শুকায়, মেঘে ভিজে।
আমার দেশের মাটির ছেলে করি নমস্কার,
তোমায় দেখে চূর্ণ হোক সকল অহঙ্কার।
তুমি মোদের সবার নেতা, তুমি মহাপ্রাণ।
তোমায় দেখে চূর্ণ হউক ভণ্ড নেতার মান।

১০

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল,
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল,
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে,
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম,
শত শত দাস তার সেবুক চরণ,
করুক স্তাবকদল স্তব সংকীর্তন।
কিন্তু যে সাধে নি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যেবা করে নি কিঞ্চিৎ,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।